মমতাজ-দুহিতা জাহানারা

শ্রীপারাবত

বেঙ্গল পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম (দে'জ) সংস্করণ :
বৈশাখ ১৩৭২

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১।১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর :
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা ৬

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

MOMTAZ-DUHITA
JAHANARA
a Historical Novel

By

Sree PARABAT

মনে পড়ে সেই বিশেষ দিনটির কথা। তুর্কী বেগমের শ্বেত হর্ম্যের ছায়া পড়েছিল প্রাসাদের সামনের স্বচ্ছ সরোবরে। জুম্মা মসজিদের বুলন্দ দরওয়াজার মাথা সূর্যের শেষ আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছিল। প্রাসাদের ক্ষুদ্র গুলিস্থানে খেলা করছিলাম আমি আর আমার ছোট বোন রোশনারা।

কতই বা বয়স হবে তখন? যৌবন তখন ঠিক এক কদম দূরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। বসন্তের হাওয়া, ফুলের গন্ধ আর পাখির গান নাম-না-জানা এক স্বপ্নপুরীর ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে মাত্র। স্পষ্ট ধারণা করতে পারি না কিছুই। মন চঞ্চল তাই। রোশনারা আমার চেয়েও চঞ্চল। কথায় কথায় তার মুখের ত্বকের নীচে সারা শরীরের রক্ত এসে নৃত্য করে। সে এক ব্যথাভরা পুলকে ঘাসের গালিচার ওপর শুয়ে গড়াগড়ি দেয়। তাকে দেখে আমারও শরীরে কেমন যেন একটা শিহরণ জাগে—বুঝতে পারি না। রোশনারার মতো আমারও গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। কিংবা গুল-আবাস বৃক্ষের কাণ্ডের ওপর নিজের দেহটিকে এলিয়ে দিতে বাসনা জাগে। কিন্তু পারি না। মনে হয়, এইভাবে আনন্দ-প্রকাশের মধ্যে কোথাও যেন এক রুচি-বিকৃতি লুকিয়ে রয়েছে।

খেলতে খেলতে একসময় রোশনারা ছুটে আসে আমার পাশটিতে। সরোবরের পর পারের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখায়। চেয়ে দেখি এক রাজপুরুষ ধীর পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন অনির্দিষ্টভাবে। বোধ হয় বায়ু সেবন করছেন।

রোশনারার চোখের তারা দুটি উজ্জ্বল। কানের কাছে মুখ এনে উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বলে,—কী সুন্দর। তাই না?

কেন যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি বলে উঠি,—জানি না। যা।

ইস্। রোশনারা আমার চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে হরিণীর মতো লাফাতে লাফাতে মিন্দা গাছের পাশে বসে পড়ে। ফুলের গায়ে গাল ঠেকায়।

ঠিক সেই সময়ে সেখানে প্রবেশ করেন আমাদের পিতা—শাহানশাহ্ শাহজাহান। মুখে তাঁর স্মিত হাসি। হাতে তাঁর দুখানি সুদৃশ্য মোটা কিতাব।

আমরা সোজা হয়ে বসি।

তিনি দুজনার মুখের দিকে চেয়ে বলেন,—এ দুটি কেন এনেছি জান? তোমাদের দুজনকে দেব বলে।

কৌতূহল দমন করতে পারি না। বলে উঠি,—কার লেখা বাবা?

—কারও নয়। এমন সুন্দর বাঁধাই, অথচ ভেতরে রয়েছে সাদা পাতা। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ। তোমাদের হাতের লেখায় এ দুটি একদিন সুন্দরভাবে ভরে উঠবে।

আনন্দ চেপে রাখতে পারি না। বলে উঠি,—কি লিখব বাবা?

—যা খুশী। তবে আমার মনে হয় আত্মকাহিনী লেখাই সব চাইতে ভাল। তৈমুর বংশের সেদিকে একটা জন্মগত কুশলতা আছে। এখনকার দিনের ঘটনাবলী যেন স্থান পায় তোমাদের লেখায়। শুধু নিজের সুখদুঃখের কাহিনী লিখে কি লাভ?

কিতাব দুখানি আমাদের দুজনার হাতে দিয়ে বাদশাহ্ ধীরে ধীরে গুলিস্থান থেকে বার হয়ে প্রাসাদের দিকে চলে যান। তাঁর শরীরের আতরের খুশবু ফুলের গন্ধকে ছাপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

কিতাব পেয়ে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠি, চেয়ে দেখি রোশনারা রাগে কাঁপছে। তার নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। তার কিতাবটিকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ঘাসের ওপর।

—রোশনারা? তুই ফেলে দিলি?

—আমি সব জানি, সব বুঝি।

—কি বুঝিস তুই? পিতার স্নেহের উপহারকে এভাবে অবহেলা করার ব্যথা বুক নিয়েও বিস্মিত হয়ে শুধাই।

—চেষ্টা করলে তুমিও বুঝবে।

বিরক্ত হই। বয়স তো হল ওর মাত্র চোদ্দ বছর। এর মধ্যেই যেন একটা বন্য ভাব প্রভাব বিস্তার করছে ওর স্বভাবে।

বলি,—হেঁয়ালি ছাড়্। কেন এভাবে ছুঁড়ে ফেললি?

—একটু আগে সরোবরের ওপারে যে রাজপুরুষকে দেখলাম, ওকে আগেও দেখেছি খুব সুন্দর দেখতে। কোথাকার যেন রাজা। ও একদিন দেওয়ান-ই-খাস আসছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে চেয়ে দেখছিলাম আমি। হঠাৎ পেছন থেকে দেখে উঠেছিল আওরঙ্গজেব। কাছে এসে কি বলল জানিস?

—কি বলল ?

—বলল, সবাইকে এমন দেখে দেখেই স্বাদ মেটাতে হবে শাহ্‌জাদী। শাদি আর তোমাদের হবে না।

—তার মানে ?

—বাদশাহ্‌ আকবরের নির্দেশ। মুঘল শাহ্‌জাদীরা থাকবে চিরকুমারী।

রোশনারার কাছে নতুন হলেও, নতুন কথা নয়। হারেমের সবাই জানে। আমিও জানি।

বিষণ্ণ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল রোশনারা। সে-ভঙ্গীর দিকে দৃষ্টি ফেলে আমার নিজের ভবিষ্যৎও যেন জীবনে প্রথম স্পষ্ট দেখতে পাই। গুলিস্থানের ফুলের গন্ধ তাই ফিকে বলে বোধ হয়। সরোবরের স্বচ্ছ জল ঘোলাটে দেখায়। তুর্কী-বেগমের শুভ্র প্রাসাদ ম্লান।

মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে সংযত করে বলি,—তাই বলে কিতাবখানাকে ওভাবে ফেলে দিলি ?

জ্বলে ওঠে রোশনারা। চেঁচিয়ে বলে,—চালাকি। বাদশাহের চালাকি। নিজেরা সব কিছু করবেন, আর আমরা হারেমে বন্দী হয়ে থেকে নাজীরের (দাসী) মুখ দেখে দেখে জীবন কাটিয়ে দেব, তোফা !

—ছিঃ রোশনারা। ওভাবে বলতে নেই।

—বলব। একশোবার বলব। হাজারবার—। রোশনারা ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ওর পিঠের ওপর হাত রাখি, মনের খেদ ওর অমূলক নয়। সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই, ওর কথা শুনে নিজেও যে সান্ত্বনা খুঁজে পাই না। যে-যৌবন সূর্যাস্তের [illegible] এক কদম দূরে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের দেহ-মনকে অধিকার করে বসে। কৈশোরের চাপল্য জীবন থেকে চিরবিদায় নিল।

সবুজ ঘাসের খাঁজে খাঁজে অন্ধকার জমে আরও গাঢ় করে তুলেছে। তারই ওপর রোশনারার কিতাবখানি একদলা কালো রক্তের মতো পড়ে থাকে।

মুঘল-শাহ্‌জাদীর আত্মকাহিনী। লিখতে বসলে হয়তো তা ব্যর্থ যৌবনের বিলাপ হয়ে ফুটে উঠবে। তবু লিখব। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখব না। ভবিষ্যতের মানুষ আমার জীবনীতে [illegible]নের ক্রন্দন শোনে শুনুক—কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু লাভ করে যেন কৃতার্থ হয়।

দূরে প্রাসাদের অসংখ্য রোশনাই জ্বলে ওঠে। একটু পরেই দেওয়ান-ই-খাসের [illegible]র বারান্দা দিয়ে নর্তকীদের আনাগোনা শুরু হবে, তাদের ঝুমুরের সঙ্গে আগ্রার প্রাসাদ উচ্চকিত হবে।

রোশনারাকে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়ে বলি,—ওঠ্! সন্ধ্যে হল।

—না।

—বাবার ওপর রাগ করিস কেন? নির্দেশটা বাদশাহ্ আকবরের।

—তাই বলে সেটা চালু থাকবে?

—থাকবে কিনা কে বলতে পারে! তেমন দিন তো আসে নি।

—আসবে।

হেসে ফেলি,—আগে আসুক!

রোশনারা তবু বসে থাকে মুখ গুঁজে।

—উঠবি না? বড় দেরিতে রাগ করলি কিন্তু। আওরঙজেব তো কবেই কথাটা বলেছিল। এতদিন কিছু মনে হয় নি?

রোশনারা মুখ তোলে। আমার দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলে ওঠে,—না। কথাটা শুধু কান দিয়ে শুনেছিলাম। মনের মধ্যে যায় নি। কিন্তু আজ—

—আজ কি?

—ওকে আবার দেখেই বুঝলাম, কী-ভীষণ নির্দেশ। আমি পারব না। কিছুতেই পারব না।

স্তব্ধ হয়ে যাই।

গুলিস্থানের সবটাই অন্ধকার হয়ে ওঠে। গাছপালা আর চেনা যায় না। আন্দাজে রোশনারার কিতাব তুলে নিয়ে এসে বলি,—এটি তবে আমিই নিলাম।

—নে। বাবার বাধ্য মেয়ে তুই। তোকেই দিলাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর্, যা লিখবি সব যেন সত্যি হয়। মিথ্যের ছিটেফোঁটাও যেন না থাকে তোর লেখায়।

—বেশ। প্রতিজ্ঞা করলাম।

গুলিস্থান থেকে প্রাসাদে আসি। রোশনারার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি মায়ের শয়নকক্ষের দিকে চলতে শুরু করি। মনে যখন জাগে সন্দেহ, সংশয়ের দোলায় যখন দুলতে থাকে মন, তখনই মা যেন তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে আমাকে প্রবল-ভাবে আকর্ষণ করেন। তাঁর কাছে একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমার সব সংশয়, সব অতৃপ্তি তামাকুর সাদা ধোঁয়ার মতো মুহূর্তে অনন্ত আকাশে মিলিয়ে যায়। মা আমার সংযম আর শান্তি, ধৈর্য আর সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, এতগুলি সন্তানের জননী হয়েও তাঁর রূপের দরিয়ায় কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি, শুধু গালের [illegible]

রক্তিমাভা এখন আর তেমন দেখা যায় না। মুখখানি যেন সাদা মোম দিয়ে তৈরি। তাঁর ওই অপূর্ব ছন্দের দেহখানাই মোমের মতো মসৃণ আর শুভ্র।

হাকিম বলেছে রক্তাল্পতা দেখা দিয়েছে মায়ের শরীরে। বাদশাহের সেজন্যে দুশ্চিন্তার অবধি নেই। তাঁর সারাদিনের হাসিমাখা মুখের ওপরেও কিসের যেন ছায়া লেগে থাকে। তাঁর আদেশে নাজীররা আঙুরের নির্যাস নিয়ে হাজারবার ছোটাছুটি করে। খাওয়ার জন্যে সাধে মাকে। মা হাসেন। পিতার ব্যস্ততা বসে বসে উপভোগ করেন তিনি।

মায়ের প্রতি বাদশাহের এই অনুরাগ প্রথম দর্শনের পর থেকেই, সে গল্প শুনেছি হারেমের বৃদ্ধা নাজীর আর শাহ্‌জাদীদের মুখে। পিতামহ জাহাঙ্গীর তখন মসনদে। নওরোজ উপলক্ষ্যে সে সময়ে দেশের সেরা সুন্দরীদের বাজার বসত প্রাসাদের আঙিনায়। সেই রকম এক বাজারে একটি ছোট্ট বিপণি খুলে বসেছিলেন এক অমাত্যের ঘরনী—নাম তাঁর আরজমন্দ বানু। অন্যান্য শাহ্‌জাদাদের সঙ্গে আমার পিতাও সেই বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। জিনিস কেনাটা গৌণ—মুখ্য হল রূপসীদের রূপসুধা পান। চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর পাদুটো একটি দোকানের সামনে এসে আপনা থেকে থেমে যায়। বিমোহিত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন। আরজমন্দ বানু আলো করে বসে রয়েছেন সেখানে। কিন্তু কী কিনবেন শাহ্‌জাদা। দোকানের সব জিনিসই যে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। অমন রূপসীর দোকানে কি কিছু পড়ে থাকে? তবু রয়েছে। শুধু একতাল মিছরি। কতই বা দাম হবে সেই মিছরির। তবু শাহ্‌জাদা এগিয়ে যান কম্প্র-বক্ষে। রূপসী সচকিত হয়ে ওঠেন। শাহ্‌জাদা মিছরি চেয়ে বসতেই তিনি তাড়াতাড়ি সবটা তুলে দেন তাঁর হাতে। হাতে হাত ঠেকে যায়। দুজনারই হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত। মিছরি নিয়ে গলার বহুমূল্য হার ছড়া খুলে দিয়ে মন চেয়ে বসেন দুঃসাহসী শাহ্‌জাদা।

আরজমন্দ বানুর ভাগ্য ভাল যে খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করেন। নইলে হিন্দুস্থানের ইতিহাসে মমতাজ বেগমের নাম কেউ শুনতে পেত না। শাহানশাহ্‌ শাহজাহানের স্বভাব তাঁর পিতার মতো নয়। নারীর জন্যে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন না কখনোই।

অনেক কক্ষ পার হয়ে এগিয়ে যাই খা-আব-বাগ বা স্বপ্নপুরীতে। এককালে বাদশাহ্‌ আকবরের শয়নকক্ষ ছিল এটি। এখন মা সেখানে রয়েছেন, শাহানশাহের অনুরোধে। কক্ষটি ঠিক হারেমের অন্য কক্ষের মতো আব্রু-ওয়ালা নয়। প্রচুর আলো বাতাসের আনাগোনা এখানে।

বহুমূল্য কিংখাবের ওড়না গায়ে জড়িয়ে, হাতে একগুচ্ছ গুলদাউদী নিয়ে মা হয়তো

বাদশাহের প্রতীক্ষায় ছিলেন। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে তিনি হাসি মুখে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে থেমে যান।

—এ সময়ে কেন জাহানারা? কিছু ঘটেছে?

লজ্জিত হই। সঙ্কুচিত হই। ঘাড় নেড়ে বলি,—কিছু হয় নি মা।

—তবে।

—আজ সারাদিন তোমাকে দেখি নি। তাই।

হেসে ফেলেন মা। কাছে ডাকেন। পাশে বসিয়ে বলেন,—এবারে সত্যি কথাটা বল্‌তো? আমাকে এত ভালবাসিস কবে থেকে? শুধু দেখা করার জন্যে এই সময়ে খা-আব-বাগে চলে এলি? জাহানারা, আমাকে কি আবার নতুন করে তোদের চিনতে হবে?

মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। মাকে ভালবাসি একথা সত্য। কিন্তু সে ভালবাসার সীমারেখা জানা আছে তাঁর। অকারণে তাঁর কাছে মন-গড়া কৈফিয়ত দিয়ে লাভ নেই। তাই সোজাসুজি সবকিছু বলব বলে স্থির করি।

—মা।

—বল্ জাহানারা।

—মুঘল শাহজাদীর শাদি হয় না?

—একথা আজ জানলি?

—না। বরাবরই জানি। তবে রোশনারা এ-নিয়ম মানবে না।

—না মানুক। আমি তাই চাই।

বিস্মিত হই। বলি,—কিন্তু বাদশাহ্ বাধা দেবেন না?

—ঈশ্বরদত্ত একটা সংস্কার তাঁর মনে রয়েছে বটে। তবে তিনি অনেকটা উদার বলেই মনে হয়।

—কি করে বুঝলে?

—এতদিন রয়েছি তাঁর সঙ্গে, মন চিনব না? শোন্ জাহানারা, মুঘল শাহজাদীর সন্তান সিংহাসন দাবি করে পরিবারের বিপদ ডেকে আনবে বলে ভয় ছিল আকবর শাহের। কিন্তু সে বিপদ কি থেমে আছে?

—না।

মা মিষ্টি হেসে বলেন,—দারা, সুজা, আওরঙজেব আর মুরাদও বড় হয়ে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করতে পারে। এদের সঙ্গে তোর আর রোশনারার তিন-চারটে ছেলে যোগ দিলে এমন কিছু এসে যাবে না।

—তুমি তাহলে রোশনারার পক্ষে?

—হ্যাঁ রে। তোর পক্ষেও। শাহানশাহ্ আমার স্বাস্থ্যের জন্তে যেরকম উ.. লেগেছেন, আল্লার কৃপায় যদি কিছুদিন টিকে যাই, তোদের শাদি দেখে যাব।

নাচমহলে নৃত্য শুরু হয়েছে। দূরাগত সংগীতের মতো এতগুলি কক্ষ পার হয়েও সে নৃত্যের ছন্দময় ঝংকার শোনা যায়। বাতায়নের বাইরের আকাশ তারকাখচিত। ঈদের চাঁদের মতো একফালি চাঁদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে পৃথিবীর দিকে। মায়ের মুখে বেহেস্ত-এর হাসির ছোঁয়াচ।

মা বলেন,—আকবরশাহ্ আর এক মস্ত ভুল করেছিলেন। মুঘল শাহ্জাদীদের কুমারী রাখার সিদ্ধান্ত নেবার সময় তাদের দৈনিক আহারের একটা ফিরিস্তিও তৈরি করে দেওয়া উচিত ছিল।

—কেন মা?

—কোপ্তা, কোর্মা, কাবাব আর সবাব খেয়ে কুমারী থাকতে গেলে পাগলই হতে হয়। অন্য পথ নেই। এসব জিনিসের এমনই গুণ। সেরকম ঘটনা ঘটে নি তা নয়। চোখ মেলে হারেমে ঘুরলে এখনো হয়তো দেখতে পাবি। হিন্দু বিধবাদের যে খাবার, মুঘল কুমারীদেরও সেই খাবারের বিধান দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আকবর শাহের।

মায়ের কথার অর্থ পুরোপুরি ধরতে না পারলেও তাঁর চিন্তার গভীরতা দেখে মুগ্ধ হই। প্রাসাদের এক কোণে পড়ে থেকেও তিনি অনেক কিছু ভাবেন। বাদশাহের উচিত ছিল আজকে আমাদের দুই বোনের হাতে যেমন কিতাব তুলে দিয়েছেন, তার চেয়েও মোটা একটা কিতাব মায়ের হাতে তুলে দেওয়া। একটি অমূল্য সম্পদ লাভ করতে পারত জগৎবাসী।

একজন রূপসী নাজীর স্বর্ণখচিত পাত্র হাতে নিয়ে প্রবেশ করে।

—আবার নিয়ে এসেছ? মায়ের মুখে বিরক্তি।

—খেয়ে নাও মা।

—কত আর খাব। আমার কি মনে হয় জানিস? আমার ভেতরে আগুন ধরেছে। এত কিছু করেও তাই শরীরে আর আগের সজীবতা ফিরে পাই না।

মায়ের ভারী কোমর আর স্ফীত উদরের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হয়। আমাকে নিয়ে যে দুর্ভোগের শুরু, আজ ষোল বছর পরেও সে দুর্ভোগে ছেদ পড়ল না। আওরঙ্গজেব পর্যন্ত প্রতি বছরই তিনি নিজের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করে পৃথিবীতে তাঁর সবচাইতে আপ[illegible]ন বাদশাহ্কে একটি করে সন্তান উপহার দিয়েছেন। তারপরে এই ধারাবাহিকতা ছিন্ন হলেও একেবারে থেমে যায় নি। প্রথম বয়সে উপহার দেবার সময় বাঁধভাঙা আনন্দই হয়তো মুখ্য বলে প্রতিভাত হত, কিন্তু এখন যেন ক্লান্তিটাই [illegible] হয়ে ধরা পড়ে চোখে।

—অমন হাঁ করে কি দেখছিস জাহানারা।

মুখখানিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলি,—কিছু না।

মা হাসেন। বলেন,—আমার কাছে তুই ছোটই আছিস। তবু বয়স হয়েছে তোর অনেক কিছুই বুঝতে পারিস।

মমতাজ বেগমের মোমের মতো সাদা মুখে রক্তের ঢেউ দেখা যায়। লজ্জা পেলেন নাকি তিনি নব-যৌবনা কন্যার মনোভাব বুঝতে পেরে?

তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে ডাকি,—মা।

মুহূর্তে তাঁর চোখের ভাষা পালটে যায়। অগাধ স্নেহধারা বেয়ে পড়ে সে চোখের দৃষ্টিতে। আমার গালের সঙ্গে নিজের গাল চেপে ধরে বলেন, কিরে জাহানারা।

—মা, এবারে কি হবে?

—বোন।

—কি করে বুঝলে?

—মন ডেকে বলছে।

—আমি কিন্তু মা তোমার প্রথম মেয়ে।

—জানিরে। তোর ওপর আমার পক্ষপাতিত্ব সেজন্যে একটু বেশীই বোধ হয়। বাদশাহ্‌রও।

—মেয়েদের ওপর আবার নবাব-বাদশাহ্‌দের টান থাকে নাকি?

—বোধ হয় থাকে না। কিন্তু তোর বেলায় রয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তুই ভাগ্যবতী। বাদশাহ্ অবিশ্যি এর অন্য কারণ দেখান।

মা চুপ করে থাকেন। মুখের ভাব দেখে মনে হয় বেফাঁস কিছু বলে ফেলে অপ্রস্তুতে পড়েছেন। শেষে তাঁর মুক্তাপাতির মতো দাঁতগুলো একটু একটু দেখা যায় আবার। তিনি বলেন, তুই তো বেশ বড়ই হয়েছিস। তোকে বলতে আর বাধা কি?

—বল।

—বাদশাহ্ বলেন, তাঁর সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে তোর সঙ্গেই নাকি আমার আশ্চর্য মিল রয়েছে।

—সত্যি মা? মায়ের কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হয়। পৃথিবী-বিখ্যাত রূপসী মমতাজ বেগমের রূপের ধারে কাছে পৌঁছুতে পারা যে কোন রমণীর পক্ষেই মস্ত গর্বের।

বাদশাহ্ হয়তো এখনি এসে পড়বেন। আমাকে দেখে বিরক্তও হতে পারেন। উঠে পড়ি।

—চললি?

—হ্যাঁ মা।

তাঁর মুখখানি হঠাৎ এক অকথিত ব্যথায় ভরে যায়। তাঁর দু'নয়নের প্রসিদ্ধ পল্লব ছাপিয়ে অশ্রু বার হয়।

—মা, তুমি কাঁদছ?

—শোন্ জাহানারা। একটা কথা কাউকে বলি নি। তোর বাবাকেও নয়। আমার মনে হয় কি জানিস? এবার আমি আর বাঁচব না।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন মা। কক্ষের বাইরে কর্তব্যরত যে নাজীর ছিল কান্নার আওয়াজ শুনে সে ছুটে আসতে যায়। হাত উঁচিয়ে ইঙ্গিতে তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরি।

—ছি মা। কেঁদো না অমন করে। তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। তাই আজেবাজে চিন্তা তোমার মাথায় আসে। এবার থেকে সব সময় আমি তোমার কাছে থাকব।

ধীরে ধীরে শান্ত হন মা। শেষে বলেন,—আমি ঠিকই বলছি। দেখিস্, তোর বাবার কানে কথাটা না যায়। ভীষণ দুঃখ পাবে। শাহানশাহ্ হলেও আসলে ও কবি। তাই অল্পে যেমন ওর সুখ, দুঃখও তেমনি অতি অল্পেই।

আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। বাবার সম্বন্ধে মা কখনো এভাবে আমাকে বলেন নি।

মা আবার বলেন,—তোকে আজ এত কথা বলার প্রয়োজন হত না, যদি নিশ্চিত জানতাম এ-যাত্রা আমি বেঁচে উঠব। বাদশাহ্‌কে আমি ছাড়া কেউ চিনতে পারে নি। পারবেও না কেউ কোনদিন চিনতে। ও ঠিক সাধারণ মানুষ নয়। তুই যেন চিনতে ভুল করিস না।

হারেমের বিভিন্ন কক্ষ থেকে মাঝে মাঝে উৎকট চিৎকার শোনা যায়। মা ছাড়া আরও যে সমস্ত বেগম রয়েছেন শাহানশাহের, প্রতিদিন ঠিক এমনি সময়ে সরাব পান করে তাঁরা মাতলামি শুরু করেন। কারণ তাঁরা জানেন এমনি সময়েই বাদশাহ্ হারেমে আসেন এবং তাঁদের উপেক্ষা করে মমতাজ বেগমের কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু এত করেও বাদশাহের করুণা আকর্ষণ করতে পারেন নি তাঁরা। খুব কমই তাঁদের কক্ষে রাত কাটান পিতা। এক মাসের মধ্যে বড় জোর সাতটা দিন তাঁরা ভাগাভাগি করে বাদশাহ্‌কে কাছে পান। বাকী দিনগুলি মায়ের নিজস্ব।

মনে মনে ঘৃণা করেন বাদশাহ্ তাঁর অন্যান্য বেগমদের—তাঁদের মাতলামিকে। বিখ্যাত সরাব-পায়ী জাহাঙ্গীরের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চব্বিশ বছরের আগে কোনদিন মদ স্পর্শ করেন নি পিতা। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাই তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তবে ইদানীং মাঝে মাঝে সরাবের পাত্র মুখে তুলতে হয় তাঁকে। কঠোর পরিশ্রম আর মানসিক দুশ্চিন্তায় এটা হাকিমি দাওয়াই।

বাইরে কর্তব্যরত প্রহরীদের সতর্ক অভিবাদনের আওয়াজ পাই। বাদশাহ্ আসছেন। আরও কিছু কথা ছিল মায়ের সঙ্গে। বলা হল না। অন্য দরওয়াজা দিয়ে বাইরে চলে আসি।

ঠিক দুদিন পরে ঘটে গেল ঘটনাটা। এত তাড়াতাড়ি ঘটবে স্বপ্নেও ভাবি নি। ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ের জন্ম দিলেন মা ভোরের বেলায়। বাদশাহ্ খবর পেয়ে ঘুম চোখে ছুটে এসে মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে মা ম্লান হেসে বলেন,—এদের সবাইকে দেখো।

চমকে ওঠেন বাদশাহ্। বলেন,—তুমি একথা বললে কেন?

—এমনি।

বাদশাহ্ কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যান। নবজাত কন্যাকে স্পর্শ না করেই উঠে দাঁড়ান। ধীরে ধীরে মায়ের শিয়রে এসে তাঁর কপালের উত্তাপ দেখেন। তারপর নিষ্পলক দৃষ্টিতে একভাবে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। ক্লান্ত মায়ের চোখদুটি তখন বন্ধ ছিল।

বাবা সন্তর্পণে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলেন,—তুমি এখান থেকে যেও না জাহানারা।

—আমি এখানেই থাকব বাবা।

—প্রয়োজন হলেই আমাকে ডেকে পাঠিও।

আমি সম্মতি জানাই।

বাদশাহ্ চলে যান, হয়তো হাকিমের সঙ্গে পরামর্শ করতে। হাকিম আগেই বলেছেন ভয়ের বিশেষ কারণ নেই। যেটুকু দুর্বলতা রয়েছে মায়ের, তার জন্যে দাওয়াই-এর ব্যবস্থা তিনি করেছেন। বিপদের সম্ভাবনা নেই বলে তিনি প্রসূতির ঘরে না থেকে পাশের ঘরে রয়েছেন।

নিস্তব্ধ কক্ষে আমি একা বসে। কিছু দূরে মা শায়িতা। খুব ধীরে তাঁর শ্বাস পড়ে। আমার ছোট্ট বোনটি মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে। একজন অভিজ্ঞ নাজীর এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করে আবার রেখে যায়।

সকাল কাটে। দুপুর হয়। অন্যান্য কক্ষে শাহ্জাদী আর বেগমেরা দিবা নিদ্রায় মগ্ন।

হঠাৎ একসময়ে দেখি মা ছটফট করছেন। তাঁর চোখ দুটো বড় বড়। ছুটে তাঁর পাশে গিয়ে বলি,—মা অমন করছ কেন?

পাতে হাঁপাতে মা কোনমতে বলেন,—ওঁকে ডাক জাহানারা। শিগগির।
তবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি মায়ের শুভ্র শয্যা রক্তাক্ত।
জীরকে কাছে বসিয়ে বাদশাহ্‌কে ডাকতে আমি পাগলের মতো ছুটি। নিজেকে বড়
হায় বলে বোধ হয়।
বার কক্ষে ছিলেন বাদশাহ্‌। তাঁর কাছে খবর পৌছে দিতেই তিনি দৌড়ে
সেন।
কিমকে নিয়ে আমরা দুজনে মায়ের কক্ষে প্রবেশ করি। চেয়ে দেখি মায়ের চোখ
মীলিত-- মুখ শান্ত। যে নাজীরকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম সে কাঁদছে।
কিম গিয়ে মায়ের ডান হাত সযত্নে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেন। অনেকক্ষণ ধরে
ীক্ষা করেন। শেষে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকেন।
মার পায়ের নীচের পাথরের মেঝে যেন সরে যায়। টলতে থাকি। ঠিক সেই
য়ে পিতার আকাশ-কাটানো চিৎকার শুনি—মমতাজ!
বোধ শিশুর মতো কঠিন পাষাণের ওপর বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন শাহানশাহ্‌
হজাহান।
তার এ ক্রন্দন শুনলেন হাকিম, শুনল এক অতি সামান্য নাজীর। আর শুনলাম
মি। তাঁরা সেই মুহূর্তেই পিতাকে চিনে নিল। তাঁর হৃদয়কে চিনল।
মনে শয্যার ওপর মায়ের মৃতদেহ। ভূতলে বাবা কেঁদে ভাসান। আমি বাবার
শেই বসি, তাকে ধরে রাখি। মা যে আদেশ দিয়ে গেছেন। মায়ের শেষ আদেশ
মি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পালন করব। তিনি বেহেস্ত্‌ থেকে দেখে নিশ্চিন্ত
বেন।

ত্যু।
নিসটি কত স্বাভাবিক, অথচ কত অস্বাভাবিক। মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয়
রিণতি পৃথিবীর প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত কোন জীবজন্তু কীটপতঙ্গ গাছপালার
য়েছে কি? অথচ এত জেনেও প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা আকুল হই, ব্যাকুল হই।
মরা অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করি।
য়ের দেহ যমুনার তীরে সমাহিত করার সময় আমরা ভাই-বোনেরা কাঁদলাম—এক
ঙ্গে কাঁদলাম। সেইদিনই আমরা শেষবারের মতো অনুভব করলাম আমরা
রস্পরের কত আপন। বাদশাহের কান্না থেমে গিয়েছিল। আরামবল্লীর মতো স্তব্ধ
য় দাঁড়িয়ে তিনি মৌলবীদের সমস্বরে উচ্চারিত কোর-আনের পুণ্য বাণী শুনতে

থাকেন। তাঁর ঘন কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রুর অধিকাংশই রূপালী জরির মতো চক্‌চক্‌ করছি
মুরাদ একবার সেদিকে তাকিয়ে আরও জোরে কেঁদে ওঠে। সে সবার ছোট। ব
যে কোনদিন বৃদ্ধ হতে পারেন এ ধারণা তার ছিল না। তবু হয়তো সহ্য হত তা
কিন্তু একদিন আগে যাঁর চেহারার মধ্যে বার্ধক্যের লেশমাত্র চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যে
না, একদিন পরেই তাঁর এ কী পরিবর্তন।

সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরে আসি। মায়ের কক্ষে প্রবেশ করি। সব ফাঁকা। বুক
ভেতরটা আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে।

বাইরে পর্দার কাছে কে যেন এসে থেমে যায়। হয়তো দারা কিংবা মুরাদ। লুকি
পড়ি দরওয়াজার আড়ালে। হয়তো কাঁদতে চায়। বুকের ব্যথা নিঃশেষ ক
দিয়ে কাঁদতে চায় মায়ের শূন্য শয্যার ওপর মন রেখে। কাঁদুক। প্রাণভরে কাঁদুক
কিন্তু একী! বাবা!

ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে যান শয্যার পাশে। ভূতলে হাঁটু-ভেঙে বসে শয্যার ও
রিক্ত বাহু দু'খানা বিছিয়ে দিয়ে স্পষ্ট অনুচ্চস্বরে বলেন,—চলে গেলে তুমি মমতাজ
কি নিয়ে আমি থাকব?

বিছানায় মুখ ঘষতে ঘষতে কাঁদতে থাকেন তিনি।

—এমন তো কথা ছিল না। তুমিই বলেছিলে একই দিনে একই মুহূর্তে আমরা পৃথি
থেকে বিদায় নেব। জীবনে যেমন কখনো ছাড়াছাড়ি হই নি, মৃত্যুর পরেও হ
না। তবে কেন চলে গেলে? কোনরকম সতর্ক না করে দিয়ে এভাবে কেন ফাঁ
দিলে?

আমি আর সহ্য করতে পারি না, দরওয়াজার আড়াল থেকে বার হয়ে এসে ধী
ধীরে বাদশাহের পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। তাঁর কাঁধ স্পর্শ করে ডাকি,— বাবা!

বাদশাহের সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। তিনি পেছন ফিরে আমা
দেখেন। তাঁর মুখে তখন কি আঁকা ছিল ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

—বাবা, মা আমাকে রেখে গিয়েছেন!

—তোকে, রেখে গিয়েছে?

—হ্যাঁ বাবা। তিনি জানতেন, তিনি আর বাঁচবেন না। তোমাকে বললে তু
কষ্ট পাবে, তাই বলেন নি। আমাকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন তোমাকে দেখার জন
আমি নাকি তাঁরই মতো দেখতে?

বাবা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেন,—হ্যাঁ জাহানারা!
তোর মায়ের মতোই দেখতে। তোর স্বভাবও তোর মায়ের মতো। কিন্তু
না থাক।

সা আমাকে ছেড়ে দেন তিনি। মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। র বিমর্ষ ভাব অনেক কম বলে মনে হয়। সমব্যথী পেয়েছেন তিনি। মায়ের শয্যার কে আর একবার তাকান তিনি। ঘরের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। যে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

মি ধীরে ধীরে বলি,—বাবা, মা তোমাকে ছেড়ে যান নি। তোমার জন্য পেক্ষা করছেন। তুমি তোমার কর্তব্য শেষ করে তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিললে তিনি খী হবেন। তুমি যে পুরুষ।

উত্তেজনায় বাবার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে। সজোরে আমার কাঁধ পে ধরে বলেন,—সত্যি করে বল্ জাহানারা, একথা বলতে তোর মা শিখিয়ে য়েছে?

প করে থাকি। কী বললে বাবা সুখী হবেন চিন্তা করি। শেষে বলি,—হ্যাঁ বাবা।

-আমি জানতাম। হুবহু তোর মায়ের কথা কি ভাবে তুই বলবি? তোর মায়ের থাই আমি রাখব জাহানারা। আমার কর্তব্য আমি করব।

বা চলে গেলে আমি সচকিতে চার দেয়ালের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিই। কোথায় মা? নুভব করছি তিনি আছেন, অথচ দেখতে পাচ্ছি না। অস্ফুটস্বরে ডাকি,—মা। ড়া নেই।

-মা গো। দেখা দাও আর না দাও, তোমার কথাগুলো এভাবে আমার মুখে টিয়ে দিও। নইলে বাবাকে যে সামলাতে পারব না।

শিশমহল। প্রাসাদের এক দুর্নিবার আকর্ষণস্থল এই শিশমহল। মায়ের মৃত্যুর পর নবছর পার হয়েছে। সেই থেকে জায়গাটি অব্যবহৃত পড়ে থাকে। বাদশাহ্ লেও আর যান না ও-পথে। আমি শুধু মাঝে মাঝে গিয়ে দাঁড়াই। চারদিকে ঙীন কাঁচে ঘেরা কক্ষটি। সূর্যের আলো হাজার রঙে রঙীন হয়ে কক্ষের ভেতরে এসে ড়ে এক লোভনীয় স্বপ্নজাল বিস্তার করে। এখান থেকে নগরীর দৃশ্য মনোরম। খানে বসে থাকতে থাকতে একসময় আমার সর্বাঙ্গ আনচান করে ওঠে। মনে , সবই রয়েছে অথচ কি যেন নেই। আয়োজন সম্পূর্ণ, অথচ কিসের অভাবে যেন ব্যর্থ হয়ে যায় দিনের পর দিন। সে ব্যর্থতার লজ্জা আমারই। শিশমহলের রে-পড়া রঙগুলি আমার সর্বাঙ্গকে রঙীন করে দিয়ে কিসের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে কে শেষে যেন আমাকেই ব্যঙ্গ করে ওঠে। ছুটে পালিয়ে আসি সেখান থেকে। ফিরে যাই আবার পরদিনই। না গিয়ে পারি না।

শেষ-বেলার সূর্য প্রতিদিনই শিশমহলকে সরাবে চুবিয়ে রাখে। নেশা কাটে না কিছু দিন থেকে এ নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে।

এমনি একদিন। প্রতিদিনের মতো কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলা শিশমহলের দিকে। কাছাকাছি এসে সহসা যেন মনে হল শিশমহল নির্জন নয় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর শিশমহলের দেয়ালের ভেতরে কারও ছায়া ভে উঠল। তবে কি মা? না না, আট সন্তানের জননী মমতাজ বেগমের অনে দায়িত্ব। সমাধির বন্দী জীবন যদি তাঁর ভাল না লাগে, তবু তিনি শিশমহলে আসে যাবেন না। বাদশাহের পাশে পাশে থাকবেন তিনি।

অন্য এক আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে। মায়ের মুখে শোনার পর থেকে হারেমে বয়স্কা শাহ্‌জাদী, আমার পিতৃষ্বসা যে কয়জন রয়েছেন, তাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রে এসেছি। মা সত্যি কথাই বলেছিলেন। এঁরা কেউ-ই ঠিক স্বাভাবিক নন। বয় হয়েছে, অথচ গাম্ভীর্যের অন্তরালে একটা কুৎসিত কিছু তাঁদের মনকে সবসময়ই নাড় য়ে। তাঁদের কথাবার্তা আর ব্যবহারের মধ্যে সেগুলি মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে ওঠে াদেরই কেউ কি শিশমহলের নির্জনতায় গিয়ে অস্বাভাবিক জীবনের জ্বালা জুড়াবা ফকিরে ঘুরছেন? আত্মহত্যা করার অমন আদর্শ স্থান তো একটিও নেই হারেম ইচ্ছে করলে লাফিয়ে পড়া যেতে পারে ওপর থেকে। কিংবা দড়ি নিয়েও ঝুলে পড় যেতে পারে। একদলা আফিমও দুর্লভ নয় মুঘল-হারেমে।

ওই আবার। স্পষ্ট এক নারীমূর্তির ছায়া। পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্রু যে পথে এসেছিলাম সে পথে ছুটে যাই। জানাতে হবে কাউকে। অন্তত কো নাজীর কিংবা কোন খোজাকে। তাদের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে এলে অবস্থা আয় আনা সম্ভব হবে না হয়তো।

কিছুদূর ছুটে নিজের উত্তেজনায় নিজেই সঙ্কুচিত হই। সামান্য জিনিসটিকে আ কাচের মধ্যে দিয়ে দেখছি ভেবে নিজেকে ধমক দিই। হয়তো কিছুই নয়। আম মতো কেউ শিশমহলে গিয়ে শোভা উপভোগ করছে মাত্র।

আবার এগিয়ে যাই। এবারে দৃঢ় পদক্ষেপে।

একটি জানালা খোলা ছিল শিশমহলের। ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে উঁকি দি ভেতরের দৃশ্য দেখে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

কোন পিতৃষ্বসা নয়। রোশনারা। হ্যাঁ রোশনারা সে। একলা নয়। হারে তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অল্প বয়সী সুন্দর খোজা—সেও রয়েছে আমার বোন রোশনারা—শাহানশাহ্‌ শাহজাহান-নন্দিনী রোশনারা বসে রয়ে

খোজার কোলের ওপর। হঠাৎ কি যেন মনে হয়। বিষধর সর্পিনীর মতো রোশনারা ছিটকে তার কোল থেকে নেমে পড়ে। ভীষণভাবে চপেটাঘাত করে তার দুই গালে। তারপর পদাঘাত করে তাকে।

বিহ্বল দৃষ্টিতে খোজাটি একবার তার দিকে চায়। শাহ্‌জাদীর ক্রোধের কারণ সে অনুধাবন করতে পারে না। শেষে শান্তভাবে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বার হয়ে যায়। তার মুখের পানে চেয়ে দেখি এই নাটকীয় ঘটনা তার দেহ-মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে নি। বরং একটা শঙ্কার ছাপ—শাহ্‌জাদীকে সে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ব্যথা অনুভব করি তার জন্য। ব্যথা অনুভব করি সমস্ত খোজাকুলের জন্য। অমন চমৎকার স্বাস্থ্য নিয়েও তারা একাকী। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধের দুয়ার তাদের কাছে চিরদিনের জন্য অর্গল-বদ্ধ।

খুব নীচু গলায় ডাকি,—রোশনারা।

—কে? আঁতকে ওঠে রোশনারা।

—আমি।

জানালার কাছে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে সে। ফাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে,—তুমি, তুমি দেখেছো?

—হ্যাঁ।

দরজা দিয়ে বাইরে বার হয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে আমার বোন।

—ছিঃ এ কি করলি রোশনারা? ওরা কি পুরুষ? পুরুষ হলে বেগম-মহলে কি ওদের ঠাঁই হত।

—ওরা যে এমন তা জানতাম না।

—ছি ছি।

—ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে মনে হয় দিদি।

—ভুল। ভবিষ্যৎকে ইচ্ছে করলে উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে পারিস।

—স্বপ্নের কথা বলছ।

—না, স্বপ্ন নয়। মায়ের মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি শাহ্‌জাদীদের চিরকুমারী রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না।

—মা মৃত।

—তাঁর মনোভাব বাদশাহ্‌ নিশ্চয়ই জেনেছেন।

—জেনেও লাভ নেই।

—কেন?

বাদশাহের অতটা হিম্মত হবে না। চিরাচরিত প্রথা মেনে চলতেই তিনি অভ্যস্ত। নতুন কিছু ভেঙে গড়ার মতো বলিষ্ঠ তিনি নন।

—এ কথা তুই বলতে পারলি তাঁর সম্বন্ধে।

—পারলাম। কারণ আছে তার। আওরঙজেব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

—আওরঙজেব দেখছি তোর পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছে।

—ঠাট্টা করতে পার। কিন্তু ভাইদের মধ্যে সে ছাড়া আর কাউকে তো মানুষ বলে ভাবতে পারি না। প্রাসাদে থেকেও একমাত্র তাকেই দেখি সমস্ত, ভোগ বিলাসিতা থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছে। অন্যান্য ভাইরা বিলাসিতায় মত্ত, আর ও মৌলবীর কাছে নিয়মিত শিক্ষা নিয়ে চলেছে। ও খাঁটি মুসলমান।

—হুঁ। মোল্লাশালের শিক্ষায় শিক্ষিত বটে। আর দারা? সে আওরঙজেবের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত, অনেক জ্ঞানী।

—কিন্তু সে মুসলমান নয়। সে আকবর শাহের ভেজাল ধর্মের প্রতীক।

—দেখ্ রোশনারা, আমি জানি এত কথা বলার কিংবা বোঝবার বয়স তোর হয় নি। এখন থেকেই তুই অন্যের হাতের পুতুল হয়ে পড়ছিস। সাবধান হ'। অন্যে যেভাবে সুতো নাড়াবে সেভাবে নাচিস না।

—আমি জানি আওরঙজেবকে তোমরা কেউ দেখতে পারনা।

—পারি। সে ও আমার ভাই। কিন্তু তার স্বভাবের কতকগুলো জিনিস আমার ঠিক ভাল লাগে না। হয়তো বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সে শুধরে নেবে।

—না শুধরোলেই আমি খুশী হব। শুনছি রাজকার্যে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা তাকে দক্ষিণ ভারতের ভার দিয়ে পাঠাবেন ভালই করবেন। নিজের মতো থাকতে পারবে সে।

—কিন্তু বাদশাহ্‌কে আওরঙজেব দুর্বলচিত্ত ভাবল কি করে?

—তাঁর এতদিনের কার্যকলাপ বিচার করে। সে বলে, প্রথম জীবনে বিদ্রোহ ছাড়া বাবা আর কিছুই করেন নি। তিনি আকবরশাহ্ আর জাহাঙ্গীরের সারা জীবনের পরিশ্রমের মধুটুকু পান করে চলেছেন।

আওরঙজেবের ধৃষ্টতায় হতবাক হই। উনিশ বছর বয়স না হতেই বাদশাহের সমালোচনা করে সে। রোশনারার কথার জবাব অবধি দিতে পারি না। আমি জানি, শাহানশাহ্ শাহজাহান শান্তিপ্রিয় হলেও দুর্বল মোটেই নন। স্বাধীভাবে তিনি অনেক বিদ্রোহ দমন করেছেন। তাঁর উদার মন বিশ্বাসের দ্বারা দেশের আমীর ওমরাহদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে, যার ফলে দেশের কোথাও কোন অশান্তি

ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। আওরঙজেবের হয়তো ধারণা—অবিশ্বাস আর যুদ্ধই বলিষ্ঠতার পরিচয়। আল্লার কৃপাই বলতে হবে যে সে বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নয়—
—জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকো।

—রোশনারা, বাদশাহ্ দুর্বল কিনা ইতিহাস তার বিচার করবে। তবে এটুকু তোকে বলতে পারি, যে-ভাবে তুই নিজের পরিতৃপ্তির পথ খুঁজতে শুরু করেছিস, জানতে পারলে, সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি তোকে ক্ষমা করবেন না।

—জানি। তবু জেনে রাখো দিদি, প্রতিনিয়ত আমি এই একই চেষ্টা করে যাব।

শিশমহলের বাইরে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে চেয়ে রোশনারা বুক ভরে হাওয়া টেনে নেয়। আমার মুখের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে থাকে সে। অন্তরে আমার কোন্ ভাবনা তোলপাড় করছে, হয়তো তা অনুধাবনের চেষ্টা করে। এক সময়ে তার কচি মুখে মৃদু হাসি ফোটে। আমার বুকের ওপর একখানা হাত রেখে বলে,—দিদি, অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে হাহুতাশ করার জন্যে মানুষের জন্ম হয় নি। তার জন্মের এক বিরাট সার্থকতা রয়েছে।

চমকে উঠি আমি তার কথায়।

রোশনারা শিশমহল ছেড়ে চপল পদক্ষেপে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে যায়। তবু আমি তার গমনের পথে চেয়ে থাকি। কথাগুলি যেন সে বলল না। বলল এক অদৃশ্য শক্তি,—নিয়তির মতো যা অমোঘ।

দূরে—প্রাসাদ পার হয়ে কোন প্রান্তরের মধ্যে মিষ্টি গলায় কে যেন গেয়ে উঠল আবু দাইদের গান। সে গান দোলা লাগায় আমার মনে। একাকী দাঁড়িয়ে আমি শুনি, কান পেতে শুনি।

সে রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যায় না। অথচ না বললে চলবে না। রোশনারার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিতাব দু'খানায় প্রতিটি অক্ষর সত্যি লিখব—মিথ্যের নামগন্ধ থাকবে না তাতে।

কিন্তু বলতে গিয়ে কান গরম হয়ে উঠছে। নিজের অস্তিত্বে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। পৃথিবীতে আমি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী যদি আর না থাকত, তবু স্বপ্নের বিবরণ নিজের কানকে শুনিয়ে উচ্চারণ করতে পারতাম না। ছি ছি।

রোশনারার কাছে আমি মনে মনে অপরাধী হলাম। প্রমাণ হয়ে গেল, তাতে [illegible]তে কোন তফাত নেই। জেগে উঠেই সব স্বপ্নের মতো একেও উড়িয়ে দিতে [illegible] বিবেকের [illegible] সহ্য করতে হত না। কিন্তু তা তো পারি নি।

ভোর রাতের স্বপ্ন টুটে গেল। মৃদু সমীরণে রজনীগন্ধার লুপ্তপ্রায় সুবাস। চোখ মেলেই শেখ ইবন্-উল-আরাবীর মতো শক্তি লাভের জন্যে আল্লার কাছে সজল নয়নে আকুতি জানালাম। শেখ ইবন্ চিন্তাশক্তি দ্বারা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার দুর্লভ রহস্য জানতেন।

বলব সেই লজ্জার কথা? বলেই ফেলি। হাজার হলেও মুখ ফুটে তো বলতে হচ্ছে না। লেখা আর বলা এক কথা নয়।

দেখলাম শিশমহলের ওপরে দাঁড়িয়ে আবু সাইদের প্রেমের গান এক সময়ে আমাকে আকুল করে তুলল। সামলাতে পারলাম না নিজেকে। সবার অলক্ষ্যে বের হয়ে পড়লাম প্রাসাদের ঘেরা প্রাচীরের বাইরে। সংগীতের সুর ভেসে আসছে তখনো প্রান্তরের দিক থেকে। সেদিক পানে চলতে শুরু করি। আমার গায়ের ওড়না পথের ধুলোয় লুটোতে লুটোতে চলে। দেখলাম, তবু তুলে নেবার শক্তি হল না নিজের হাতে। সংগীত আমার দেহমনকে অবশ করেছে। আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। এ পথে, যমুনার তীর বেয়ে গেলেই তো হিন্দুদের তীর্থস্থান বৃন্দাবন। আমি জানি বৃন্দাবনের সেই শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী। জানি, রাধিকা আর তাঁর অভিসারের কথা। সেই পথেই হয়তো কোন এক সুদূর অতীতে অভিসারে চলেছিলেন তিনি। আজ আমিও চলছি এক অচেনা দুর্গম পথে। আমার নায়ক কে?

আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীতে। আমি এগিয়ে যাই। শেষে এক সময়ে দূর থেকে দেখতে পাই তাকে। আমার বুক নেচে ওঠে। ধীরে ধীরে উপস্থিত হই গায়কের একেবারে পাশটিতে।

বিস্ময় এক! এযে রোশনারা কর্তৃক বিতাড়িত খোজা। এত মিষ্টি তার গলা? উদাস স্বরে গেয়ে চলেছে সে। কোনদিকে দৃষ্টি নেই তার। চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু ঝরে পড়ছে। তার অতি সুন্দর মুখখানা ব্যথায় থমথমে। প্রাণের দরদ দিয়ে সে গেয়ে চলেছে।

সহসা সন্দেহ হল মনে। সত্যিই কি খোজা? খোজা কি এমন দরদ দিয়ে গাইতে পারে?

ধীরে ধীরে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াই। আমার গায়ের খুশবু পেয়ে সে যেন সংবিৎ ফিরে পায়।

সে বুঝতে পারে শেষে। আমার দিকে চেয়ে তার সর্বশরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। সে বিহ্বল।

ধীরে ধীরে ডাকি,—শোভান!

—শাহজাদী।

এ কি তোমার মনের কথা ?

ভানের মুখ নীচু হয়। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ তোলে। ধীর গম্ভীর স্বরে
।,—হ্যাঁ শাহ্‌জাদী।

কিন্তু কী করে সম্ভব ?

ধারে শোভানের মুখ অস্পষ্ট। কিন্তু তার অশ্রুপূর্ণ চোখদুটি স্থির সরোবরের
তা টলটল্‌ করছিল। সেই চোখের দৃষ্টি কয়েকদণ্ড আমার চোখের সঙ্গে জট-
কিয়ে যায়।

আমি খোজা নই শাহ্‌জাদী।

তবে ?

আমি পুরুষ।

ক-শিহরণ প্রবাহিত হয় আমার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায়। তার সুঠাম
হের ওপর হাত রেখে বলি,—সত্যি বলছ তুমি ?

হ্যাঁ। আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে—এ যেমন সত্যি। এই দিনকে
তদিন স্বপ্ন বলে ভাবতাম।

শোভান। তবে তুমি—

হ্যাঁ। কত কৌশলে খোজা বলে নিজের পরিচয় দিয়ে হারেমে থাকার অধিকার
যেছিলাম।

-কিন্তু কেন ? কেন এই প্রবঞ্চনা ? তুমি কি জান না এর শাস্তি কত ভয়ঙ্কর ?

-জানি।

-তবে ?

কী-বেগমের প্রাসাদের উদ্যানে এক সন্ধ্যায় যাকে হঠাৎ দেখে ফেলেছিলাম, তাকে
না দেখে থাকার কথা কল্পনাও করতে পারি না শাহ্‌জাদী। তাই প্রবঞ্চনার
াশ্রয় নিতে হল। আমি জানি—ধরা পড়ব আমি। মৃত্যুদণ্ড হবে। তবু খেদ
কবে না।

-কাকে দেখেছিলে শোভান ?

চুপ করে থাকে। পাথরের মতো স্থির তার বলিষ্ঠ দেহখানি। চেয়ে থাকি
ামি সেইদিকে কয়েক মুহূর্ত। অন্তরে আমার অদমনীয় কৌতূহল। অথচ তার
ক্রতার দিকে চেয়ে আবার প্রশ্ন করতে মন সায় দেয় না। সে যেন কোন
াদৎখানায় বসে আল্লার কাছে প্রার্থনারত।

র্ব সময় পার হয়ে যায়।

—শিশমহলে তোমার সঙ্গে রোশনারার ব্যবহারের আমি একমাত্র সাক্ষী।
ভীত হয় শোভান। আমিও তাই চাই। আমার মনের গভীর অন্ধকারে হিংসা
বীজে কে যেন জলসেচন করেছে। সে বীজ ফেটে অঙ্কুর বার হয়েছে। (
অঙ্কুর আলোর জন্যে ছট্‌ফট্ করে মাটি ভেদ করে ওপরে উঠতে চায়।
—রোশনারার ব্যবহারে আমি লজ্জিত। কিন্তু যার জন্যে এতখানি দুঃসাহ
হলে তুমি, তাকে পেয়ে কি তোমার স্বপ্নসৌধ চুরমার হয়ে গেল শোভান ?
শোভান কি যেন বলার চেষ্টা করে। আমি থামিয়ে দিই। আমি নিষ্ঠুর। আঘাতে
পর আঘাত হেনে ওর হৃদয়কে রক্তাক্ত করে তুলব।
—কোন বৈলক্ষণ্য দেখলাম না শোভান তোমার দেহে কিংবা মনে রোশনারা
পরশে। ঠিক যেন সত্যিকারের খোজা। কেন শোভান ? কেন এমন ব্যবহা
করলে ? সবই তো পেয়েছিলে। স্বপ্নকে স্বার্থক করে তুললে না কেন ?
—শাহ্‌জাদী। অতিকষ্টে মুখ খোলে শোভান।
—তুমি কি শুধু মন চাও ? আমাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে ?
আর্তনাদ করে ওঠে শোভান। সে আর্তনাদ আকাশ চিরে, বাতাস চিরে কিসে
পানে যেন ধাওয়া করে। খুশী হই আমি। খুব খুশী হই।
—তেমনভাবে ভাবলে রোশনারার চপেটাঘাত কি খুব অন্যায় হয়েছে শোভান ?
ভাঙা গলায় শোভান বলে ওঠে,—সব ভুল। সব ভুল শাহ্‌জাদী। আপনি ভু
বুঝেছেন।
—ভুল ?
শোভান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। আমার পানে চায়। সে দৃষ্টিতে কিসের যে
ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতা-ভরা চাহনি দিয়ে আমার দৃষ্টিকে বন্দী করে রেখে (
বলে,—আপনার বোনকে আমি তুর্কী-বেগমের উদ্যানে দেখি নি।
—কাকে দেখেছিলে তবে ?
—তোমাকে, তোমাকে জাহানারা। আমাকে ধরিয়ে দাও। মৃত্যুদণ্ড দাও
তবু বলব তোমাকে দেখেছিলাম। তারই জন্যে এত প্রবঞ্চনা—তারই জন্যে এ
গোপনীয়তা। আর শুধু তারই জন্য রোশনারার স্পর্শে আমার পৌরুষ গ
পড়ে নি।
চতুর্দিকে আমার যেন সব শূন্য হয়ে যায়। আমার পাশে কিছু নেই। আমা
পায়ের নীচে কিছু নেই, কোনদিকে কিছু নেই। আশ্রয়ের জন্যে আকুল হয়ে হা
বাড়াই। আশ্রয় মেলে। শোভানের বক্ষের নিবিড়তা।
এবারে আমার কান্নার পালা।

। ভেঙে যায়।

াকুল হয়ে আল্লাকে ডাকি। শেখ ইবন্-উল-আরাবীর শক্তি আমাকে দাও আল্লা।
কে আমি সার্থক করে তুলি।

র যমুনার কুলে বাইশ হাজার কর্মরত শ্রমিকের কোলাহল বকুল গাছের ভ্রমর-
গুঞ্জনের মতো প্রতিদিন কানে ভেসে আসে। এই গুঞ্জন আমার মনকে এক
বর্ণনীয় বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তোলে। নিজের ভাইবোনদের তখন বড়ই আপন
ল মনে হয়। দুর্বিনীত রোশনারার ওপর তখন আর রাগ করতে পারি না।
াল্লাশালের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত শুষ্ক-হৃদয় আওরঙজেবের প্রতি করুণা জাগে।
বছর আগে দক্ষিণ-ভারতের শাসনকর্তা হয়ে গিয়েছে সে। কতই বা বয়স
ল তখন। আমি জানি, বাদশাহ্ ইচ্ছে করেই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।
থ সবাই তার দোষারোপ করে। সে অন্য ভাইদের মতো সহজ সরল নয়। কিন্তু
। জন্যে কি সে দায়ী? বাবার ভাগ্যের ওপর আল্লার কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের জন্যেই
ন তার মনকে কোরবানি দেওয়া হয়েছে। সে-মনকে ফিরে পাবার বাসনা জাগতে
রে। পেলে আনন্দিতও হবে সবাই। কিন্তু না পেলে আওরঙজেবকে দোষ দিয়ে
ভ নেই। তাই বিশেষ করে বাবা যখন তার সমালোচনা করেন হারেমের বেগমদের
মনে তখন মাঝে মাঝে মনে বড় ব্যথা পাই। ব্যথা পাই যমুনাকূলের বাইশ হাজার
মীর কর্মের কলরব কানে আসে বলে।

এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে, বাবা যখন বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
াষণা করে, শেষে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে পাঠালেন তখন
জের সততার নিদর্শন স্বরূপ দারাশুকো আর আওরঙজেবকে রাজধানীতে
ঠিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভুলেরই মাসুল গুণতে হচ্ছে আজ। দারার কিছুটা বয়স
য়ছিল তখন। সে শিক্ষা পেয়েছিল যথেষ্ট তার আগেই। কিন্তু আওরঙজেবের
খন কচি বয়স। শিক্ষার হাতেখড়ি হয় সেই বয়সে। যেবারে মমতাজ বেগম
াসমিন প্রাসাদে নূরজাহানের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন,
বারে নূরজাহান নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে আওরঙজেবের শিক্ষায় বাধা
ষ্ট করার কোন চেষ্টা থেকেই তিনি বিরত হন নি। এমনকি সে যাতে অমানুষ
য় ওঠে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থাও তিনি করে ফেলেছিলেন। আজ নূরজাহান
সব দিনের কথা বলতে গিয়ে জেসমিন প্রাসাদের পাষাণের ওপর যত চোখের
লই ফেলুন না কেন, সে জলের ধারা তাঁর নিজের হাতে ছোপ দেওয়া

আওরঙজেবের হৃদয়ের কালিমা কিছুতেই ধুয়ে সাফ্ করে দিতে পারবে না।
হয়তো পারা যেত। কিন্তু দারা বলে, মোল্লাশালের নীরস শিক্ষা সে পথেও অন্তর
হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারা না কি বাদশাহ্‌কে অনেক বুঝিয়েছিল যে আওরঙজে
জন্যে একজন প্রকৃত জ্ঞানী শিক্ষাগুরু নিয়োগের জন্যে, বাদশাহ্ শোনেন নি। যে
যেন ওকে তিনি দেখতে পারেন না। আমীর ওমরাহেরা বলাবলি করে, এম
কারণ আওরঙজেবের ক্ষুরধার বুদ্ধি। হারেমের বেগমরা ফিসফিস করে বা
আওরঙজেবের অপরূপ রূপই এর কারণ। পুত্রের প্রতি পিতার অবচেতন মে
ঈর্ষা। জানি না কোন্‌টি সত্যি, কোন্‌টি মিথ্যা। কিংবা কোনটাই সত্যি কি ন
শুধু কষ্ট হয়। কষ্ট হয় যমুনাকূলের কলরব, গুঞ্জনের মতো ভেসে আসে বলে।
গুঞ্জন মনে করিয়ে দেয় আমরা ক'টি ভাইবোন যে মায়ের গর্ভে জন্মেছি, তি
আমাদের ছেড়ে বেহেস্তের পথে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছেন। আমরা মা-হারা
সেই মায়ের সমাধির ওপর বাদশাহ শাহ্‌জাহানের আদেশে দিনের পর দিন তি
তিলে গড়ে উঠছে তিলোত্তমা।

বোগদাদ, আরব, সিংহল আর মিশর থেকে মহামূল্য স্ফটিকস্বচ্ছ প্রস্তররাজি এ
স্তূপীকৃত করা হয়েছে। পৃথিবীর অদ্বিতীয় হর্ম্য নির্মাণের অদম্য বাসনায় বাদশা
পাগল। নির্মাণ তো নয় যেন রচনা। শিল্পীরা দিনের পর দিন এক একটি ছ
রচনা করে চলেছে কবিতার। এ যেন আবু সাইদ আর নাসীর-ই-খসরুর অ
সমন্বয়—প্রেম আর আধ্যাত্মিকতার মিলনক্ষেত্র।

তাজমহলের প্রধান শিল্পী ইসা-মামুদ-ইফেন্দি। তিনি এক প্রতিভাবান যুবকের ক
বাদশাহ্‌কে বলেছিলেন। সেই যুবকের সাক্ষাৎ পেলাম একদিন পিতার সঙ্গে গিয়ে।
যুবক তন্ময় ছিল। আমাদের উপস্থিতি টের পায় নি। নকশা ছেড়ে সে এখ
পাথর খোদাই-এ মনোনিবেশ করে। তবু খেয়াল করে না।

বাদশাহ্ সহসা প্রশ্ন করেন,—তাজমহলের নকশার পরিবর্তন করছ?

কিছুমাত্র সচকিত হয় না যুবক। আমাদের দিকে না চেয়েই স্বাভাবিক গলায় জ
দেয়,—হ্যাঁ।

—কার হুকুমে?

এবারে যুবক বাদশাহের দিকে চায়। কিন্তু তাঁর পোষাক দেখেও চিনতে পা
না। বলে,—ইসা-মামুদ-ইফেন্দি আমাকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন।

—তাঁর নকশা অনুযায়ী কাজ হলে কোন অসুবিধে হত?

—তিনি খুবই উঁচুদরের শিল্পী। তবে আমার এই পরিবর্তনে তিনি অনুমা
দিয়েছেন। আপনি বাদশাহ্?

—হ্যাঁ।

যুবক আচম্‌কা লাফিয়ে উঠে অভিবাদন করে। রীতিমতো অপ্রস্তুত হয় সে। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আমি হেসে ফেলি।

এরপর প্রতিদিন তাজমহলে গিয়ে বাদশাহ্ শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে তার বেহেস্ত-ছোঁয়া দৃষ্টির দিকে চেয়ে থেকেছেন। কোন কথা বলেন নি তাকে। কথা বললে তার স্বপ্ন ভেঙে যাবে—সে বাস্তব জগতে ফিরে আসবে। বাদশাহ্ তা চান না। কত সময় শিল্পী তাঁকে 'সিজদা' করে নি—উঠে দাঁড়ায় নি। এমনকি কথা পর্যন্ত বলে নি। অথচ বাদশাহের মুখে তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই নি আমি।

তবু একটি জিনিস আমার নজর এড়ায় না। 'শিল্পীর প্রতি ভুলেও কখনো শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে দেখি নি তাঁকে। প্রধান শিল্পী ইসা-মামুদের প্রতিও নয়।

বাদশাহ্ পুরুষ। তাঁর বাস্তববুদ্ধি প্রখর। তিনি জানেন, আজ থেকে অনেক বছর পরে প্রকৃতি যদি করুণা করে তাজমহলকে বাঁচিয়ে রাখে, তখন ইসা-মামুদ কিংবা অন্য শিল্পীকে সবাই ভুলবে। কিন্তু শাহানশাহ্ শাহজাহানের কথা কেউ ভুলতে পারবে না। প্রতিদিন পিতার তাজমহল পরিদর্শনের সময় তাঁর নিত্য-সঙ্গী হিসাবে আমার সব আনন্দের মধ্যে এইটুকুই শুধু দুঃখ।

ইসা-মামুদের এই তরুণ সহকারীর মনের কথা জানবার অদম্য কৌতূহল হয় আমার। দিনের পর দিন চেষ্টা করেও সে কৌতূহলকে সংযত করতে ব্যর্থ হই।

শেষে দুঃসাহসী হয়ে উঠি। আমার পরম বিশ্বস্ত নাজীর কোয়েলের কাছে একদিন তার অতি সাধারণ একপ্রস্থ পরিচ্ছদ চেয়ে বসি। কোয়েল কিছুক্ষণ হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি দেখে সেই জানে। শেষে উঠে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে নিয়ে আসে পোষাক।

—এ যে হিন্দুর পোষাক কোয়েল।

—আমি মুসলমান কবে হলাম শাহ্‌জাদী!

হিন্দুর পোষাকে তোমাকে তো দেখি নি কখনো।

—হারেমের বাইরে নগরীর রাজপথে আমি নাজীর নই। সেখানে আমি হিন্দু রমণী। রাজপুত।

—কিন্তু এ পোষাকে যে চলবে না।

একদণ্ড স্থির হয়ে থেকে কোয়েল প্রশ্ন করে;—শাহ্‌জাদী, অপরাধ না নিলে জানতে পারি কি কেন আপনার এ খেয়াল হল?

কোয়েলকে গোপন ইচ্ছার কথাটি জানাতে প্রবৃত্তি ছিল না কারণ তাকেই সঙ্গী

হিসাবে নিতে হবে। বললাম তাকে সব কিছু খুলে। যদিও বাদশাহের মনোভাবের কথা জানতে দিলাম না।
কোয়েলের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। বলে,—বড় বেশী ঝুঁকি নিচ্ছেন শাহ্‌জাদী।
—জানি।
—না গেলেই ভাল করতেন।
—আমি যাব।
আমার দৃঢ়তা দেখে কোয়েল চুপ করে থেকে শেষে বলে,—এ পোষাকেই যান তবে।
—কেন?
—রাজপুত রমণী মুসলমানের মতো অতটা পর্দানসীন নয়। অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলার সুবিধা হবে আপনার।
আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কোয়েলের বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না। কিন্তু পরক্ষণেই নিরাশ হই। এ-বেশে হারেম থেকে বাইরে যাওয়ায় অনেক বিপদ। কারণ হারেমে এ-বেশে কেউ ঘুরে বেড়ায় না।
কোয়েল আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বলে ওঠে,—আপনি হতাশ হবেন না শাহ্‌জাদী। ওড়নাটা গায়ে জড়িয়ে চলে গেলে কেউ বুঝতে পারবে না। তবে আজকের দিবানিদ্রার মোহটুকু ছাড়তে হবে আপনাকে। দুপুরেই আসল সময়। সবাই ঘুমিয়ে থাকবে। পেছনের দরওয়াজার প্রহরীকে শুধু বশ করা।
—কি করে বশ করবে?
কোয়েল বুড়ো আঙুলের সঙ্গে তর্জনী ছুঁইয়ে হাসিমুখে ইশারায় জানায়—টাকা।
সারা ভারতের সর্বকালের সব চাইতে ঐশ্বর্যশালী বাদশাহের নন্দিনী হয়ে নিজের হারেম থেকে চুপিসাড়ে বার হবার জন্যে নিজেরই এক প্রহরীকে ঘুষ দিতে আমার গজদন্তের পেটরা খুলে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা কোয়েলের হাতে তুলে দিই। জানি অন্যায় করছি—খুবই অন্যায় করছি। কিন্তু উপায় নেই।
নিজের হাতে আমাকে রাজপুত রমণীর বেশে সাজিয়ে দেয় কোয়েল। আগ্রহভরে পরে ফেলি আমি। আমাদের পোষাকের সঙ্গে ওদের পোষাকের কত মিল, আবার কত অমিল। পোষাকের অমসৃণতা আমার ত্বক প্রথমটা সহজভাবে নিতে পারে নি। একটু জ্বালা ধরায়। কিন্তু আমার ইচ্ছার প্রবলতা সে জ্বালাটুকুর কথা ভুলিয়ে দেয়। সহজ হয়ে আরশির সামনে গিয়ে নিজের নতুন রূপ দেখে হেসে ফেলি। কোয়েলও কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে হাসছে ভেবে মুখ ফেরাই।
কোয়েল গম্ভীর। আমার দিকে তার চোখ ছিল না। গবাক্ষের বাইরে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে ব্যথাভরা দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে।

—কি হল কোয়েল? হাসছ না?

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে মুখে জোর-করা হাসি টেনে সে বলে,—এই তো হাসছি শাহ্‌জাদী। বেশ মানিয়েছে।

—আমাকে কি এতই বোকা ভাব তুমি?

—সে কি শাহ্‌জাদী! কোয়েলের কথায় অপার বিস্ময়।

—আমি ভুলছি না। বল, কেন তুমি গম্ভীর। কি ভাবছ তুমি?

—আমাদের কি ভাবনার অন্ত আছে শাহ্‌জাদী? সে সব কথা না-ই বা শুনলেন।

—না, বল। আমার গলায় আদেশের স্বর।

বেশ কিছুক্ষণ কাটে। তবু কোয়েল চুপ করে থাকে। তার মাথা নীচু। বুঝতে পারি, যে কথাই হোক, বলার ইচ্ছে ছিল না তার। শুধু আমার আদেশ বলেই বলবে। প্রস্তুত হচ্ছে তার জন্যে মনে মনে।

আমার দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে কোয়েল বলে,—এই পোষাক ছিল আমার বোনের শাহ্‌জাদী। এটি পরতে গিয়ে আপনার কত অস্বস্তি। অথচ আমার বোন প্রাণভরে পরতে চাইত না। তার সব চাইতে ভাল পোষাক ছিল ওটি। বাড়ির কেউ ওতে হাত দিলে সে কিভাবে যেন টের পেত। যেখানেই থাকুক, ছুটে আসত হন্তদন্ত হয়ে। মা রাগ করতেন কত। ঠাকুমা হেসে বলতেন, পাগলী। বিয়ে হলেই ঠিক হয়ে যাবে। ওর বাপও ঠিক অমনটি ছিল। ঠাকুদার তলোয়ার ছিল তার প্রাণ। কেউ হাত দিতে পারত না। শেষে তলোয়ারই তার কাল হল।

—বোনটি কোথায়? বিয়ে হয়েছে কতদিন?

—বিয়ে তার হয় নি শাহ্‌জাদী।

—তবে? কোথায় সে?

কোয়েল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে আর একবার চেয়ে আঙুল দিয়ে দেখায়।

আমার গায়ের মধ্যে শিউরে ওঠে। পোষাকটিকে ভারী বোঝা বলে মনে হয়। ছেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি। চেঁচিয়ে উঠি,—কি করে অমন হল?

—যমুনায় নাইতে গিয়েছিল বন্ধুদের নিয়ে। সবাই ফিরে এল, ও এল না।

—আমায় আগে বল নি কেন? পরতাম না তোমার বোনের জিনিস।

—সে কি শাহ্‌জাদী!

—তার স্মৃতি বিজড়িত জিনিসটি না আনলেই পারতে কোয়েল। তাছাড়া তার মন এত মায়া ছিল এটির ওপর।

—সে বেঁচে থাকলে, আপনি পরবেন জানলে ছুটে এসে দিয়ে যেত। আপনি তো

একবার মাত্র ব্যবহার করবেন। আবার তুলে রেখে দেব। একটি স্মৃতির জায়গায় দুটি স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে ওটির সঙ্গে।

তবু মনের ভেতরে একটা দ্বিধা থাকে। সেই দ্বিধা নিয়ে দুপুর হতেই কক্ষ থেকে বার হই। কোয়েল আগে আগে চলে। সব দিকে ভাল করে দেখে শুনে নিয়ে সে ইশারা করে, আর আমি একটু একটু করে এগিয়ে যাই। কক্ষের পর কক্ষ পার হই। নিস্তব্ধ সব! ঘুমন্ত পুরী। শুধু খোজাদের ভারী পায়ের মশমশ শব্দ এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসে। হারেমের নাজীরদের আড্ডাখানা থেকে চাপা কথা আর কুৎসিত হাসির মিলিত আওয়াজ শুনতে পাই। এ সময়ে তাদেরও বিশ্রাম। কোয়েলের মুখে শুনেছি, তারা এ সময়ে নিজের নিজের বেগমদের কেচ্ছার কথা আলোচনা করে, নারকীয় আনন্দ উপভোগ করে।

দরজার প্রহরী দূর থেকে আমাকে আর কোয়েলকে দেখে মুচকি হেসে দূরে সরে যায়। প্রাসাদের বাইরে পা দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হই।

শিল্পী এখনও পাথরের ওপর নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম খোদাই-এর কাজ করে চলেছি[ল] একমনে। কোয়েলকে একটু দূরে অপেক্ষা করতে বলে আমি তার পেছনে গি[য়ে] দাঁড়াই। দেখতে পায় না আমাকে। অমনভাবে যদি আরও বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি আমি তবু দেখতে পাবে না সে। সে তন্ময়—মনের রসকে রূপ দিচ্ছে। সৃষ্টির উন্মাদনা তার শিরা-উপশিরায়। আমি সেই অপূর্ব সৃষ্টি অবাক্ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করি। মায়ের সমাধি-সৌধ পরিশেষে কী রূপ নেবে, পৃথিবীর শুধু দুজন মানুষ তা জানে। সে দুজনের একজন আমার সামনে। ভাবতেও ভাল লাগে।

আমি জানি প্রস্তরখণ্ডের ওপর ওই সূক্ষ্ম খোদাই-এর কাজ শেষ হলে শিল্পী সেটি অন্যা[ন্য] ভাস্করের সামনে রেখে নির্দেশ দেবে ওটি দেখে প্রয়োজনমতো দৈর্ঘ্য-প্রস্থের প্রস্ত[র] খোদাই করতে। সেই খোদাই করা প্রস্তরখণ্ডগুলি সযত্নে দড়ি দিয়ে তুলে হর্ম্যে[র] এক একটি স্থানে স্থাপন করা হবে। শিল্পী জানে কোথায় হবে তাদের স্থান। কার[ণ] ইসা-মামুদের প্রিয় সহকারী সে।

শিল্পী ঘামছিল। সূর্যরশ্মির প্রখরতা ততটা না থাকলেও সে ঘামছিল। অতিরি[ক্ত] একাগ্রতা মস্তিষ্ক ও দেহে যে চাপের সৃষ্টি করে তাতেও মানুষ ঘামে। শিল্পীর কামি[জ] ভিজে উঠেছিল। তার কানের পাশ বেয়ে ঘাম পড়ছিল পাথরের ওপর। ওড়না দি[য়ে] ওর মুখ মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হল আমার। এত বড় একটা কাজ যার পরিচালনায় এগি[য়ে] চলেছে তাকে বড় অসহায় বলে মনে হল। ঠিক একটি ছোট্ট শিশুর মতো—যে [শুধু] খেলতেই জানে, নিজের ভালমন্দ বোঝে না।

এক সময় সে হঠাৎ কাজ থামায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান্ ভাবে দেখে পাথরের ও[পর]

নিজের কাজ। পরিতৃপ্তির শ্বাস ফেলে। তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে একেবারে কাছটিতে আমাকে দেখে অবাক্ হয়।

—কে তুমি?

মাথার ওড়না ফেলে দিয়ে মৃদু হেসে বলি,—আমি।

শিল্পী আমার দিকে চেয়ে থাকে। চোখের পলক পড়ে না তার। তার চাহনির আদি অন্তের হদিস মেলে না। বহুদূর থেকে যেন সে চেয়ে রয়েছে। যেন বহু যোজন দূর থেকে পৃথিবীর ওপর দৃষ্টি ফেলেছে চাঁদ। আমি লজ্জিত হই না। আমার মনে হয় এটাই যেন সব চাইতে স্বাভাবিক। আমি তৃপ্ত হই!

—কী সুন্দর! শিল্পীর কথা অস্ফুট।

—পাথর রয়েছে আপনার। আমার একটা মূর্তি গড়াবেন?

চঞ্চল হয়ে ওঠে শিল্পী। মুখে তার আনন্দের উচ্ছ্বাস। চোখদুটি তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই একটা হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করে। সে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে অস্বীকার করে।

—কেন?

—অনেক সময়ের দরকার। অত সময় তো তুমি দিতে পারবে না আমায়।

—কত সময়ের দরকার।

—অনেক—অনেক। তুমি পারবে না।

—যদি পারি?

গম্ভীর হয় শিল্পী। ধীরে ধীরে বলে,—পারবে না। আমার কাছে তুমি আজীবন থাকতে পারবে?

—আজীবন?

—হ্যাঁ। তোমাকে দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। তার আগে কি মূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারব? এ রূপের যে অন্ত নেই।

চুপ করে থাকি। শিল্পী একটাও মিথ্যে কথা বলছে না জানি। মনে-প্রাণে সে যা বিশ্বাস করে তাই বলছে। তার হতাশা ভাব কেটে যায়। সাময়িক একটা প্রলোভন থেকে সে নিজেকে ছিনিয়ে নেয়। স্বাভাবিক উদাসীনতা ফিরে পায় সে।

—বড় ঘেমেছেন আপনি।

—ও, তাই নাকি? তাই তো।

ওড়নাটা ওর হাতে দিয়ে বলি,—মুছে ফেলুন।

বাধ্য ছেলের মতো সে ওড়নার একপ্রান্ত দিয়ে মুখ মুছে ফেলে সেটি ফিরিয়ে দেয় আমাকে।

আড় চোখে একটু দূরে দণ্ডায়মান কোয়েলকে দেখি। ওড়নাটিও তার বোনেরই। মৃত বোনের জিনিসের ব্যবহার দেখে তার মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়েছে বলে বোধ হল না। সে যেন একটু খুশী।

আমি শাহানশাহ্ শাহজাহানের কন্যা জাহানারা। জীবনে নিজের কোন কাজ বড় একটা করেছি বলে মনে হয় না। অথচ শিল্পীর রোদে-পোড়া মুখের নতুন জমে-ওঠা ঘামের দিকে চেয়ে বলে ফেলি,—হাওয়া করি?

—না। সেকি? না। থতমত খায় সে।

আমিও লজ্জা পাই। ছি ছি। ওড়না দিয়ে হাওয়া করা কোয়েলও ঠিক সাধারণ-ভাবে নিত না। একটু হলেই শাহ্জাদীর সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিতাম।

কর্মব্যস্ত শ্রমিকের নজর পড়েছে আমার ওপর। কাজের ভানে বড় বেশী ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছে আমাদের আশেপাশে। অথচ ঠিক যেখানে শিল্পী বসে রয়েছে সেখানে শিল্পকার্যের নমুনা সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের উপস্থিতির প্রয়োজনই নেই। যেটুকু আছে, তাতে এত শ্রমিকের আনাগোনা বড় বেশী দৃষ্টি কটু।

সংকুচিত হই আমি। ঘাম-মোছা ওড়না মাথার উপর আবার টেনে দিই।

—তুমি এলে কি করে এখানে। মেয়েদের তো এখানে আসতে মানা।

তবু ভাল, শিল্পীরও নজরে পড়েছে তার অধীনস্থদের উগ্র কৌতূহল।

ভাঙা, অকেজো টুকরো-পাথর স্তূপীকৃত করা রয়েছে একদিকে। কয়েকজন লোক তার থেকে বেছে সংগ্রহ করছে নিজেদের পছন্দমতো। সেইদিকে দেখিয়ে বলি,—কয়েক টুকরো নিতে এসেছিলাম।

—সাংঘাতিক।

—কেন?

—আমার খেয়াল ছিল না। নইলে তোমাকে দেখা মাত্র বের করে দিতাম এখান থেকে।

—সত্যিই আসতে নেই মেয়েদের?

—না।

—কি হয় এলে?

শিল্পী সংকুচিত হয়ে বলে,—তুমি বুঝবে না।

—বলুন না।

একটু ইতস্তত করে সে। শেষে বলে,—কত পুরুষ এখানে। বাইশ হাজার। কত দূর দেশ থেকে এখানে এসে কাজ করছে, পরিবারের কাছ-ছাড়া হয়ে! তাই।

—কী তাই ?

—জানি না, চল তোমাকে বাইরে রেখে আসি।

—আপনিও তো দূর দেশের লোক।

—কি করে জানলে ?

—জানতে অসুবিধে আছে নাকি ? চেহারা দেখলে বোঝা যায় না ?

—ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি ঠিক—

হেসে উঠি।

—হাসলে যে।

—এমনি। আচ্ছা এখানে কখনো কোন স্ত্রীলোক আসে নি ?

—না।

—একজনও নয় ?

—না।

—একজনও ?

শিল্পীর ললাটের রেখা কুঞ্চিত হয়। যমুনার জলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে ওঠে,

—একজন আসেন।

—কে তিনি ?

—শাহ্‌জাদী জাহানারা।

—তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন ?

—পাগল নাকি ? তিনি কি তোমার মতো রাজপুত ? তাছাড়া আমার মতো সামান্য লোকের সঙ্গে কথা বলবেন কেন ?

—তাঁকে দেখেন নি ?

—না।

—খুব সুন্দরী নিশ্চয়—তাই না ?

—হয়তো তাই। কিন্তু তোমার মতো কখনই নয়।

—আমি সুন্দরী ?

—জান না। আরশিতে মুখ দেখো না বুঝি। শিল্পীর স্বরে অভিমানের আভাস। আমি কিছু বলতে পারি না। বুকের ভেতরে কেঁপে ওঠে। পুরুষের অভিমান-ভরা কথা কখনো শুনি নি। এই প্রথম শুনলাম। শিল্পীর এই ছোট উক্তিটি আমার হৃদয়ের এক অজ্ঞাত তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে। সে ঝংকার আর থামতে চায় না। শিল্পীর মুখের দিকে চাইতে পারি না আমি। চাইলে দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবে আমার। ... হলেও আমি শাহজাহান-দুহিতা জাহানারা। অসামান্য প্রতিভাবান এই স্রষ্টার

আর যাই থাক সিংহাসন নেই। সিংহাসন না থাকলে, জগতের চোখে, জাহানারার হৃদয়ের শতাংশের একাংশ পাওয়ার যোগ্যতাও তার নেই।
শিল্পীর সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। কোয়েলের অস্তিত্ব অনুভব করি। সে আমাদের অনুসরণ করছে। প্রবল ইচ্ছে হয় তার সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দিতে। রূপসী না হলেও অসুন্দর নয় সে। শিল্পী কি তাকে পেয়ে তৃপ্ত হবে না? যদি তৃপ্ত হত, আমার নিজস্ব কোষাগারের সঞ্চিত অর্থ সব দিয়ে দিতাম ওদের।
যমুনার ধার দিয়ে অনেকটা এগিয়ে আসি, বাইশ হাজার শ্রমিকের আওতার বাইরে। এতক্ষণে আসল প্রশ্ন করি তাকে,—এত যে পরিশ্রম করেন আপনি—কিসের জন্যে? টাকা?
—টাকা? না। টাকা হবে কেন?
—তবে?
—আনন্দ।
—পরিশ্রম করে আনন্দ?
—না। সৃষ্টির।
—আপনার এ সৃষ্টির মূল্য দেবে কে?
—সমস্ত পৃথিবী। কবি কাব্য লেখেন—মূল্য কে দেয়?
ভাবতে সময় নিই। শেষে বলি,—কাব্যে কবির পরিচয় থাকে। তাই তিনি অমর হন। আপনার কি অমর হবার সাধ নেই?
থমকে দাঁড়ায় শিল্পী। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে,—কে তুমি?
—সাধারণ এক রাজপুতের মেয়ে।
—তুমি সাধারণ নও। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি বিদুষী, তুমি অসামান্যা রূপবতী। কে তুমি?
—সত্যি সাধারণ আমি। লেখাপড়া শিখেছিলাম কিছু।
উদাস স্বরে শিল্পী বলে,—অমর হবার সাধ কার না থাকে। সবাই কি হতে পারে? অমর না হতে পারি, সৃষ্টি তো রইল।
—হ্যাঁ, শুধু সৃষ্টিই থাকবে। শাহানশাহের নামকে ছাপিয়ে আপনার নাম কোনদিনও কলারসিকদের কানে পৌঁছবে না।
—কে তুমি?
—বলেছি তো।
—বিশ্বাস হয় না।
—না হোক। আমার কথাটা কিন্তু বিশ্বাস করবেন।

-তা করি। কিন্তু অত ভাবার সময় নেই, আর তো বেশী বাকী নেই। তার পরে
সো। দু'জনে বসে ভাবা যাবে।
-আর আসব না।
-জানতাম।
-কি জানতেন ?
-তোমার মতো মেয়ে দু'বার আসে না।
াল্পীর উদাসীনতায় বিস্মিত হই। শুধু তিনবার জানতে চাইল কে আমি। ব্যস্।
বাব পেল না। কৌতূহলও রইল না। অদ্ভুত।
হসে বলি,—এবার আমি যাই।
াল্পী কথা বলে না। নিদারুণ বিষণ্ণতা তার মুখখানাকে ছেয়ে ফেলেছে। সে
প করে থাকে।
ামার হাসি থেমে যায়। মাথা নীচু করে বলি,—যাব ?
-এসো।
ক-পা এক-পা করে কিছুদূর এগিয়ে যাই। শিল্পী তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। বার বার
িছন ফিরে দেখি আমি। কোয়েল তার কাছ দিয়ে চলে আসে, তবু সে লক্ষ্য
রে না।
ঠাৎ সে ডেকে ওঠে,—একটু শুনবে ? অল্প একটু।
কায়েল থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আমি কোয়েলের পাশ দিয়ে তার কাছে যাই।
কায়েল বড় বড় চোখে চেয়ে ছিল। সেদিকে চেয়ে আমি হাসতে চেষ্টা করি।
ারি না। শিল্পীর ডাক আমার কাছে আল্লার নির্দেশ বলে মনে হয়।
াল্পীর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। চোখ সজল তার। রুদ্ধ আবেগে বক্ষ স্ফীত। কথা
লতে পারে না সে বহুক্ষণ। শেষে অতি কষ্টে বলে,—আমি তোমার নাম জানি
। জানতে চাই না। কোথায় থাকো তাও জানব না। কারণ জানি তুমি
াধারণ কোথাও থাকো না। হয়তো এভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার পক্ষে
ই অন্যায়। তবু—
থেমে যায়। অন্যদিকে মুখ ফেরায়। আমি অপেক্ষা করি।
-তোমার মূর্তি গড়ে দিতে বলেছিলে। আমি গড়ব।
ানকার কাজ শেষ করে আমি গড়ব। এই আগ্রাতেই কোথাও সে মূর্তি স্থাপন
রে দিয়ে চলে যাব আমি। তুমি দেখো। কিন্তু গড়তে হলে যে ভালভাবে দেখে
তে হবে তোমায়। মনের মধ্যে তোমার মূর্তি আজীবন স্পষ্ট হয়েই থাকবে। তবু
র একবার ভাল করে দেখে নিতে চাই। আপত্তি করো না। করবে না তো ?

আমি দাঁড়িয়ে থাকি। শিল্পী চেয়ে চেয়ে দেখে। যেন কত যুগ চলে যায় দেখতে দেখতে—কত জল বয়ে যায় যমুনার বক্ষ দিয়ে। তবু সে দেখার শেষ নেই। আমার মাথাটি ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে চোখদুটি। বড় বড় দু'ফোঁটা জল গাল বেয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে। কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে ওড়না দিয়ে মুছে ফেলে সামনে চেয়ে দেখি সে তখন টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে সমাপ্তপ্রায় স্মৃতিসৌধের দিকে।

পেছন থেকে আলগোছে আমার হাত চেপে ধরে কোয়েল। সে বুঝতে পেরেছিল আমি শিল্পীর দিকে পা বাড়িয়ে ছিলাম।

—কোয়েল? তোমারও চোখে জল?

—স্বর্গীয় কিছু দেখলে চোখের জল সামলাতে পারি না।

—কোয়েল, হারেমে ফিরে গিয়ে তোমার ওড়নাটি আগে নিও। তোমার বোন, আর আমি ছাড়াও আর একটি স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে গেল। তুমি তো দেখেছ।

—হ্যাঁ শাহ্‌জাদী। এ ওড়না এই অবস্থাতেই আমি তুলে রেখে দেব সযত্নে। বহুদিন পরেও এর ওই মলিন অংশটুকু অক্ষয় হয়ে থাকবে।

রোশনারা, শাহজাদীর সম্মান বোধ হয় জলাঞ্জলি দেবে। তার মনের সুতীব্র কামনা আর বাসনা, রূপ হয়ে ফেটে পড়েছে তার দেহ বেয়ে। পুরুষেরা সে রূপের দিকে চাইলে উন্মাদ হয়। রোশনারা জানে সে কথা। পুরুষের সামনে তাই অল্পতেই তার শরীরে ব্যথা লাগে। সে কাতর হয়ে পড়ে। এই কাতরতার মধ্যে তার মনের আদিম ক্ষুধা উৎকটভাবে প্রকাশ পায়। দেখে শিউরে উঠি আমি। সে মনে করে কেউ বুঝি বুঝতে পারে না। পুরুষেরা বোঝে না হয়তো, কিন্তু আমার চোখকে কিভাবে ফাঁকি দেবে সে আমিও যে নারী। যে প্রবৃত্তিগুলি তার মধ্যে দেখা দিয়েছে, আমাকেও যে সেগুলি অহরহ চঞ্চল করে তোলে। কিন্তু ওর মতো আমি ভুলে যাই না যে আমি শাহানশাহ্ শাহজাহানের কন্যা। আর সবার ওপর আমি নারী।

রোশনারা এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মা বেঁচে থাকলে হয়ত একটা সমাধানের পথ খুঁজে দিতেন। কিন্তু তিনি নেই।

হঠাৎ মনে পড়ে জেসমিন প্রাসাদের কথা। হয়তো নূরজাহান এই বিপদে কোন পথ দেখাতে পারবেন।

বাবা পছন্দ করেন না জেসমিন প্রাসাদে যাতায়াত। তাঁর ধারণা যত পরিবর্তনই হোক ভূতপূর্ব দিল্লীশ্বরীর, সুযোগ পেলে নিজ জামাতা শাহরীয়রের মৃত্যুর প্রতিশোধ

তে ছাড়বেন না। অনেক আশা নিয়েই নূরজাহান জাহাঙ্গীরের অপর পুত্র
াহরীয়রের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। আশা ছিল কন্যা একদিন
ার মতোই দিল্লীর অধীশ্বরী হবে। সে আশায় ছাই ঢেলে দিয়েছেন শাহ্‌জাহান।
াই তাঁর ভয়।

। জীবিত থাকতে যখন একবার জেসমিন প্রাসাদে গিয়েছিলেন, মুখে কিছু না
নলেও মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন বাদশাহ্‌। মুখে মায়ের কোন
াজেরই কোনদিন আপত্তি করেন নি তিনি। সেই থেকে জেসমিন প্রাসাদে যাওয়া
হুড়ে দিয়েছিলেন মা।

াই বলে বাদশাহ্‌ কখনো অসম্মান করেন নি নূরজাহানকে। বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ
াকা বৃত্তি বরাদ্দ করে সযত্নে এককোণে সরিয়ে রেখেছিলেন নিজের বিমাতাকে।
় নারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকাকালে মুহূর্তের জন্যেও শাহ্‌জাহানের মঙ্গল
চন্তা করেন নি, তাঁকে এইভাবে সসম্মানে বেঁচে থাকবার অধিকার দেওয়া শাহজাহানের
তো উদার ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

পিতার অজ্ঞাতসারে জেসমিন প্রাসাদে যাবার জন্যে প্রস্তুত হই। গায়ে জড়িয়ে নিই
বাদল-কিনারী' ওড়না। এই ওড়না নূরজাহানেরই আবিষ্কার। ভাবলাম এভাবে
জ্জিত অবস্থায় গেলে প্রথম দর্শনে তিনি খুশীই হবেন। সেই ছোটবেলায় কবে
তিনি আমাকে দেখেছেন, এখন হয়তো চিনতেই পারবেন না।

াউকে সঙ্গে নিই না। কোয়েলকেও না। একা গিয়ে জেসমিন প্রাসাদের
োপানে দাঁড়াই। প্রহরী আর নাজীররা আমাকে দেখে অবাক্‌ হয়। আমার
রিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যে তারা বুঝতে পারে সাধারণ নারী আমি নই। তাই বাধা দিতে
ারে না ভেতরে প্রবেশ করতে। আবার নূরজাহানের অনুমতি ব্যতীত ছেড়ে
ওয়াও বিপদ। শেষে তাদেরই একজন অন্তঃপুরের দিকে দৌড়ে যায়।

াথার ওপর ওড়নাটা ভালভাবে টেনে দিই—এসেই যাতে আমার মুখখানা স্পষ্ট না
েখতে পারেন তিনি। সোপানের ওপর অপেক্ষা করি।

কটু পরেই ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসেন একজন শুভ্রবসনা নারী। কিন্তু একি
প। যে-রূপ এক সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এনেছিল প্রচণ্ড আলোড়ন—
। রূপের উগ্র মোহে বাদশাহ্‌ জাহাঙ্গীর অনেক সময়েই তাঁর ব্যক্তিত্বটুকু পর্যন্ত
সর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি, সে-রূপ এখনো ম্লান হয়ে যায় নি।
খনো তিনি নূরজাহান। ভারতবাসীরা হয়তো তাদের অসামান্যা রূপসী ভূতপূর্ব
ম্রাজ্ঞীকে ভুলতে বসেছে। অন্ততঃ বাদশাহ্‌ শাহজাহানের সদা সতর্ক ব্যবস্থার ফলে
রজাহানের বর্তমান জীবন সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ নেই। কিন্তু একবার যদি এই

শুভ্রবসনা রমণী আগ্রার দুর্গে উঠে ঝরোকা-দর্শন দেবার সুযোগ পান তবে কি শাহজাহানের শান্তির রাজ্যে ঝড় ওঠা একেবারে অসম্ভব ?

হারেম কিংবা দরবারে নূরজাহানের নাম উচ্চারিত হয় না। কিন্তু আমি সোপান-শ্রেণীর ওপর দাঁড়িয়ে অস্ফুটস্বরে বার বার বলি,—নূরজাহান—নূরজাহান—নূরজাহান।

মায়ের অসামান্য রূপ দেখেছি। যেন শিশির-স্নাত একগুচ্ছ বসরার গুলাব। তবু যেন তাতে কিসের অভাব ছিল। সমালোচকের নিক্তির বিচারে হয়তো মা অধিকতর রূপসী। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে তাঁর রূপ নূরজাহানের মতো এতখানি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কি ?

শুনেছি বড় উগ্র ছিল নূরজাহানের রূপ। কিন্তু কোথায় সেই উগ্রতা ? তবে কি আঘাত পেয়ে সে উগ্রতা বিনষ্ট হয়েছে ? হয়তো তাই। আমি দেখি অতি স্নিগ্ধ জ্যোতি।

প্রথম দর্শনেই বুঝলাম সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে নূরজাহানের। তিনি এসে একেবারে সামনে দাঁড়ান। কৌতূহলী নাজীর আর খোজারা দূরে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রভাবে চেয়ে থাকে।

আমি মুখের ওপর থেকে ওড়নাখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে দিই। চমকে ওঠেন তিনি অস্ফুটস্বরে বলে ওঠেন,—আরজমন্দবানু ?

মৃদু হাসি আমি।

—কে তুমি ?

—জাহানারা।

—আশ্চর্য।

—সত্যিই কি এতটা সাদৃশ্য ?

—হ্যাঁ। তবে তার ত্বক ছিল আরও মসৃণ। তার চোখের তুলনা ছিল না। কি প্রথম দর্শনে চমকে দিতে পার।

নূরজাহান আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অনেকক্ষণ সেইভাবে থাকেন। বুঝতে পারি আমার মাথার ওপর দু'ফোঁটা চোখের জল পড়ে।

তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন,—আরজমন্দ এককালে আমার খুব প্রিয় ছিল কিন্তু ঐশ্বর্য অনেকের মতো তাকেও আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। সে কিন্তু আমাকে ভোলে নি। বেগম মমতাজ হয়ে অনেক অসুবিধা মধ্যেও আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে।

—জানি।

াহান আপ্রাণ চেষ্টায় তার ভাবাবেগ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আমার হাত ধরে াদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। চলতে চলতে আমার ওড়না স্পর্শ করে বলেন,— ল-কিনারী ?

্যা। দেখে আপনি খুশী হবেন—তাই।

মমন আরও অনেক জিনিসের প্রচলন করেছিলাম। থাকবে কিনা জানি না।

ষ একটি কক্ষের মধ্যে এসে তিনি থেমে যান। সে কক্ষে আসবাবপত্রের াই নেই। বন্দী হলেও, নূরজাহানের বিলাসিতার পথে কোনরকম অন্তরায়ের করেন নি বাদশাহ্। উপযুক্ত বার্ষিকীর ব্যবস্থা করেছেন। তবে এমন শ্রীহীন া নূরজাহানের কক্ষ ? দেখি শুধু মাঝখানে একটা উচ্চ বেদীর ওপর অতি সাধারণ া। পরিধানে পোষাকের তো কোন চাকচিক্যই নেই। মনে মনে দুঃখ হয়। ু সন্ন্যাসিনীর মতো হয়তো তিনি দিনের পর দিন একটি করে বিলাসিতার সামগ্রী র্জন দিয়ে চলেছেন। কতখানি মনের জোর আর সাধনার ফলে তাঁর মতো ারীর পক্ষে এটি সম্ভব ! হয়তো জীবনের শেষ দিনে লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় টি ছাড়া আর কিছুই তিনি রাখবেন না।

জাহান কি হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হলেন শেষ পর্যন্ত ?

। কক্ষের এককোণে একটি ছোট্ট চৌকির ওপর কোর-আন শরিফ তখনো ালা অবস্থায় রয়েছে। তাঁর চোখ-মুখের পবিত্র ভাব দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় মি আসার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একমনে পড়ছিলেন ওটি।

জ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাই।

হাসেন তিনি। আমার মনোভাব যেন বুঝতে পারেন। ইঙ্গিতে পাশের ঘরে কে অনুসরণ করতে বলেন।

ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হই। যেন এক ফুলের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। কক্ষের পাশের দেয়াল পুষ্পে পুষ্পে ঢাকা পড়েছে। একটি বিরাট শয্যা পাতা রয়েছে ঝখানে, তার চতুর্দিকে চারটি সোনার বড় ধূপদানি। ধূপের সুগন্ধে কক্ষ ামোদিত। শয্যার ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা। আর সেই রাশীকৃত পুষ্পের ঝখানে স্বর্ণ নির্মিত পটে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের প্রতিচ্ছবি।

ামি বিহ্বল হয়ে পড়ি। মুখ দিয়ে কথা সরে না। জাহাঙ্গীরের হাসিমুখখানা তি পরিচিত হলেও এমন পরিতৃপ্তির ভাব এর আগে কখনো চোখে পড়ে নি। তনি যেন তাঁর প্রিয়তমা বেগমের প্রতিটি ভাব, প্রতিটি আবেগ আর কার্যকলাপের াদ গ্রহণ করে চলেছেন একটু একটু করে। ফুলের শয্যার ওপর বসে গর্বে তাঁর বুক রে উঠেছে। বেঁচে থাকতে নূরজাহান হয়তো তাঁর সামনে কোন দিনই এভাবে

নিজেকে নিঃস্ব করে মেলে ধরতে পারেন নি। হয়তো দিল্লীশ্বরের মনে চিরদিনই এ অপরাধ-বোধ ছিল যে মেহেরউন্নেসাকে তিনি জবর-দখল করেছেন পূর্ব-স্বামী হেফাজত থেকে হীন চক্রান্তের দ্বারা—সেজন্য বেগমকে খুশী রাখতে তাঁর চেষ্টা অন্ত ছিল না।

নূরজাহানের চোখে জল। আমারও চোখ কেন যেন শুষ্ক থাকে না।

—আজ ওঁর জন্মদিন।

বড় লজ্জিত হই আমি। ভূতপূর্ব বাদশাহের জন্মদিনটি অন্তত পালন করার রীতি থাকা উচিত ছিল দেশে। হয়তো সব দেশেই পালন করা হয়। শুধু অভিশ মুঘল-বংশে এ রীতি চিরতরে বন্ধ। ভালভাবে ভাবতে গেলে বাদশা জাহাঙ্গীরকেই দায়ী বলে মনে হয়। মসনদ নিয়ে পিতার সঙ্গে বিবাদের এ মারাত্মক সংক্রামক ঐতিহ্যের প্রচলন করে গিয়েছেন তিনি, যা তাঁর পুত্ররাও অনুসর করছেন। আমার ভাইদের রক্তের মধ্যেও সেই সর্বনাশা বীজ লুকিয়ে রয়েছে কি কে বলতে পারে?

—তুমি সঙ্কুচিত হয়ো না জাহানারা। তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই এ দিনটি আমার ব্যক্তিগত। এ দিনের খবর আর কেউ রাখে না বলে কাউে দোষ দিই না। দোষ তো ওঁর—যিনি ওখানে বসে মুচকি হাসছেন।

নূরজাহান আঙুল দিয়ে ছবিটি দেখিয়ে দেন।

এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির প্রভাব কাটতে সময় লাগবে জানি। তাই যেজন্যে ছু এসেছি এখানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারি না। বলতে পারি না তাঁবে রোশনারার মতিগতির কথা। উপদেশ চাইতে পারি না।

বাইরের অলিন্দে গিয়ে দাঁড়াই আমরা। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। উদ্যানে সূর্য কিরণ-স্না গাছপালাগুলির অপরাহ্নের শীতল হাওয়া গায়ে লাগাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। ফুলের সজীবতাও ম্রিয়মাণ।

—খুশবু পাচ্ছ জাহানারা?

—ফুলের?

—না।

—গোস্ত?

—হুঁ। মতবাখ থেকে ভেসে আসছে?

—গোস্ত? বিস্মিত হই আমি।

—হ্যাঁ। জহাঁগিরী খিচ্‌রী, দো-পেঁয়াজা, হালিম গোস্ত আর আবাজীর বে-গোস্তও রয়েছে।

-কিন্তু আপনি তো গোস্ত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন বলে শুনেছি।
-না, না, আমার জন্যে নয়। ওঁর জন্মদিনে খাওয়াব। আর সুরাও। বড় লবাসত সুরা। শেষের দিকে খেতে পারত না। হাকিমের কড়া নির্দেশ ছিল। লেই পেটে অসহ্য ব্যথা হত। তাই দেখতে পেলেই হাত থেকে ছিনিয়ে নিতাম মি। এখন সেকথা ভাবলে বড় কষ্ট হয়। তাই মনের সাধ মিটিয়ে সুরা দেব।
জাহান পাগল নন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিতে উজ্জল।
নেকক্ষণ নীরব থাকি দুজনা। তারপর টুকরো টুকরো কথার আদান প্রদান হয়। শনারার প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে জেনে ধীরে ধীরে তার দ্রুত রিবর্তনের কথা নূরজাহানকে খুলে বলি।
নে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন তিনি। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,—এমন হওয়াই তা স্বাভাবিক জাহানারা। কি করতে পার তুমি।
-আমি বাধা দেব। বাবাকে বলব। ভাইদের বলব।
-খবর্দার। সর্বনাশ হয়ে যাবে।
-আত্মহত্যা করবে তো? করুক।
-না। আত্মহত্যা খুব সহজ সমাধান। তার চেয়েও ভয়ংকর কিছু ঘটতে রে।
তাই বলে সে হারেমকে কলুষিত করবে?
াহান হেসে ওঠেন। আমার পিঠের ওপর আলগোছে হাত রেখে বলেন,—
রম আবার পবিত্র হল কবে থেকে জাহানারা?
ার সহ্য হয় না। উত্তেজিতভাবে বলে উঠি,—যে হারেমে যোধবাঈ জীবন টয়েছেন, যে হারেমে তাজবেগম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, পরভেজের কন্যা ভেকোর বেগম নাদিরার চপ্পল যে হারেমের পাষাণ স্পর্শ করে—সে হারেমে ত্রতার ছোঁয়া লেগেছে বৈ কি।
াহানের মুখখানা মায়ের স্মৃতিসৌধের মত সাদা হয়ে যায়। তবুও থামতে পারি । বলে চলি,—হারেমের ছাদের গোপন কোণে বাদশাহের দৃষ্টির অলক্ষ্যে পুত বেগমদের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ভারতের সব শক্তিটুকু হাতে পেয়েও কি আপনি রে ফেলতে পেরেছিলেন? বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ে হারেমের অনেক কাষ্ঠেই কোর-আন-এর সুললিত সুর ধ্বনিত হত। একথা ভালভাবে জেনেও তায় মত্ত আপনার মর্মে গিয়ে পৌঁছায় নি সেদিন। কিন্তু আজ, এই জেসমিন াদের অখণ্ড নীরবতার মধ্যেও কেন পৌঁছায় না বুঝে উঠতে পারি না।
পূর্ব ভারত সম্রাজ্ঞীর চোখের দৃষ্টি বিহ্বল। যে দৃষ্টিতে এক সময় অগ্নিবর্ষণ হত, সে

দৃষ্টি দু'ফোঁটা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ে আমার সামনে। চেয়ে চেয়ে দেখি অথচ নড়তে পারি না।

—তোমার কথায় যথেষ্ট সত্য আছে জাহানারা। তবু আমি স্বীকার করতে পারি না যে হারেমের পবিত্রতা মুহূর্তের জন্যেও কোনদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের চমকের মতো হয়তো তা মাঝে মাঝে হারেমকে আলোকিত করেছে।

—আমাকে ক্ষমা করুন বেগমসাহেবা।

—সেকি ?

—আপনার প্রতি রূঢ় হয়েছি।

—সত্যি বলে যা বিশ্বাস কর, তার প্রকাশ রূঢ় হলেও অন্যায় হয় না জাহানারা।

—কিন্তু আপনার মর্যাদা রেখে আমি কথা বলতে পারি নি।

—তোমার কথায় আমি আঘাত পেয়েছি। কিন্তু অমর্যাদা করেছ বলে নয়। এভাবে আমার মন বহুদিন নাড়া খায় নি। মনের নীচে অনেকদিন ধরে যে ময়লা জমেছিল ঝাঁকি খেয়ে আজ তা ওপরে ভেসে উঠেছে। এ-ময়লা পরিষ্কার করে ফেলার সুযোগ পাব। তুমি আমার মস্ত উপকার করেছ জাহানারা।

মতবাখ থেকে এখন হাজার পাত্র বাদশাহী খানা এসে পৌঁছবে জাহাঙ্গীরের চিত্রশালার জন্যে, নূরজাহান তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাবেন না। আমার উপস্থিতি তখন অবাঞ্ছিত বলে মনে হবে তাঁর কাছে।

তাড়াতাড়ি বলি,—রোশনারাকে তবে তার সর্বনাশা পথেই চলতে দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন আপনি।

—না। সে পরামর্শ আমি দিতে পারি না। তবে উপায় নেই কোন। শুধু যাতে মাত্রা না ছাড়ায় কৌশলে তার ব্যবস্থা করতে পার।

—তার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই। জানেন না সে কোন্ ধাতুতে গড়া। সে বলে দিয়েছে, 'দশ-পচিশী' খেলতে শুরু করবে শিগগিরই।

—'দশ-পচিশী' ?

—হ্যাঁ। জীবন্ত ক্রীতদাসী নিয়ে আকবরশাহ্ শতরঞ্চ খেলতেন। ঘরটি পড়ে রয়েছে এখন। রোশনারার খেয়াল চেপেছে জীবন্ত পুরুষ নিয়ে সেই 'দশ-পচিশী' খেলাঘর আবার জীবন্ত করে তুলবে। পুরুষেরা হবে ঘুঁটি।

নূরজাহানের নিভাঁজ কপালে চিন্তার সূক্ষ্মরেখা দেখা যায়। কিছুক্ষণ স্থির থেকে তিনি বলেন, —মারাত্মক খেয়াল।

—ভীষণ মারাত্মক। আমি বাধা দেব।

—না। হঠাৎ ওভাবে কিছু করতে যেও না।

—কিন্তু—

—শোন। 'দশ-পঁচিশী' ঘর তো দেওয়ান-ই-খাসের পথেই পড়ে। আজই গিয়ে সে ঘরখানা সুন্দরভাবে সাজিয়ে ফেল। প্রাসাদের সব ঘরের চেয়ে সে ঘরখানা যেন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

—কেন বলুন তো ?

—কারণ আছে বৈ কি। কাজের চাপে পরিশ্রান্ত হয়ে বাদশাহ্‌কে অনেক কক্ষ পায়ে হেঁটে পার হতে হয় বিশ্রামের জন্য। দেওয়ান-ই-খাসের কাছে অত সুন্দর জায়গাটিতে যদি বিশ্রামের সব রকম উপকরণ থাকে তবে কি তিনি বেশীদূর হাঁটতে চাইবেন !

সপ্রশংস দৃষ্টিতে নূরজাহানের দিকে চেয়ে থাকি।

তিনি স্মিত হেসে বলেন,—আমার ভেতরে কুটিলতার আভাস পেয়ে তোমার বোধহয় ঘৃণা হচ্ছে জাহানারা।

মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করে বলি,—না। নিজের পরিবারকে সব রকম ঝড়-ঝাপটা থেকে রক্ষার জন্যে প্রতিটি নারীর এই কুটিল হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃত নারীর ভেতরে আল্লা বোধহয় এই বীজটি বপন করে দিয়েছেন।

—সত্যি কথাই তুমি বলেছ। কিন্তু ক্ষমতার লোভে এই কুটিলতা যখন সীমা ছাড়ায় তখন নারী আর নারী থাকে না, হয়ে পড়ে রাক্ষসী। যেমন আমি হয়েছিলাম।

—নিজের সম্বন্ধে এভাবে বলার অধিকার আপনার নেই। আজ আপনি সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে। আজ থেকে অনেক বছর পরে ঐতিহাসিকেরা নিরপেক্ষভাবে বেগম নূরজাহানের সমালোচনা যদি করতে পারেন, আমার ধারণা তখন তারা খুব বেশী দোষের সাক্ষাৎ পাবেন না আপনার চরিত্রের মধ্যে।

কথা ঘুরিয়ে দিয়ে নূরজাহান বলেন,—ওসব থাক। অনেক দেরি হয়ে গেল। তুমি হয়তো আর বেশী সময় পাবে না। 'দশ-পঁচিশী' ঘরের পাশে নর্তকীদের থাকার আয়োজন করবে।

—আমি এখনি গিয়ে সব বন্দোবস্ত করে ফেলছি। ফল ভালই হবে মনে হয়। আব্বা যদি ঘরখানাকে পছন্দ করেন, তবে রোশনারার জীবন্ত পুতুল দিয়ে শতরঞ্জ খেলা এ-জীবনে আর হয়ে উঠবে না।

জেসমিন প্রাসাদের উদ্যানে এসে উপস্থিত হই। মৃদু হাওয়ায় আমার 'বাদল-কিনারী' ওড়নায় সমুদ্রের ঢেউ খেলে যায়।

পেছন ফিরে চেয়ে দেখি ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নূরজাহান। হাত নেড়ে আমাকে বিদায় দেন।

সন্ধ্যায় দরবার শেষ হলে বাদশাহ্ দেওয়ান-ই-খাস হতে বার হয়ে আসেন। আমি পাশের ঝরোকার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। 'দশ-পঁচিশী' ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাদশাহের মুখভাব কেমন হয় দেখতে হবে। সেখানে নর্তকীরা আমার নির্দেশে আসর জমিয়েছে। ঘরখানির শোভা অপূর্ব দেখতে হয়েছে। একদিনে এই অসম্ভব সম্ভব হবে কল্পনা করি নি। ইজ্জত খাঁ সত্যিই করিতকর্মা পুরুষ মাত্র পনেরো জন লোকের সাহায্য নিয়েছিল সে। হারেম থেকে কিছুটা দূরে বলে রোশনারার কানে এই ওলটপালটের কথা পৌঁছয়নি এখনো।
ঘরে ঢুকতে সামনেই একটি শ্বেতপাথরের চৌকির ওপর অপূর্ব জিল্লাদার সুরার পাত্র শোভা পাচ্ছে। মায়ের মৃত্যুর পর বাদশাহের স্বাস্থ্য যেভাবে ভেঙে পড়েছিল, আমি অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অতি সতর্কতার সঙ্গে তাঁর কাছে নিয়মিত সুরাপানের প্রস্তাব উত্থাপন করি।
আমার কথা শুনে প্রথমে বিস্মিত হলেও অনেক ভেবে শেষে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন —বেশ।
সেই থেকে তিনি সুরাপান করেন।
নর্তকীদের নূপুরের ঝংকারে আকৃষ্ট হয়ে বাদশাহ্ যদি পর্দা তুলে ধরেন, তবে প্রথমেই কারুকার্য শোভিত সুরার পাত্র চোখে পড়বে। একটু চোখ ফেরালে শ্রেষ্ঠ নর্তকী গুলরুখ বাঈকে অপূর্ব বেশে সজ্জিত দেখতে পাবেন। তারপরই দেখবেন কক্ষটির শোভা।
নিজের পিতার জন্যে এ-জাতীয় আয়োজনে মন থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। তবু আমি নারী। ভারতের সেরা রমণী নূরজাহানের শিক্ষা আমাকে গ্রহণ করতেই হবে।
বাদশাহ্‌কে দেখে অবসাদগ্রস্ত বলে মনে হয়। তাঁর মুখে ক্লান্তির ছাপ। তিনি এগিয়ে যেতেই আমি ঝরোকার আড়াল হতে বার হয়ে তাঁকে অনুসরণ করি।
নর্তকীরা আমার নির্দেশ মতোই কাজ করল। পিতা 'দশ-পঁচিশী' ঘরের কাছাকাছি যেতেই তাদের নূপুরের মিষ্টি আওয়াজ সেখানকার আবহাওয়াকে চঞ্চল করে তুলল। বাদশাহ্ দাঁড়িয়ে পড়েন। চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখেন। রীতিমতো অবাক হয়েছেন তিনি। আকবরের মৃত্যুর পর যে-মহল নির্জন পড়ে থাকত, সেখানে হাজার বাতির রোশনাই-এর মধ্যে শিল্পের ইঙ্গিত তাঁর বিলাসী মনে সাড়া জাগায়।

অবসাদ কেটে যায় তাঁর মুহূর্তে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে 'দশ-পঁচিশী' ঘরের পর্দা তুলে ধরেন। পরক্ষণেই ভেতরে অদৃশ্য হন।

ছুটে গিয়ে আমি পর্দার পাশে দাঁড়াই। উঁকি দিয়ে দেখি সুরার পাত্র হাতে নিয়ে তিনি হাসিমুখে ঘরের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখছেন। একটু পরেই তাঁর জন্যে রচিত নরম শয্যার ওপর উঠে বসে প্রশ্ন করেন,—এখানে এই আয়োজন কেন?

গুলরুখবাঈ অভিবাদন করে জানায়,—দরবার থেকে বার হয়ে কষ্ট করে অনেকটা পথ আপনাকে যেতে হয় জাহাঁপনা। তাই।

—কার হুকুমে এ সব হয়েছে?

ইতস্তত করে ওরা। সম্ভব হলে আমার নামটা এড়িয়ে যেতে বলেছিলাম ওদের। কিন্তু বাদশাহ্ উত্তরের প্রত্যাশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। সে দৃষ্টির পানে চেয়ে নর্তকীরা কাঁপে।

গুলরুখ বলে,—আপনার শরীরের খবর তো শাহ্জাদী জাহানারা বেগমই শুধু রাখেন। বোধ হয় তাঁর হুকুমেই।

—হুঁ। বাদশাহ্ মুখের সামনে সুরার পাত্র তুলে ধরেন। বহুবছর আগে চম্বল হ্রদে তিনি সমস্ত সুরা নিক্ষেপ করেছিলেন। মূল্যবান সুরার পাত্রগুলি ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে অনেকদিন আগের কথা।

আমি সরে আসি। একটু পরেই নেশাগ্রস্ত হতে পারেন বাদশাহ্। তারপর অনেক কিছুই ঘটতে পারে, কন্যা হয়ে যা আমার পক্ষে দেখা শালীনতা-বিরোধী। আমার লজ্জা হয়—ভীষণ লজ্জা। আমার দেহও যে ওই নর্তকীদের দেহের মতোই।

রোশনারা বহুদিন আগেই একবার আমাকে বলেছিল, সে নাকি সব কিছুই দেখেছে। সে সবিস্তারে বর্ণনা শুরু করেছিল। আমার ধমক খেয়ে চুপ করে যায়। শুধু রোশনারা কেন, আমি জানি হারেমের অধিকাংশ নারীই বাদশাহের প্রমোদকক্ষে উঁকি দেবার জন্যে জীবন-পণ করে। তবে তারা পারে না। কড়া প্রহরা থাকে চারদিকে। সে প্রহরার ফাঁক গলিয়ে কেউ কাছে ঘেঁষতে পারে না। তারা জানে, কেউ কাছে যেতে চেষ্টা করলে খোজারা তাকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে। বাদশাহের কোন পুত্র হলেও পারে। হুকুম রয়েছে তেমনি। রোশনারার কথা যদি সত্যি হয় মোটারকম 'দিনার' খরচা করতে হয়েছে তাকে।

'দশ-পঁচিশী'র কক্ষে নৃত্য শুরু হয়েছে। সে নৃত্যের শব্দ ভেসে আসে। আমি তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাই—সেখানে গেলে নর্তকীদের নৃত্যের তাল আমার মনে কোনরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারবে না।

হঠাৎ খেয়াল হয়, কোনরকম পাহারার ব্যবস্থা করা হয় নি 'দশ-পঁচিশী'র চারদিকে।

হারেমে খবরটা রটলে হারেম খালি হয়ে যাবে। আর বাদশাহ্, সে খবর জানতে পারলে আমাকে রেহাই দেবেন না। নিজের কন্যা বলেও নয়।

নিজের কক্ষে ছুটে যাই। পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করে দেখি কোয়েল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—কি হয়েছে কোয়েল?

ওর ওষ্ঠদ্বয় বারকয়েক কেঁপে কেঁপে থেমে যায়। কাছে গিয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিই। তবু কথা বলে না সে। শুধু দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কোয়েলকে আমি বড় একটা কাঁদতে দেখি নি। যদিও সে নারী। বুঝলাম, এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যা ওকে রীতিমতো আঘাত করেছে। কিন্তু একজন নাজীরের হৃদয়-বেদনার কথা শোনার মতো যথেষ্ট সময় হাতে নেই। পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে এখনি—হারেমের কেউ কিছু না জানার আগেই।

তাই দৃঢ়স্বরে বলি,—তোমার কথা পরে শুনব কোয়েল। এখন শিগ্‌গির যাও খোজাদের আড্ডায়। বলে এসো, নর্তকীরা আজ 'দশ-পঁচিশী' ঘরে জমায়েত হয়েছে। বাদশাহ্ এসেছেন সেখানে। পাহারা বসাক তারা এই মুহূর্তে।

কোয়েলের চোখের জল শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। যেটুকু গালে লেগেছিল ওড়না দিয়ে মুছে ফেলে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

—যদি ওরা তোমার কথা না শোনে, বলবে আমার হুকুম।

আর আসবার সময় 'দশ-পঁচিশী'র পাশ দিয়ে এসো। কক্ষের ভেতর উঁকি দেবার চেষ্টা করো না। শুধু দেখো হারেমের কেউ সেখানে ভিড় করেছে কিনা।

কোয়েল ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

আমি পায়চারি করি। বাদশাহ্ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতেই কোয়েলের চিন্তা মাথায় এসে ঢোকে। আমার ঘরে বসে কী এমন আঘাত সে পেতে পারে, যার জন্য অত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ভেবে কূলকিনারা পাই না।

তার বোনের পোষাক পরার পর থেকে একটু একটু করে কোয়েলের পরিবারের কথা মোটামুটি জেনে নিয়েছিলাম। বলতে সে কিছুতেই চায়নি। সহানুভূতি দেখিয়ে, মন ভিজিয়ে জানতে হয়েছে। ওদের কথা শুনলে পৃথিবীকে অন্যরকম বলে মনে হয়। প্রকৃত ভারতবর্ষকে চেনা যায়। কতখানি দরিদ্র ওরা—অথচ মানবিক বৃত্তিগুলির প্রাচুর্য শুধু ওদের মধ্যেই রয়েছে। ওদের পরস্পরের প্রতি স্নেহ-প্রীতি ভালবাসার কথা শুনলে অবাক হতে হয়। ভাবি, পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে এতখানি ভালও বাসতে পারে কোনরকম স্বার্থ ছাড়া। মনে হয়, কোন সাধারণ ভারতবাসী যদি তার ঘর থেকে বার হয়ে এক-পা এক-পা করে বাদশাহী মহলের দিকে অগ্রসর

হয়, তবে তার মনের প্রকৃত গুণগুলি প্রতি পদক্ষেপে একটি একটি করে ঝরে পড়তে থাকবে। মসনদের পাশে এসে যখন সে পৌছবে তখন তার হৃদয় হবে ঠিক আমার মতো, রোশনারার মতো, আওরঙজেবের মতো—। হৃদয়ে তখন শুধু স্বার্থের পোকাগুলো কিলবিল করবে।

আপনা হতেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কোয়েলের স্থান কেন যেন আজ হারেমে, তার কারণ আমি জেনেছি। আর জানেন বাদশাহ্ নিজে। কিন্তু তিনি কখনো ওর সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন নি। এই সামান্য ব্যাপারে সময় নষ্ট করা শাহানশাহের শোভা পায় না। তবু যদি তিনি কোয়েলকে আমার কাছে প্রথম পাঠানোর সময় তার সম্বন্ধে অল্প কিছু বলে দিতেন, তবে আজ পিতা হিসাবে আমার কাছ থেকে আরও বেশী শ্রদ্ধা পেতে পারতেন।

বাইরে কর্তব্যরত খোজার সচকিত কুর্নিশের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। দ্রুত পদশব্দও শুনি সেই সঙ্গে। হয়তো কোন শাহ্‌জাদী চলে যাচ্ছেন এ-পথ দিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই কক্ষের ভারী পর্দা দুলে ওঠে। কোয়েল ফিরে এল? সে এলে খোজা কুর্নিশ করবে কেন?

রোশনারা!

পর্দার পটভূমিকায় উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে রোশনারা। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সে আমার দিকে ক্ষুধিত বাঘিনীর মতো। চোখেমুখে তার নিদারুণ ঘৃণা।

—দাঁড়ালি কেন? এগিয়ে আয়। কাজ শেষ করে পেছনের দরজা দিয়ে চলে যা। কেউ নেই ওদিকে।

রোশনারা সত্যিই এগিয়ে আসে।

—কিন্তু বাইরের খোজাটা দেখে ফেলেছে। তাকে আগে শেষ করে আয়। সাক্ষী রাখিস না বোন!

—বিশ্বাসঘাতক।

—বাঃ, গালভরা কথা বলছিস দেখছি।

—আজ তোর জন্যে শুধু ঘৃণাই তোলা রইল আমার এই বুকে। রোশনারা তার সুপুষ্ট বুকের ওপর বাঁহাতে সজোরে আঘাত করে।

—আহা! অত জোরে নয়। অমন সুন্দর বুকের গড়ন নষ্ট হয়ে যাবে যে! ফিরেও তাকাবে না তোর 'দশ-পঁচিশী'র জীবন্ত ঘুঁটিগুলি।

—ছি ছি। মায়ের পেটের বোনই বটে।

রোশনারার মুখের দিকে চেয়ে আমার হাসি পায়। এত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে গেল। সব মাটি!

—তলোয়ারটা শুধু শুধু খাপ থেকে টেনে বার করলি ?

—না।

—না ? তাই নাকি ? তবে দাঁড়িয়ে কেন ?

—তোকে নয়। তোর সেই নাজীরকে। মৃত্যুকে যে ভয় পায় না। তলোয়ার দেখলে হাসে। কত বড় স্পর্ধা !

—ও। তবে তুই-ই এসেছিলি আর একবার ?

—হ্যাঁ।

ঘরে ঢোকার সময় কোয়েলকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আসল ঘটনা জানতে আগ্রহ হয়।

—তাকে মারতে চেয়েছিলি ?

—হ্যাঁ। শুনে সে হাসল। হাঁটু ভেঙে বসে বুক পেতে দিয়ে বললে, শাহ্‌জাদীকে মারবেন না তো ?

—বড় বোকা তো।

—তখন তাকে শেষ করে দিলেই ভাল হত। আবার ছুটে আসতে হত না। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে যতই ভাবলাম, ততই মাথাটা গরম হয়ে উঠল। আবার এলাম তাই। সামান্য নাজীরকে তুই মাথায় তুলে দিয়েছিস।

—মাথায় না তুললে কি আমার হয়ে নিজের বুক পেতে দিত ?

—সে বুকে পদাঘাত করেছি।

—কী ? ক্রোধে আমার মাথার মধ্যে ঝাঁঝাঁ করে ওঠে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুরাশির মতো গরম হয়ে ওঠে আমার সর্বাঙ্গ। সম্মুখে দণ্ডায়মান নিজের বোনকে দেখে মনে হয় সাক্ষাৎ শয়তানী। কোমরের কাছে গুপ্ত ছোরার বাঁটে আমার ডানহাতখানা আপনা হতে গিয়ে স্পর্শ করে। জানি, তড়িৎগতিতে রোশনারার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তার তলোয়ার তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সাধারণভাবে অস্ত্র-চালনার ক্ষমতা ছাড়া বিশেষ কোন পারদর্শিতা তার নেই।

তবু - তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। সাময়িক উন্মত্ততা অনেক কিছু অঘটন ঘটিয়ে দেয়, পরে যার জন্যে আফসোসের সীমা থাকে না। আকবর শাহ্ যে জন্যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়ে, সে দণ্ডাজ্ঞা একদিনের জন্যে মুলতবী রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় দিনের আজ্ঞাই ছিল চূড়ান্ত।

মাথার রক্ত ধীরে ধীরে নেমে যায়। দপদপে শিরা-উপশিরা স্তিমিত হয়ে আসে। রোশনারার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে দেখি আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে সে যেন একটু ন্ত।

—কোয়েলকে তুই চরম আঘাত দিয়েছিস রোশনারা। তলোয়ারের আঘাতে তার কোটিভাগের একভাগও হত না।

চুপ করে থাকে রোশনারা।

—কোয়েল রাজপুত রমণী। মৃত্যুর ভয় দেখাস ওকে? ভয় ওর অপমানে। সেই অপমান তাঁর বুকে এঁকে দিয়েছিস তুই।

—নাজীরের আবার অপমান।

—নাজীর? হ্যাঁ সেই রকমই দাঁড়িয়েছে বটে! কিন্তু আজকের এই ঘটনার জন্যে বাদশাহ্ শাহজাহানকে আল্লার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

—তার মানে?

—তোর কাছে প্রকাশ করা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবু বলব তোকে। কারণ এর পরে কোয়েলকে অপমান করার আগে অন্তত একবার ভেবে দেখবি।

আমি দরওয়াজার দিকে যাই, পর্দা তুলে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখে নিই। কোয়েল নেই। ফিরে আসি। রোশনারার মুখোমুখি দাঁড়াই।

—আজ তুই শাহ্জাদী রোশনারা। ভারতঈশ্বর শাহজাহানের কন্যা। কিন্তু আজ তুই না-ও থাকতে পারতিস। এ দেশের সিংহাসনে হয়তো অন্য কেউ বসত। আর এই হারেমে তোর বদলে অন্য কেউ ঘোরাফেরা করত।

—কেন? রোশনারার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

—কোয়েল নাজীর। সে তোর পদাঘাত বুক পেতে নেয়। কিন্তু তাঁর বাবার বুকের রক্ত আর তলোয়ার আজ থেকে বহুবছর আগে বাদশাহের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। শত্রুর বর্শা যখন বাদশাহের বুকের পাঁজর ভেদ করতে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তে কোয়েলের বাবা চকিতে ছুটে এসে সেই শত্রুর ডানহাত খণ্ডিত করেন। বাদশাহ্ রক্ষা পান, কিন্তু তাঁর রক্ষাকর্তা বাঁচেন নি সে যুদ্ধে। বৃদ্ধা মা, বিধবা স্ত্রী আর দুই কন্যাকে অকূলে ভাসিয়ে তিনি চিরবিদায় নেন পৃথিবী থেকে। তাই কোয়েল আজ নাজীর। তাই আজ তোর পদাঘাত তাকে মুখ বুজে বুক পেতে নিতে হয়।

রোশনারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে ধীরে ধীরে আবার কক্ষ থেকে বাইরে চলে যায়। হয়তো সে ভাবে বাদশাহের প্রাণরক্ষা করাই সৈন্যদের কর্তব্য। তার জন্যে মৃত্যু হলে ক্ষতি কি?

দূরে যমুনার কূলে মায়ের স্মৃতিসৌধ শেষ সূর্যের আলোয় একবিন্দু রক্তের মতো টলটল

করছে। বাবা কৌশলে ভাইদের আলাদা করে রেখেছেন। দারাশুকো শুধু রয়েছে রাজধানীতে। তবু যেন মনে হয়, ভেতরে প্রবল্ল চক্রান্ত চলেছে এক অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রচণ্ড আলোড়নের মতো সে চক্রান্ত মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে সচকিত করে দেয়। বাদশাহ্ স্থির হয়ে থাকেন। তিনি যেন জানেন, ভবিষ্যতের ললাটে কি লেখা রয়েছে। কিন্তু আমার ভয় হয়। তার চেয়ে হয় দুঃখ। এক অন্তহীন বিমর্ষতা আমাকে আচ্ছন্ন করে। সে বিমর্ষতা প্রাণহীন।

মায়ের স্মৃতিসৌধের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাজমহল। বাদশাহের স্বপ্নের তাজমহল তার স্বপ্নকে ছাড়িয়ে গিয়েছে শিল্পীর কল্পনায়। তাজমহলকে ঘিরে যে গুলিস্থান তাতে ইতিমধ্যেই নানান ফুলের শোভা। সৌধের কাজ শেষ হবার আগেই ফুলের গাছ এনে বপন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। শুধু বড় বড় গাছের চারা এখনো আকাশের দিকে বেশীদূর উঠতে পারে নি।

দুদিন আগে আনুষ্ঠানিকভাবে তাজমহলের উদ্বোধন করে এলেন বাবা। সঙ্গে ছিলাম আমি আর রোশনারা। দেশের বড় বড় মৌলবীরা এসে জমা হয়েছিলেন তাজবিবির সমাধির পাশে। তাঁদের অধিকাংশের চোখেই লক্ষ্য করেছি লোভাতুর উজ্জ্বলতা। তাঁরা জানতেন, তাজমহলের ভার ছেড়ে দেওয়া হবে তাঁদেরই মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে—যিনি মমতাজের সমাধির পাশে প্রতিদিন কোর-আনের পুণ্য বাণী শোনাবেন—যিনি প্রতি জুম্মাবারে সমাধি স্বর্ণখচিত বস্ত্রদ্বারা আবৃত করে দেবেন। তাজমহলেরই যে কোন মিনারের এক প্রকোষ্ঠে বসে তিনি সারা দিনরাত নিশ্চিন্ত আল্লার আরাধনা করতে পারবেন। মৌলবীর কাছে এর চাইতে অধিক ঈপ্সিত পদ আর কি থাকতে পারে? বাদশাহের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর সুন্দরতম ইমারতে জীবন কাটিয়ে দেবার সৌভাগ্য সারা দেশে একজনের ভাগ্যেই হওয়া সম্ভব।

অনুষ্ঠানকালে বাদশাহের দৃষ্টি প্রতিটি মৌলবীর মুখে মুখে ঘুরে শেষে আমাদের ঝরোকার ওপর এসে থেমে যায়। ঝরোকার পেছনে আমার সঙ্গে ছিল রোশনারা। বাবা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মৃদু স্বরে ডাকেন,—জাহানারা!

—কি বাবা?

—পছন্দ করতে পারছি না। তুমি করেছ কি?

—হ্যাঁ।

—কাকে?

—সত্যিই কি আপনি পছন্দ করতে পারেন নি?

—না।
—কোন বৈশিষ্ট্যই কি কারও মধ্যে দেখতে পান নি?
—না। আজ আমি বিচারের ক্ষমতা হারিয়েছি। কেন যেন আমি বড় বেশী উত্তেজিত। বাদশাহের উত্তেজনার কারণ রয়েছে। মায়ের প্রতি তাঁর মনোভাব অজানা নয়।
—কাকে পছন্দ করলে জাহানারা?
—এঁদের মধ্যে যিনি শুধু আপনার নির্দেশ পালন করতেই এসেছেন অন্যদের সঙ্গে। গ্রামের ভগ্ন মসজিদ আর তাজমহলের অভূতপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে যিনি কোন তফাত বুঝতে পারেন নি। যাঁর মন আর চোখ আরও উঁচুতে—ধূলিময় পৃথিবীর সব কিছু ছাড়িয়ে বহুদূরে।
—কে তিনি? বাদশাহের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।
ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন জড়োসড়ো, তাজমহলের মণিমাণিক্যের দিকে যাঁর দৃষ্টি নেই। বাদশাহের দিকেও নয়।
বাদশাহ্ দ্রুত এগিয়ে যান।
রোশনারার মুখে বিদ্রূপের হাসি। আমার কথায় পিতা গুরুত্ব দিলেন বলে হয়তো। কিংবা মৃতা মায়ের জন্যে এতদিন পরে এতবেশী মাথাব্যথা সে বরদাস্ত করতে পারছে না বোধহয়। সে জানে না তাজবিবি কী ছিলেন। জানে না লাগাম-ছাড়া বিলাসিতার মধ্যেও তাঁর প্রধান মহিষীকে বাদশাহ্ মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারেন নি। পরে সেদিনের অনুষ্ঠান শেষে বাদশাহ্ পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। বার বার সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন আমার দিকে। সঙ্কুচিত হয়েছিলাম আমি।
মৌলবী নির্বাচনে আমি খুশী হয়েছি। জানি, আমার মায়ের কানে যাঁর মুখনিঃসৃত কোর-আনের বাণী ঝংকৃত হবে তাঁর হৃদয়কে অর্থের লোলুপতা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারবে না কোনদিনও। তাজমহলের শ্বেতপাথরের মূল্য তাঁর কাছে আরাবল্লীর প্রস্তরের চেয়ে বেশী নয়। উজ্জ্বল মণিমাণিক্য তাঁর কাছে স্তব্ধ রজনীর গ্রহ-তারা-নক্ষত্র-খচিত আকাশের তুলনায় তুচ্ছ।
তবু হঠাৎ আজ অস্তগামী সূর্য-স্নাত তাজমহলকে একবিন্দু রক্তের মতো মনে হয় কেন? মা কি তবে কাঁদছেন? তাঁরই সন্তানদের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে কি তাঁর হৃদয় আজ রক্তাক্ত? কিন্তু কেন হবে? জাহাঙ্গীরে যে রক্ত-স্রোতের শুরু শাহজাহানেই তো তা শেষ হয়ে যেতে পারে। তার জের কেন চলবে আরও?
মাথাটাকে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিই, উদ্ভট চিন্তা করতে করতে আমারই মাথা খারাপ হয়েছে। দর্শন না ছাই। নূরজাহান শুধু শুধু আমার প্রশংসা করে আমাকে ক্ষাপিয়ে

দিয়েছেন—যার ফলে তাজমহলের স্বর্গীয় রূপকে উপভোগ করার নয়নও আমার নষ্ট হতে বসেছে। আমার জায়গায়, এই বাতায়নের পাশে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর যে কোন নারী এসে যদি আজ তাজমহলের শোভা অবলোকন করত, তবে সে নিশ্চয়ই বিস্ময়াবিষ্ট হত। তাজমহল তার কাছে প্রতিভাত হত সমুদ্রের গভীরতা থেকে অতিকষ্টে সঞ্চয় করে আনা একটি মহামূল্য প্রবালের মতো। অথচ—

—শাহ্‌জাদী।

—কেন কোয়েল?

—কাল দেওয়ান-ই-খাসের ঝরোকায় আপনাকে যেতে হবে। দরবার বসার সাথে সাথেই।

—কেন? কোয়েলের কথা শুনে অবাক্ হই। দরবারে কখন যেতে হবে সে নির্দেশ আসে বাদশাহের কাছ থেকে। চিত্তাকর্ষক কিছু থাকলে বাদশাহ্‌ নিজেই ডেকে আমাদের দু'বোনকে বলে দেন। কিন্তু আজ কিছুই তো বলেন নি।

—কাল শিল্পী আসবে দরবারে। কোয়েলের মুখে স্বচ্ছ হাসি ফুটে ওঠে।

—শিল্পী?

—হ্যাঁ। তাজমহলের শিল্পী। ইসা-মামুদের সহকারী। বাদশাহ্‌ পুরস্কৃত করবেন তাকে?

—আমি তো জানি না। তোমাকে কে বললে?

কোয়েলের মুখ সহসা রাঙা হয়ে ওঠে। কক্ষের অপস্রিয়মান আলোতেও সে রঙ ধরা পড়ে। সে চুপ করে থাকে।

—চুপ করলে কেন?

থতমত খেয়ে কোয়েল বলে,—সে বলেছে।

—সে? মানে, শিল্পী নিজে?

কোয়েল মাথা নীচু করে থাকে। এতক্ষণে তার মন আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছুটে গিয়ে তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠি,—কোয়েল।

ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে তার দু'চোখ বেয়ে। আমি স্তম্ভিত হয়ে তার কান্নার দিকে চেয়ে থাকি।

কতক্ষণ কেটে যায় খেয়াল থাকে না। শেষে কোয়েল চোখের জল মুছে ফেলে। আমার পানে চেয়ে বলে,—শাহ্‌জাদী, হাত বাড়িয়ে সে কি চাঁদ ধরতে পারত? পারত না। চাঁদও কি অত নীচে নামতে পারত? তাই বোধ হয় আমার মনে স্পর্ধা জেগেছিল। কিন্তু লাভ হয় নি কিছু। সে এখনো চাঁদের স্বপ্নই দেখে। সে যে শিল্পী।

আমার বুকের ভেতরে কেঁপে ওঠে। ভয়ে? হ্যাঁ ভয়ে। কোয়েলের কথা শুনে যে তীব্র আনন্দে আমি অভিভূত, সেই আনন্দের চিহ্ন আমার চোখে-মুখে ফুটে ওঠার ভয়। ধরা পড়ে যাব কোয়েলের কাছে—যেমন সে ধরা পড়েছে আমার কাছে।

কিছু বলতে গেলেই কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠবে। তাই সময় নিয়ে নির্বিকারভাবে বলি,—কতদিনের ঘনিষ্ঠতা তোমার সঙ্গে কোয়েল?

—সেদিনের পর থেকেই। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা তো নয়। একা একা কাজ করে সে তার ঘরে বসে। আমি আপনার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে একটু সাহায্য করে আসি। সেবা করার আনন্দ পাই।

—কোয়েল?

—শাহ্জাদী।

—কী লাভ?

—জানি না।

—তবে?

—শুধু আনন্দ।

—এ আনন্দ চিরস্থায়ী হবে?

—না, সে আমার দিকে ফিরেও চায় নি প্রথমে।

—এখন?

—চায়। তবে আমার জন্যে আমার দিকে তাকায় না। তাকে প্রলোভন দেখিয়েছি। তাই আজকাল যখনি যাই, ব্যগ্র চোখে চেয়ে থাকে। আমার দিকে নয়—আমার পছনে।

—কেন?

—যার মূর্তি তৈরির জন্যে পাথর কেটে প্রস্তুত হচ্ছে সে, তাকে শুধু আর একবার নয়ন রে দেখবে বলে। আমি কথা দিয়েছিলাম দেখাব।

মার মুখের রঙের পরিবর্তন হয়েছে বুঝতে পারি, তবু কিছু করতে পারি না। মুখখানা ঘুরিয়ে গবাক্ষপথে প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। সূর্য ডুবে য়েছে অনেকক্ষণ।

—শাহ্জাদী। আমি জানি, আমি অন্যায় করেছি। এইভাবে সরল শিল্পীকে লোভিত করাতে আমার অন্তরের হীনতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পারলাম না—ছুতেই পারলাম না।

াস্তে আস্তে বলি,—আমি হলেও হয়তো পারতাম না কোয়েল।

মার কথায় কোয়েলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিনা দেখার চেষ্টা করি না। তবে

তাকে বলতে শুনি,—কিন্তু আপনাকে না দেখাতে পারলে যে সে আমায় ঘৃণা করবে।
—যখন তুমি বুঝবে সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, আমাকে বলো।
একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনি। নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস।
চাপা নূপুরের ধ্বনি কানে ভেসে আসে। 'দশ-পঁচিশী'তে নাচের আসর বসেছে। বাদশাহ্ নিশ্চয় উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। নূরজাহান দীর্ঘায়ু হোন।
হঠাৎ খেয়াল হয়, আসল প্রশ্নই করা হয় নি কোয়েলকে। বলি,—শিল্পী তো তাঁর প্রাপ্য পেয়েছেন। তবে কেন আবার বাদশাহ্ পুরস্কৃত করবেন তাঁকে।
—শিল্পীও অবাক্ হয়েছে তাই।
অবাক্ আমিও কম হই না। শিল্পীকে তার যে প্রাপ্য দেওয়া হয়েছে—সে অঙ্ক সামান্য নয়। এর পরেও আবার বিশেষভাবে পুরস্কৃত করার চিন্তা কেন যে করছেন বাদশাহ্ বুঝি না। হয়তো তাজমহলের সৌন্দর্য দেখে বার বার মুগ্ধ হয়ে তাঁর ধারণা জন্মেছে শিল্পী যোগ্য পুরস্কার পায় নি। কিংবা আমি একটি পাষাণ-ফলকে ইসা মামুদের নামের নীচে শিল্পীর নাম খোদিত করে তাজমহলের কোন প্রাচীরের গায়ে প্রোথিত করার যে প্রস্তাব করেছিলাম সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাঁর অনুশোচনা হয়েছে। তাই শিল্পীর দু'হাত স্বর্ণমুদ্রায় ভরিয়ে দিয়ে অমরত্বের দাবি থেকে কৌশলে সরিয়ে দিতে চান।
অভিমান হয়। বাদশাহ্ যখন সবকিছু গোপন রেখেছেন আমার কাছে, আমিই বা কেন নিজে থেকে তাঁর কাছে আবদার করব? কাল দেওয়ান-ই-খাসে যাবার কথা তো একবারও বলেন নি তিনি। অথচ সামান্য কোন কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটলেও তিনি আমাকে দরবারের ঝরোকায় হাজির থাকতে বলেন।
কথায় কথায় আমার চোখ ফেটে জল গড়ায় না। নইলে হয়তো কাঁদতে বসতাম ভারাক্রান্ত মনকে হাল্কা করার জন্যে ছট্‌ফট্ করতে থাকি। শেষে নাদিরা বেগমের কথা মনে হয় ... শুকো আগ্রায় অনুপস্থিত দুদিন থেকে। নাদিরা একা রয়েছে খুবই নম্র স্বভাবের মেয়েটি। বড় ভাল লাগে। যখন তার সাদি হয় তখন উপহার হিসাবে প্রাপ্ত সামগ্রীর প্রদর্শনীর ভার আমার ওপর ছিল। আমীর-ওমরাহ্ সে সব জিনিস দেখে চোখের পাতা ফেলতে পারেন নি। নাদিরা দারার যোগ্য বেগমই বটে বরং দারার চেয়ে তার গুণ বেশীই বলব। সব গুণ থাকা সত্ত্বেও দারা জেদী—একটু অলসও যেন। কিন্তু নাদিরা অ...নীয়।

ঘর থেকে বার হয়ে তার কক্ষের দিকে রওনা হই। কোয়েল আমাকে অনুসরণ করছিল। ইঙ্গিতে মানা করে দিই। সুন্দরী নাদিরা যেদিন হারেমে আসে সেদিন সব আনন্দের মধ্যে একটা আঘাত আমা... হৃদয়কে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিয়েছিল সেদিন আবার উপলব্ধি করেছিলাম আমার নিজের জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা

বাদশাহ্ বিবাহের সব কিছু ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে হয়তো ভেবেছিলেন, উৎসবের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নিজের সম্বন্ধে ভাববার অবসর পাব না। ভুল ভেবেছিলেন তিনি। নাদিরার হাত ধরে তার নিজের কক্ষে পৌঁছে দিয়ে সবার অলক্ষ্যে রোশনারার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। অমন আনন্দের দিনে সে ছাড়া আমার সমব্যথী কেউ ছিল না পৃথিবীতে।

প্রাসাদে সেদিন কোটি কোটি চিরাগদানির উজ্জ্বল আলো। অথচ রোশনারার ঘর প্রায়ান্ধকার। তবু সেই ক্ষীণ আলোয় রোশনারার হাতের ছুরিকা ঝলসে ওঠে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। চেয়ে দেখি সে পাগলের মতো তার শয্যায় তাকিয়ার ওপর ক্রমাগত ছোরা বসিয়ে চলেছে।

—তাকিয়াটি বাদশাহ্ আকবরের নির্দেশ নয় রোশনারা। ওকে ফাঁসিয়ে লাভ নেই।

চমকে থেমে যায় সে। পরিশ্রমে তার মুখে আর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। গম্ভীর হয়ে বলেছিল,—ধার পরীক্ষা করছি। নিজের বুকে চালাবো।

একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তার বাঁ-হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলি,—এই যে হীরের আংটি, এটিই তো যথেষ্ট।

—না।

—কেন?

—বুকের রক্ত চাপ চাপ হয়ে জমে থাকবে পাষাণের ওপর। বাদশাহ্ আসবেন, এসে দেখবেন, শাহ্‌জাদীদেরও দেহে রক্ত আছে। কত অফুরন্ত রক্ত। নাদিরা আর মমতাজের চেয়ে বেশীই। আরও উষ্ণ।

—ছি। রোশনারা।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। আমার বুকে মুখ রেখে সমানে কেঁদে চলে। নিজের শরীরের জলুনি অন্তর্হিত হয়। তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে মরি। পাই না। ভাবি, ভবিষ্যতে রোশনারা যত অন্যায়ই করুক সব কিছুর মূল কারণ একটি। তার কত অন্যায় অসহ্য বোধ হবে। কত অন্যায় অমঙ্গল ডেকে আনবে—মুখে সমালোচনা করব। অথচ মনে মনে তাকে ক্ষমা না করে পারব না।

বাঁধ ভাঙা পুরোনো চিন্তাস্রোতের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে একসময় খেয়াল হয় নাদিরার ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছি।

গভীর মনোযোগ সহকারে নাদিরা কি যেন দেখছিল। আমার উপস্থিতি প্রথমটা খেয়াল করে নি। দেখতে পেয়ে ছুটে আসে সে। একটু অপ্রস্তুত।

হেসে বলে,—এই দ্বিতীয়বার।

—ওঃ, দেখ এই দুদিনই ... তকো আগ্রা ছেড়েছে সম্ভবত।

লজ্জায় নাদিরা অধোবদন হয়। তার এই লজ্জা, মেয়ে হয়েও আমার ভাল লাগে। শেষে বলে,—মিথ্যে কথা বলেন নি আপনি। আমি বুঝিয়ে পারি না। ও যেন দিন দিন ভুলে যাচ্ছে বাদশাহের বড়ছেলে ও। বড় বেশী ভাবুক হয়ে পড়েছে। ফলে ভাবুকের আলস্যও পেয়ে বসেছে ওকে।

—কি দেখছিলে অত মন দিয়ে।

—তস্‌বির।

—তস্‌বির? তুমি না মুঘল-বংশের বেগম। তুমি না মুসলমান?

নাদিরার মুখ পাংশু হয়ে যায়। সে অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে। আমার ধমকের অন্তরালে তারল্যের রেশ সে বুঝতে পারে না। হেসে ফেলি আমি। তবু সে হাসতে পারে না। একই ভাবে চেয়ে থাকে। তার চিবুক ধরে নাড়া দিই।

—দারাশুকোর বেগম ঠাট্টাও বোঝে না।

—আমার অন্যায় হয়েছে।

—কিছু হয় নি। কই দেখি কার তস্‌বির?

নাদিরা ভয়ে ভয়ে সুন্দর কয়েকটি ছবি তুলে এনে দেখায়।

—বেশ হাত্ তো? কে এঁকেছে?

—দারা।

—কি বললে?

—সত্যি।

অবাক্ হই আমার ভাইটির প্রতিভা দেখে। এই সব সূক্ষ্ম কাজের প্রতিভা দেখে আবার ভয়ও হয়। এ-জাতীয় পুরুষ সার্থক বাদশাহ্ হতে পারে না। দারা অব বীর—দক্ষ যোদ্ধা সে। তবু প্রতিভা তাকে কোন্ পথে টেনে নিয়ে যাবে শেষ পর্য কে বলতে পারে? যদি এ-দিকেই মন দেয়, আমার দুঃখ থাকবে না। কি মসনদের প্রলোভন আর প্রতিভার চাহিদা যদি তার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করে ত তার ভবিষ্যৎ বড়ই দুঃখের।

—দারাকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে নাদিরা।

—কোন্‌টা ঠিক পথ?

—জানি না। নির্বাচনের ভার তোমার।

নাদিরা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। কি বুঝল সেই জানে

পরদিন শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দরবারে যাবার মুখে বাদশাহের সামনে না দাঁড়িয়ে প

না। সারারাত ছটফট্ করেছি। কৌতূহল একদণ্ড আমাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেয় নি। শিল্পীকে পুরস্কার দেবার আড়ালে প্রচ্ছন্ন কোন ইনসাফের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা কে বলতে পারে? দরবারের কার্যরীতি বড়ই বিচিত্র। বাদশাহের কন্যা হয়েও এক একটি ঘটনা আমাকে চমকিত করেছে। বাদশাহও চমকিত হয়েছেন হয়তো। কারণ অনেক বিচারের গতি বাদশাহের অনিচ্ছায় আমীর-ওমরাহের প্রভাবে পড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ নেয়। রাজনীতিতে প্রভাবশালী পুরুষদের বাধ্য হয়েই মানতে হয় অনেক সময়। শুনেছি, আকবর বাদশাহ্ কারও কথা শুনতেন না। কথাটির মধ্যে সত্য থাকলেও, সবটুকু নয়। পদে পদে যুদ্ধের আশঙ্কাকে কোন বাদশাহ্ই মেনে নিতে চান না। যুদ্ধ ভালবাসলেও যুদ্ধের নেশা আকবরের ছিল না। যুদ্ধের নেশা যাদের থাকে দেশকে গড়তে পারে না তারা।

বাদশাহ্ শাহজাহান আমাকে সামনে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। মুখের দিকে চান। তাঁর এক এক সময়ের দৃষ্টি আমাকে বড় বেশী লজ্জা দেয়। সে দৃষ্টি আমি ঠিক চিনতে পারি না। হঠাৎ আমার দিকে চাইলেই অমন দেখা যায়। এতে তিনিও কম অপ্রস্তুত হন না।

—কি খবর জাহানারা?

—আজ দরবারে বিশেষ কিছু আছে কি?

—না।

অভিমানের সময় নেই। আমাকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে ঝরোকার পেছনে।

—তাজমহলের সেই শিল্পী নাকি আসবে?

—ও। হ্যাঁ। আমার হিতৈষীরা বলছিলেন তাকে আরও কিছু টাকা দেওয়া দরকার।

—কেন?

তাঁরা চান না শিল্পী তার জীবনে দ্বিতীয় কোন তাজমহল তৈরি করুক।

—সে কি? তার মানে?

—তাজমহলই যেন তার শেষ সৃষ্টি হয়।

ক্রোধে আমার গা কাঁপতে থাকে। আমীর-ওমরাহেরা যা বলে বলুক। কিন্তু বাদশাহের এই অবহেলা অসহ্য। মানুষটির কাজকে প্রশংসা করেও মানুষটিকে সম্মান জানাতে পারলেন না। অদ্ভুত দুর্বলতা।

উত্তেজিত হই। খুবই উত্তেজিত হই। বলি,—শাহানশাহ্ শাহজাহান ছাড়া তাজমহল তৈরির অর্থ যোগানো আর কারও পক্ষে কি সম্ভব? শিল্পী কোথায় পাবে

সেই অর্থ, যার ফলে দ্বিতীয় একটি তাজমহলের গম্বুজ দিগন্তের রেখায় শোভা পাবে।

—আমি সে-কথা বলেছিলাম। ওঁরা বলেন, মসনদ একটি জল-বুদ্বুদ্। যে কোন মুহূর্তে ফেটে গিয়ে তলিয়ে দিতে পারে। নতুন বুদ্বুদের ওপর নতুন লোক এসে ওই শিল্পীকে ডেকে এনে আরও বিস্ময়কর কিছু তৈরি করতে পারে।

বুঝলাম অমরত্বের মোহে অন্ধ হয়েছেন বাদশাহ্। প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রিয়তমা বেগমকে অমর করা, এখন সেই সঙ্গে নিজেকেও জড়িয়ে ফেলেছেন। মুক্তির পথ তিনি খুঁজে পাবেন না। তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে আমার বক্তব্য বাদশাহের কানে ছুঁড়ে দিই,—তেমন অঘটন যদি ঘটে তবে টাকা নিয়ে শিল্পী যে কথা দিয়ে যাবে সে কথা পালন করতে বাধ্য থাকবে কি?

বাদশাহ্ জবাব খুঁজে পান না। তাঁর ললাটে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষে তাড়াতাড়ি শেষ অস্ত্র ছাড়েন,—এটা রাজনীতি জাহানারা। অনেক সময় নিজেকে অন্যের ইচ্ছায় সমর্থন না করলে রাজকার্যে জটিলতা দেখা দেয়। একজন শিল্পীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে গিয়ে সে জটিলতা নাই বা সৃষ্টি করলাম।

বাদশাহ্ চলে যান।

রাগে ক্ষোভে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমি ঝরোকার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। দেখতে হবে। আগাগোড়া সব কিছু দেখতে হবে। জানতে হবে বাদশাহের প্রকৃত মনোভাব।

একটু পরে কোয়েলও এসে আমার পেছনে দাঁড়ায়। তার মুখে কিছু কিছু স্বেদ; কোয়েল ঠিক সাধারণ বুদ্ধির মেয়ে নয়। সে-ও বুঝতে পেরেছে শিল্পীকে প্রচুর এনাম দেবার পেছনে রয়েছে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য। তাই তার মুখে চাপা আনন্দের রক্তিমাভার পরিবর্তে অনিশ্চয়তার বিন্দু বিন্দু ঘাম।

দরবারে প্রতিদিনের ওমরাহের দল রয়েছে। নতুন লোকের মধ্যে দেখলাম তাজমহলের ভারপ্রাপ্ত শিল্পী ইসা মামুদ-ইফেন্দী আর দেখলাম ওস্তাদ হামিদ খাঁকে। লোকটা নাকি ইতিমধ্যে বেশ নাম করেছে ইমারত তৈরির ব্যাপারে। সম্প্রতি বাদশাহ্ দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের বিষয়ে চিন্তা করছেন। সে ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে এই হামিদ খাঁ।

হামিদ খাঁর নাকি মনে মনে বাসনা আর একটি বিস্ময় সৃষ্টি করবে সে। জানি না দিল্লীর প্রাসাদের জন্যে বাদশাহ্ কত খরচ করবেন।

কিন্তু শিল্পী কই?

কোয়েলের দিকে চাই। দেখি সে তন্ময় হয়ে দরবারের শেষ প্রান্তে চেয়ে রয়েছে।

তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখতে পাই শিল্পীকে। বসে রয়েছে সে। কেমন যেন সঙ্কুচিত সে। শুধু তার চাহনি অবাক্ বিস্ময়ে দরবারের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেওয়ান-ই-খাসে এই প্রথম এল বোধ হয়।

বাদশাহ্ শিল্পীকে ডাকতে বলেন।

এগিয়ে আসে সে এক-পা এক-পা করে। সে বুঝতে পারছে না কভাবে দাঁড়াতে হয় বাদশাহের সামনে। ইচ্ছে হয়, গিয়ে তাকে শিখিয়ে দিই। কিন্তু কোয়েল পেছনে। আমার মনের ইচ্ছেও সে হয়তো জেনে ফেলবে। তার ধারণা, চাঁদ কখনো পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে না।

কোনরকমে বাদশাহ্‌কে কুর্নিশ করে শিল্পী দাঁড়ায়। তার পা কাঁপে। অথচ এই শিল্পীই কোনরকম সম্মান না দেখিয়ে বাদশাহের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছে তাজমহলের আঙিনায়। ভাবি, সত্যিই অদ্ভুত এরা। না না, অদ্ভুত নয় অপূর্ব, ওর পায়ের কাঁপুনি থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। পা ধরে—। না না—কোয়েল রয়েছে পেছনে।

পিতা গম্ভীর স্বরে বলেন,—তোমার কাজে আমরা, বিশেষ করে আমি খুব খুশী হয়েছি। তাই তোমার যা পাওনা তুমি পেয়েছ, তার উপরও পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা এনাম দেব বলে মনস্থ করেছি।

শিল্পী বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে জানত যে সে পুরস্কার পাবে। কিন্তু তার পরিমাণ যে এতটা কল্পনাও করে নি সে।

কায়েল কেঁদে ওঠে। বুঝতে পারি পাঁচ হাজার স্বর্ণ-মুদ্রার মূল্য যে কতখানি, শিল্পী া জানলেও কোয়েল অনুমান করতে পারে। তাই শিল্পীর চোখ শুষ্ক, অথচ কোয়েল কেঁদে মরে।

কিন্তু তার দিকে চাইবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। আমি জানি এরপর কি হবে। বুক কাঁপে আমার।

রত্নাগারের অধ্যক্ষ বেবাদল খাঁ একটি সুদৃশ্য গজদন্ত-নির্মিত ভারী পেটিকা একজন প্রহরীর মাথায় চাপিয়ে শিল্পীর দিকে এগিয়ে আসে।

হঠাৎ হামিদ খাঁ চেঁচিয়ে ওঠে,—কিন্তু জাহাঁপনা—

বাদশাহ্ হাত উঁচিয়ে তাকে থামিয়ে দেন। তাঁর চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ, ধীরে ধীরে বলেন,—কিন্তু এনাম নেবার আগে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমায়।

কোয়েলের মুখ দিয়ে বিস্ময়ের অস্ফুট শব্দ বার হয়। শিল্পীও স্তব্ধ।

—তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তাজমহলের মতো শিল্প সৃষ্টি ভবিষ্যতে তুমি আর কখনো করতে পারবে না।

এবারে ইসা-মামুদ বলে ওঠে—তাহলে আমাকেও সেই প্রতিজ্ঞা করতে হয় জাহাঁপনা।

—না। তুমি আমার দরবারের লোক। শিল্পী বাইরের।

এই প্রথম শিল্পীর পায়ের কাঁপুনি থামে। তার মুখে এক ঝলক হাসি ভেসে ওঠে। তাকে বলতে শুনি আপনি—ছাড়া এ জগতে আর কে এ-কাজ করার সামর্থ্য রাখে? ভবিষ্যতে আপনার যদি এরকম কোন ইচ্ছে হয়?

—হবে না।

বাদশাহের কথায় শিল্পী কি জবাব দেবে আমি অনুমান করতে পারি। তারপরে গজদন্তের পেটিকা প্রহরীর মাথায় চাপিয়ে সে দরবার ত্যাগ করবে। কিন্তু সে কোন জবাব দেয় না। তাকে চিন্তান্বিত দেখি।

সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত। অথচ মনে হয়—বহুযুগ। শিল্পী বাদশাহের দিকে সোজা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ম্লান হেসে বলে,—আমি কোন প্রতিজ্ঞা করব না জাহাঁপনা।

পিতার মুখে কি ক্রোধ? না বিস্ময়?

—পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার কথা ভুলে যাও নি তো?

ইসা-মামুদ উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বলে,—না বাদশাহ্, ভুলে না গিয়েই সে আপনার কথার জবাব দিয়েছে। যে মুহূর্তে সে প্রতিজ্ঞা করবে সেই মুহূর্তে তার শিল্পী-মন কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা পড়বে। ও জানে, তাজমহল নির্মাণের সুযোগ কোনদিনই ওর আসবে না তবু শৃঙ্খলিত শিল্পী-মন নিয়ে তার কোন সৃষ্টিতেই বেহেস্ত-এর পরশ থাকবে না।

বাদশাহের মুখে খুশীর ঝলক। এইটুকু দেখবার জন্যেই আজ আমি দরবারে উঁকি দিতে এসেছি। মনের বোঝা আমার নেমে যায়।

যুবক-শিল্পীর চোখে জল। ইসা-মামুদের উদ্দেশ্যে সে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। দরবারের নিয়ম অনুযায়ী বাদশাহ্ ছাড়া আর কাউকে সম্মান জানানো অবমাননাকর। তবু সবাই উপেক্ষা করে আজ।

শিল্পী ভাঙা ভাঙা গলায় বলে,—আপনি নিজে জানেন আমাদের মনের কথা জাহাঁপনা। আপনিও যে আমাদের দলে। আমাকে আপনি পরীক্ষা করেছিলেন।

একজন ওমরাহ্ বলে,—এনাম ওকে দেবেন না জাহাঁপনা।

ঘুরে দাঁড়ায় যুবক তার দিকে। বলে,—এনাম আমি পেয়েছি দোস্ত।

কয়েকজন ওমরাহ এক সংগে বলে,—না পাও নি।

দৃঢ়স্বরে শিল্পী বলে,—পেয়েছি।

ওমরাহেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে বাদশাহের দিকে চায়। তিনি যুবককে বলেন,—তুমি যেতে পার।

—এনাম? কয়েকজন প্রশ্ন করে।

—নেবে না। বাদশাহ্ গম্ভীর।

—নেবে না? সমস্ত দরবার একসঙ্গে কথা বলে ওঠে।

শিল্পী ততক্ষণে দরওয়াজার দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

কোয়েল কেঁদে ওঠে।

—দু'বারের কান্নাই কি আনন্দের কোয়েল?

নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দেয় সে,—হ্যাঁ শাহ্জাদী। কিন্তু এবারের আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছি না।

আবার বুঝলাম, কোয়েল সাধারণ মেয়ে নয়।

সেইদিনই সন্ধ্যায় আমার কক্ষে প্রবেশ করে কোয়েল এক অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখে। চমকে উঠি আমি।

—কি হয়েছে কোয়েল?

সে কথা বলে না। শুধু চেয়ে থাকে। তার চাহনিতে কোন ভাষা নেই।

—কোয়েল?

বৃথা। দরবারের পর আমার কাছ থেকে ছুটি চেয়েছিল সে দুপুরবেলাটুকু। জানতাম, কোথায় যাবে। ছুটি দিয়েছিলাম তাই। অপেক্ষা করছিলাম তার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা দেখব বলে। কিন্তু একি? এমন কি দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা কোয়েলের মতো স্থির মস্তিষ্কের মেয়েকেও এতখানি বিচলিত করেছে?

—রোশনারা আবার অপমান করেছে কোয়েল?

কথা বলে না তবু। কাছে গিয়ে শরীর স্পর্শ করতেই সে পড়ে যায়। জ্ঞান হারায়। প্রথমে আমি দিশেহারা হই। তারপর শাহ্জাদী হয়ে নাজীরের মাথায় ব্যজন করি। বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসে কোয়েলের। চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে। অমন বুক ভাঙা কান্না জীবনে শুধু আর একবার শুনেছিলাম—মায়ের মৃত্যুর দিনে।

তবে কি—! কিন্তু সে যে অসম্ভব। এর মধ্যে শিল্পীর এমন কি হতে পারে।

শান্ত হয় কোয়েল। তারপর সামান্য কয়টি কথায় যে সাঙ্ঘাতিক খবর সে বলে, তাতে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। আমিও কাঁদি। ওর মতোই কাঁদি।

সাঙ্ঘাতিক। কেঁপে কেঁপে ওঠে আমার হৃদয়। এমন জঘন্য পাপী আমারই পিতার সাম্রাজ্যে বাস করে—এই আগ্রাতেই। ধিক্।

তার চেয়ে শিল্পীর প্রাণটুকু নিলেই পারত। আফসোস থাকত না তার। আমাদেরও দুঃখ এত অসহনীয় হত না।
বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে দিয়ে গেল শিল্পীর? পিশাচ তারা। তাই শিল্পকার্যে তন্ময় শিল্পীকে পাঁচ-সাত জনে একসঙ্গে আক্রমণ করে অমন সর্বনাশ করে গেল। মন বেঁচে থাকল ওর। চোখও জেগে রইল। অথচ হাত দিয়ে স্বপ্নকে রূপ দেবার উপায় রইল না।
কিছু সময়ের জন্যে ক্রোধও যেন আমাকে ত্যাগ করে যায়। হতাশা আর অশ্রুজল ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কিন্তু আমি শাহ্‌জাদী জাহানারা। ধীরে ধীরে প্রতিহিংসা জাগে মনে। এক উদগ্র প্রতিহিংসা। তড়িৎবেগে উঠে আমি উন্মত্তের মতো সেদিকে যাই।
কোনরকম খবর না দিয়ে ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ি 'দশ-পঁচিশী'তে। নূপুরের আওয়াজ স্তব্ধ হয়। নর্তকীদের চপল পা স্থাণুর মতো গালিচায় আটকে যায়। সচকিত হয়ে বাদশাহ্ মুখ তুলে আমাকে দেখেন।
—কেন এসেছ? বাদশাহের কণ্ঠস্বরে চাপা ক্রোধ।
সে ক্রোধে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমি বলি,—গুরুতর কারণ ঘটেছে বলেই এসেছি। তাছাড়া আমি জানি শাহানশাহ্ শাহজাহান সুরাপান করে কখনো বেসামাল হন না।
নর্তকীদের ভয়-চকিত দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। তারা হয়তো কল্পনাই করতে পারে নি বাদশাহ্‌কে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে—সে বাদশাহের যত আপন লোকই হোক না কেন। বাদশাহ্‌ও হয়তো চমকে ওঠেন আমার কথা শুনে। এমন কথা জীবনে তিনি প্রথম শুনলেন আমার মুখে।
কিন্তু অতশত দেখবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমি চাই প্রতিহিংসা —নিষ্ঠুরতম প্রতিহিংসা।
বাদশাহ্‌কে দেখে মনে হয় তাঁর ক্রোধ অনেকটা অন্তর্হিত হয়েছে। পরিবর্তে একটা কৌতূহল জেগেছে মনে। তবু গম্ভীর হয়ে বলেন,—কিন্তু তোমার জীবন তো যেতে পারত প্রহরীদের হাতে। জান না আমার আদেশ?
—জানি। কিন্তু 'দশ-পঁচিশী'র প্রহরীরা যে আমারই নিযুক্ত। তারা জানে এখানকার এই সান্ধ্য আসরের মূলে আমি।
হয়তো আমার মধ্যে এক অদেখা বেয়াড়াপনার সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। তাই একটু চুপ করে থেকে বলেন,—কেন এসেছ?
—সবার সামনে বলতে পারব না।
নর্তকীরা নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করে। কক্ষের মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করে। নীচের

দিকে চেয়ে থাকি। 'দশ-পঁচিশী'র নানা বর্ণের চতুষ্কোণ ঘরগুলি শোভা পায় মেঝেতে।
—বল জাহানারা।

আমি খুলে বলি সব। বলতে বলতে আমার বুকের মধ্যে বাষ্প জমে। সে বাষ্প অশ্রুর আকারে যে কোন মুহূর্তে চোখ বেয়ে ধারা হয়ে নামতে পারে। তবু থামি না। বলে যাই—

নীরবে বাদশাহ্ শুনে যান। আমার বক্তব্য একসময় শেষ হয়। তবু তিনি নীরব। একটা সংশয়ের ছায়া আমার মনের মধ্যে উঁকি দেয়। তবে কি শাহজাহানও এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছেন? আমার উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে শিল্পীকে শাস্তি না দিতে পেরে তিনি এ ভাবে তার ভবিষ্যতের সমস্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিলেন! না-না, তাও কি হতে পারে? এ আমি কি ভাবছি?

হঠাৎ বাদশাহের চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। তিনি কাঁপতে থাকেন। বিলাসী শাহজাহানের এই ভয়ংকর রূপ আমি আগে কখনো দেখি নি। সামনের সুরার পাত্রটি ছুঁড়ে ফেলেন তিনি। ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায় সেটি। তারপর উঠে দাঁড়ান। নিজের অদম্য রোষবহ্নিকে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনি বলেন,—মানুষ এত হীন হতে পারে আমি ভাবি নি জাহানারা। অপরাধীকে আমি শাস্তি দেব—কঠোরতম শাস্তি দেব।

বাদশাহ্ 'দশ-পঁচিশী' কক্ষ থেকে বার হয়ে দেওয়ান-ই-খাসের দিকে দ্রুত চলে যান। কোন প্রহরীর মাধ্যমে আদেশ পাঠিয়ে বাদশাহ্ ব্যবস্থা অবলম্বনের ঝুঁকি নিলেন না। তিনি নিজেই গেলেন। কার কাছে গেলেন আমি জানি। আর এও জানি, এ সময়ে দেওয়ান-ই-খাসে কেউ না থাকুক সে অন্তত একা বসে রয়েছে। বক্সের আমীর নজরৎ খাঁ। নতুন স্থান পেয়েছে দরবারে। বয়সেও নবীন। বীর যোদ্ধা বলে সুখ্যাতি আছে শুনেছি। যোদ্ধা তো বটেই—চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। অমন পেশীবহুল দেহ আর শক্ত গড়ন আমার ভাইদের মধ্যে মুরাদ ছাড়া কারও নেই।

বাদশাহ্ নজরৎ খাঁকে অল্পদিনেই বড় বেশী বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। না করেও উপায় নেই। কিসে মন ভেজে পিতার, সব যেন তার নখদর্পণে। এত বেশী গলিয়ে দিয়েছে সে বাদশাহ্‌কে যে সেদিন দারার অনুপস্থিতিতে তিনি হঠাৎ নজরৎ খাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ঝরোকার কাছে। কোন একটি স্ত্রীলোকের বিচারের ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন বাদশাহ্। প্রথমে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলাম আমি—চিন্তিতও। তারপর নিজের মর্যাদা অনুযায়ী আমার মতামত নজরৎকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

আজ এই গোপন কাজটির ভার তিনি নিঃসন্দেহে ওরই ওপর দেবেন। জানি,

সুষ্ঠুভাবে পালন করবে নজরৎ বাদশাহের আদেশ। কাল থেকে পৃথিবীর বুকে শিল্পীর আক্রমণকারী বিচরণ করে বেড়াবে না। একদিনেই প্রকৃত আক্রমণকারীকে খুঁজে বার করা যাবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলি। শত হলেও এটা নরহত্যা। আর আমি নারী। নজরৎ খাঁ তার বুকখানা ফুলিয়ে কাল দেওয়ান-ই-খাসে এসে দাঁড়াবে। তার চোরা-চাহনি ঘন ঘন ঝরোকায় প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে। ক'দিন থেকেই এমন হচ্ছে। নিজের সম্বন্ধে তার খুবই উঁচু ধারণা। সে ধারণা অবিশ্যি অমূলক নয়। অমন সুপুরুষ বীর ওমরাহ আঙুলে গোনা যায়। কিন্তু সে যা ভেবে বসে রয়েছে সেটি ভুল। আমি তাকে পছন্দ করতে পারি নি।

ভারাক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে প্রবেশ করি। কক্ষের এককোণে কোয়েল তখনো দাঁড়িয়ে। আমার পায়ের শব্দে ফিরে তাকায়। চেয়ে দেখি গালে তার শুষ্ক জলেব রেখা।

আমার দিকে এগিয়ে আসে সে। আমি জানি কী ব্যথা তার বুকে। ভালবাসা না পেয়েও নিজে ভালবেসে মরেছে। আর যাকে ভালবাসে তার জীবনের সব চাইতে দুর্দিন আজ। দ্বিতীয় তাজমহল পৃথিবীর বুকে আর কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াবে না। যুগের পর যুগ যাবে, কালের গ্রাস থেকে যদি আজকের তাজমহল রক্ষা পায় তবে শুধু এটিকে দেখেই সারা পৃথিবীর মানুষকে তুষ্ট থাকতে হবে।

—কোয়েল?

—শাহ্‌জাদী?

—তারা শাস্তি পাবে।

—কারা শাহ্‌জাদী?

—যারা এ কাজ করেছে।

—কী লাভ?

তাই তো। কী লাভ! যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন আর কোন কিছুতেই কোন ফলই হবে না। শিল্পীর নষ্ট আঙুল আর জোড়া লাগবে না। কোয়েলের হতাশা এখন লাভ-লোকসানের বাইরে।

কিন্তু আমি কোয়েল নই। আমি জানি, অপরাধীকে শাস্তি পেতেই হবে। নইলে জগতের প্রতিটি শিল্পীই চিরকাল প্রতিভাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে এইভাবে নির্যাতন সয়ে যাবে। শাস্তির একটি উদাহরণ অন্তত রাখা চাই ভবিষ্যতের মানুষের সম্মুখে।

কিন্তু উদাহরণ তো থাকবে না। নিঃশব্দে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কাক-চিলও

জানতে পারবে না কিভাবে অপরাধীর মৃত্যু হল। অপরাধী যে সাধারণ ব্যক্তি নয় এটুকু সবাই বুঝেছে। নইলে নজরৎ খাঁয়ের ওপর তাকে শাস্তি দেবার ভার পড়ত না। যদি তার শব খুঁজে পাওয়া যায়, লোকে জানবে আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছে সে। ইতিহাসে এই শাস্তির কথা লেখা থাকবে না। লেখা থাকবে শুধু আমার এই একান্ত আপনার কিতাবটিতে, বাবা যা দিয়েছেন আমাকে। কিন্তু এ কিতাব আমার মৃত্যুর পর কতদিন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে জানি না।

—কোয়েল ?

—শাহ্‌জাদী।

—সেই মূর্তি কতখানি গড়া হয়েছিল ?

—মনে মনে সবটাই গড়েছিল। কিন্তু পাথরে খোদাই-এর কাজ সবে শুরু করেছিল। ইচ্ছে ছিল খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে—মূর্তির প্রতিটি অণু থেকে যাতে সৌন্দর্য ঝরে পড়ে। হল না। তার সাধের তিলোত্তমা গড়া হল না।

হঠাৎ এক অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে ওঠে। কোয়েলের মনে সে আশঙ্কা হয়তো স্থান পায় নি এখনো। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—সে আত্মহত্যা করবে না তো কোয়েল ?

—জানি না। তবে আজ করবে না। আজ তার কোন বোধশক্তিই নেই। হয়তো পাগল হয়ে যাবে শেষে।

শয্যার ওপর গিয়ে বসি। নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয়। এমন অবসাদ অনুভব করেছিলাম শুধু মায়ের মৃত্যুর রাত্রে। নবজাত বোনের কান্না শুনেও সেদিন দেখতে যাবার শক্তি ছিল না। সেদিনের পর থেকে খুব কমই গিয়েছি বোনের কাছে। কেন যেন মনে হত, মায়ের মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী। এ মনোভাবের গোড়ায় কুসংস্কার কাজ করে জানি। তবু সে সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি নি। নাজীরদের কোলে কোলেই মানুষ হল ছোট বোনটি। আজ সে সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে। বড় শান্ত বড় ধীর। মাঝে মাঝে সঙ্কোচে আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাই। আদর করি। বুঝতে পারি, দিনের পর দিন একটু একটু করে আমার মনের কাছে চলে আসছে সে। শত হলেও সে আমাদের চেয়েও হতভাগী।

নানান চিন্তা একসঙ্গে আমার মাথার ভিতরে জট পাকিয়ে আমাকে অন্যমনস্ক করে তুলছিল। পালঙ্কের বাজু ধরে ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম বাইরে। আকাশে চাঁদ ছিল না। শুধু তারা। সে তারাও পাতলা মেঘে মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ছিল। হঠাৎ একসময় মনে হয় বহুদূর থেকে কে যেন আমায় ডাকছে।

কোয়েল। কোয়েলই ডাকছে। একেবারে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। কিন্তু তার গলার স্বর খুবই চাপা।

—বল কোয়েল।

—আমায় বিদায় দিন।

—আমিও সেকথা ভাবছিলাম। ওর কাছে তো কেউ থাকবে না। রাতে তুমিই গিয়ে থাকো।

—শুধু রাতের জন্যে নয়। চিরদিনের জন্যেই যাচ্ছি।

কোয়েল চলে যেতে চায়? চিরদিনের জন্যে? কোয়েল ছাড়া আমার নিজের অস্তিত্বের কথাও যে আজকাল ভাবতে পারি না। অসহায়ের মতো চেয়ে থাকি।

—অনুমতি দিন শাহ্‌জাদী। কোয়েলের কণ্ঠস্বরে আকুতি।

—বাধা দিচ্ছি না কোয়েল। তুমি যাও।

'সিজদা' করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে। তারপর হঠাৎ নাজীরের সমস্ত দূরত্ব মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে আমার উরুর ওপর মুখ রেখে কেঁদে ফেলে। আমার চোখও শুকনো রাখতে পারি না। কোয়েল শুধু সাধারণ একজন বাঁদী নয়, সে আমার বন্ধু। সে আমার পরামর্শদাতা। তার অভাব অনেকদিন অনুভূত হবে—যতদিন নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারব।

ধীরে ধীরে মাথা তোলে সে। বলে,—জীবনে কেউ যেন আমার এ অবস্থায় না পড়ে। দুদিকেই দুর্নিবার আকর্ষণ। কোন একটা ছেড়ে দেওয়াই চূড়ান্ত বেদনার।

—কোয়েল? শিল্পী কি কখনো জানতে পাবে, কার মূর্তি সে গড়তে চেয়েছিল?

—হ্যাঁ। তবে যতদিন আগ্রায় থাকবে ততদিন নয়। আগ্রা থেকে দূরে—বহুদূরে, বাঙলার সেই নিভৃত পল্লীতে তার নিজের গৃহে যখন সে ফিরে যাবে, শুধু তখনই অবস্থা বুঝে তাকে বলব সব কথা। তখন বলব, তার জীবনের একমাত্র নারীর কথা।

—তুমি যাবে?..

—হ্যাঁ শাহ্‌জাদী। আমি ওর সঙ্গেই যাব। ওকে দেখবার আর কেউ নেই।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে কোয়েলের নতুন রূপের দিকে চেয়ে থাকি। আল্লার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। মুঘল-বাদশাহের হারেমে জন্মেও এই রূপ দেখার দৃষ্টি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেন নি।

—যাই শাহ্‌জাদী। যতদিন ওর আয়ু রয়েছে, ওর কাছেই থাকব। আয়ু ফুরোলেও ওখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব। তবে কখনও যদি ওই দূরতম অঞ্চলেও

আপনার দুর্দিনের কথা ভেসে যায়, ঠিক চলে আসব। আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো। আপনি হয়তো তখন চিনতে পারবেন না আমাকে। তবু আসব।
আমার জবাব শোনবার আগেই সে দরওয়াজার দিকে চলে যায়। শুধু আড়ালে যাবার পূর্বে একবার দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে সে আমাকে দেখে নেয়। পরক্ষণেই জোর করে নিজের দেহটিকে বার করে নিয়ে যায়।
চলে গেল কোয়েল। আর ফিরবে না।

অঙ্গুরীবাগের দিকে চেয়ে বসেছিলাম। দুপুরের তীব্র সূর্যকিরণ ধীরে ধীরে নরম হয়ে এসেছে। বাগের গাছপালা আর সবুজ তৃণের ওপর সোনার ছোপ এখনো লাগে নি। ফুলের দল এতক্ষণ অসহ্য জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাদের স্বাভাবিক বর্ণ আর সৌন্দর্য নিয়ে নিজেদের মেলে ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়।
অঙ্গুরীবাগের ওই কোণে কারুকার্যশোভিত আসনটির দিকে দৃষ্টি পড়লে সুজার কথা মনে হয়। কত আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে ওটি তৈরি করিয়ে ওখানে স্থাপন করেছিল। প্রথমে আমরা কেউ-ই বুঝতে পারি নি। প্রশ্ন করলে সে মৃদু হাসত। তারপর এক সন্ধ্যায় বাগের ভেতরে হাজার সুন্দরীর মেলা দেখে অবাক্ হয়েছিলাম। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখি, সুজা বসে রয়েছে তার সখের আসনটির ওপর। বহুমূল্য পরিচ্ছদ তার পরনে। আর তার সামনে দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিমায় একটি পর একটি সুন্দরী এগিয়ে চলেছে তাদের শরীরের সবটুকু মাধুর্য পরিস্ফুট করে। নিজের নয়ন আর যৌবনের পরিতৃপ্তির এই অভাবনীয় আবিষ্কারের উন্মাদনায় সুজা মত্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন। কিন্তু কপালে তার এ-আনন্দ সইল না বেশীদিন।
বাদশাহ্ একদিন দরবারে আমীর-ওমরাহদের সামনে তার হাতে একটি হুকুমনামা ধরিয়ে দিলেন। বাঙলার শাসনকর্তার পদ। একদিকে অভাবনীয় আনন্দ, অন্যদিকে হাজার সুন্দরীর বিরহ। সুজা দিশে হারিয়ে ফেলেছিল।
তার বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলে আমার কক্ষে এসে চুপি চুপি বলেছিল—বাদশাহ্ আমায় ঈর্ষা করেন জাহানারা। তিনি চান জগতে তিনিই শুধু বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যাবেন—আর কেউ নয়। হাজার মেয়ের খেল্ দেখে তিনি চমকে গিয়েছেন। তাই পাঠিয়ে দিলেন দূরে।
—রাগে-সব মানুষই জ্ঞান হারায় সুজা। তুমিও হারিয়েছ। তাই বাদশাহ্ সম্বন্ধে এমন হীন মন্তব্য করতে পারলে। একটু ভাবলে বুঝতে পারতে, তোমার অন্ধকার ভবিষ্যৎকে

উজ্জ্বল করে তুলবার পথ দেখিয়ে দিলেন তিনি। এখন পারা না পারা তোমার শক্তি, সাহস আর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে। নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে বিলাসিতার নতুন নতুন পথ দেখাতে আমার দরজার বাইরে ওই খোজাটিও পারে।

মুখ বেজার করে চলে গিয়েছিল সুজা সেদিন। আমার কথার কোন জবাব দিতে পারে নি সে। আর সে আসে নি। বাঙলায় ভালই কাজ দেখাচ্ছে বলে শুনেছি।

অঙ্গুরীবাগের গাছপালায় ক্রমে সোনার পরশ লাগে। চেয়ে চেয়ে দেখি। কোন কাজ নেই। কোয়েল চলে যাবার পর থেকে বড় ফাঁকা লাগে। কথা বলার লোক পাই না। ছোট বোনটি প্রায় রোজই আসে। তাকে নিয়ে কিছু সময় কাটে। নাদিরার ঘরে যাই, দারা যদি উপস্থিত না থাকে। রোশনারা আমাকে এড়িয়ে চলে। বুঝতে পারি, আমাকে সে ঠিক সহ্য করতে পারে না। সে খাঁটি পৃথিবীর মেয়ে। নিজের দেহ, নিজের রূপ আর নিজের ইচ্ছে নিয়েই মশগুল রয়েছে। জানে না রূপের আয়ু কতটুকু। বাদশাহের ভগিনীদের ঘরগুলো একবার করে ঘুরে এলেই বুঝতে পারত। যদি বুঝত, তাহলে ওর চিন্তার গভীরতাও অনেক বেড়ে যেত।

পদশব্দে ফিরে দেখি আমার নাজীর সযত্নে আমার অপরাহ্নের জলখাবার নিয়ে হাজির করেছে। নূরজাহানের পরামর্শে এ সময়ে আমি কিছু ফলমূল আহার করি। চেয়ে দেখি অনেক ফল। দর্দ-ই-চিরাগ, সফতালু, জর্দলু এমন কি অসময়ে একটি নব্বজকও ফলগুলির মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। হাসি পায়। আমাকে তুষ্ট করার প্রয়াসের অন্ত নেই এর। সেই কবে কোয়েল চলে গিয়েছে, তারপর থেকে ওই-ই রয়েছে। কাজেকর্মে বেশ চটপটে। কাজই ওর ধ্যান-ধারণা। তার বেশী ভাববার মতো মস্তিষ্ক ওর নেই। তাই ও এত চটপটে, এত পটু। কোয়েল এমন ছিল না। কোয়েলের কাজ আমাকে কোনদিন আনন্দ দিয়েছে কিনা চিন্তা করারও অবসর পাই নি। কারণ ও আশেপাশে থাকলেই আমার মনটি ভরে থাকত। ও নেই আজ, তাই আমার মনও ফাঁকা। এই নাজীরের সহস্র প্রচেষ্টা আমার মনের ফাঁকটুকু ভরাট করতে পারছে না।

সামান্য একটু জলযোগ সেরে আঙুরের রস পান করি। ওকে ইঙ্গিতে সব উঠিয়ে নিয়ে যেতে বলে আবার বাইরে দৃষ্টি ফেরাই। হারেমের এই গণ্ডীর ভেতরে বসে থেকে ইচ্ছে হয় মনটিকে মিলিয়ে দিই অসীমের সঙ্গে।

হঠাৎ নজরে পড়ে অঙ্গুরীবাগের ঠিক পাশে একজন পুরুষের দিকে। একটু দূরে হলেও চিনতে মোটেই দেরি হয় না। অমন প্রশস্ত আর উন্নত বক্ষ আমীরদের মধ্যে শুধু একজনেরই রয়েছে। সে নজরৎ খাঁ। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে সে আমার

বাতায়নের দিকে। খোজাদের মধ্যে কাউকে অর্থ দ্বারা বশ করেছে নিশ্চয়ই। নইলে শাহ্‌জাদী জাহানারা কোন্ প্রকোষ্ঠে থাকে সেকথা জানার কথা নয় নজরৎ খাঁয়ের। বাইরের কেউ-ই জানে না। নজরৎ খাঁয়ের অঙ্গুরীবাগের পাশে উপস্থিতিও ঠিক স্বাভাবিক নয়। কারণ স্থানটি বাদশাহের পরিবারের জন্য সুরক্ষিত। সম্ভবত কৌশলে বাদশাহের অনুমতি নিয়েছে সে। দারার কাছ থেকেও ছাড়পত্র পেতে পারে। দারার সঙ্গে কিছুদিন থেকে তার বড় বেশী মাখামাখি। ভাইদের মধ্যে দারার প্রতি যে আমার একটু পক্ষপাতিত্ব রয়েছে, জেনে ফেলেছে নাকি? এত তাড়াতাড়ি জানা সম্ভব নয়। দারাই একমাত্র শাহ্‌জাদা যে আগ্রায় রয়েছে। তাই দুটো পথই মসৃণ করে নিয়েছে বক্সের আমীর।

স্পষ্ট বুঝতে পারি আমীর সাহেব আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। কক্ষের অপেক্ষাকৃত কম আলোই তার কারণ।

হাবভাবে তার অস্থিরতা প্রকাশ পায়। এত আয়োজন সব ব্যর্থ হতে বসেছে। খুব মজা লাগছে।

হঠাৎ রোশনারার ভূত আমার ঘাড়ে চাপে। বয়সের ভূতও হতে পারে। নজরৎকে লোভ দেখাতে ইচ্ছে হয় আমার। নিজেই টোপ হয়ে বাতায়নের বাইরে মুখ বাড়াই।

নিশ্চল হয়ে যায় বক্সের আমীরের মূর্তি। দূর থেকে তার চোখ দুটো দেখতে না পেলেও সে চোখ যে আমাকে গিলছে তা অনুভব করতে অসুবিধা হয় না মোটেই। গিলুক। দেখে যদি তৃপ্তি পায় ক্ষতি কি। আমি জানি আমার মন।

মাথাটাকে একবার একটু ভেতরে টেনে নেবার ভান করি। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ভুলে নজরৎ খাঁ তার দেহটিকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়ে দু'হাত তুলে প্রার্থনার ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। নিশ্চিন্তে হেসে ফেলি। জানি, সে হাসি ওর চোখে পড়বে না। আরও কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। শেষে হঠাৎ ঘৃণা জন্মায় নিজের ওপর। ছি ছি। এই সস্তা আনন্দে শেষে আমিও মেতে উঠলাম? ভুলে গেলাম নিজের শিক্ষা, নিজের রুচির পরিচয়? শিল্পীর কথা এত তাড়াতাড়ি মন থেকে মুছে গেল। তবে কি অবচেতন মনে আমি দু'জন পুরুষের সঙ্গ-লিপ্সু? একজন আমার মনের জন্যে, অপরজন দেহের? না না।

শামুকের মতো মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নিই কক্ষের ভেতরে। নাজীর দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। তাকে বলি মমতাজ বেগমের কাছাকাছি কোন ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে।

কুর্নিশ করে সে চলে যায়।

মায়ের সান্নিধ্যের বড় প্রয়োজন। বহুদিন মা-ছাড়া। ভেতরের আর বাইরের যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বের তিনিই ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক। তাঁর ঘরের কাছে থাকলে তাঁর উত্তাপ হয়তো অনুভব করব। মনের ক্লেদ তাতে দূর হবে।

ঠিক পরদিনই দরবার শেষ হবার মুখে দারা দ্রুত ঝরোকার পেছনে এসে দাঁড়ায়।
—কি হল দারা?
—একটি প্রস্তাব রয়েছে। রাখবে?
—শুনি আগে।
—শুনলে সম্ভবত আনন্দই হবে তোমার। চাঘতাই বংশের একটা নতুন দিক খুলে যাবে।
—ভণিতা রাখো।
—নজরৎ খাঁ কেমন লোক?
চমকে উঠি। কোনরকমে সংযত হয়ে বলি,—ভালই তো।
—বক্ষের বেগম হবে?
—মানে?
—মানে, নজরৎকে সাদি করবে।
ম্লানমুখে হাসি ফুটিয়ে বলি,—শাহানশাহ্ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপযুক্ত কথাই বটে।
—ঠাট্টা করছি না জাহানারা।
—নিজের কাজে যাও দারা। আর যদি কাজ না থাকে, নাদিরাকে একলা রেখো না।
মুহূর্তের অস্বস্তি কাটিয়ে দারা বলে,—তোমাকে আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি কথাটা বাজে নয়। বাদশাহের কানে পৌঁছেছে।
—কে দিয়েছে কানে?
—আমি।
—তিনি রাজী হয়েছেন?
—নিমরাজী। জোর করলে বাধা দেবেন না।
—তবে তুমি একজনের মস্ত উপকার করতে পার। তার জীবনকে বিকৃতির পথ থেকে মুক্তি দিতে পার। তার ভেতরের সুকোমল বৃত্তিগুলো আবার জাগিয়ে তুলতে পার দারা।

-কে সে ?

-রোশনারা। তার ব্যবস্থা কর দারা। আমি তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ
কব।

-বাদশাহ্ রাজী হবেন না। তবে তুমি যদি এ ব্যাপারে রাজী হও, পরে তাঁকে
[রো]শনারার বেলাতেও মত দিতে হবে।

-তার মানে তিনি নিজে উদ্যোগী নন।

-না।

-নজরৎ থাঁকে আমার পছন্দ নয়।

[বি]স্মিত দারা বহুক্ষণ কথা বলতে পারে না। নজরৎ হয়তো কালকের অঙ্গুরীবাগের
[ঘট]নাকে আশাপ্রদ মনে করে দারাকে বুঝিয়েছে সেই অনুযায়ী। তাই আমার কথায়
অবাক্ হয়। শেষে বলে,—বঙ্কের শক্তি আমাদের কতখানি সহায়ক তুমি জান।

-জানি। তাই বলে, সে শক্তির কাছে নিজের মনকে কোরবানি দিতে পার না।

-সে কি জাহানারা। জিনিসটাকে এভাবে নিচ্ছ কেন ?

-অন্যভাবে নেবার উপায় নেই। রোশনারার ব্যবস্থা কর দারা। যদি পার, তাহলে
[ব]ঙ্কের চেয়েও বড় শক্তি তোমার করায়ত্ত হবে।

[মু]খানা বিকৃত করে দারা।

-তবে যাও।

-নজরৎ কিন্তু অন্যরকম বলেছিল।

-সে ভুল বলেছে। মুঘল শাহ্জাদীরা খেয়ালের বশে কিছু করে না। তারা
[ভে]বে দেখে।

-কিন্তু কি বলব তাকে ?

[ব]লবে, এখনো কিছু বলার সময় আসে নি। আর একটা কথা, শাহ্জাদা হয়ে
[আ]মীর-ওমরাহের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হতে যেও না। পরিণামে ভুগবে।

[মু]খানা ভার করে চলে যায় দারা। আশাহত হল সে। এক অদ্ভুত চরিত্রের
[মা]নুষ এই ভাইটি। চরিত্রের জটিলতার জন্যে হয়তো কোনদিনই সে শান্তি খুঁজে
[পা]বে না। সে জ্ঞানী গুণী, গুণী আবার সেই সঙ্গে সে লোভীও। মুখে সে দার্শনিক-
[সু]লভ নির্লিপ্ততা মাখিয়ে রাখলে কি হবে, যত দিন যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি আমার
[অ]ন্যান্য ভাইদের মতো তারও সিংহাসনের প্রতি লোভ কম নেই। বরং বেশীই।
[তা]ই বাদশাহ্ কালেভদ্রে তাকে বাইরে পাঠাতে চাইলেও সে যেতে চায় না। সব
[স]ময়েই তাঁর পাশে পাশে থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। বাদশাহের ক্ষমতার কিছু
[কি]ছু নিজে ব্যবহার করে তৃপ্তিলাভ করে। আভাসে ইঙ্গিতে তাকে জানাতে চেষ্টা

করেছি কত, দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের এই সুযোগ সে হেলায় হারাচ্ছে। বি
জানতে চায় নি সে। তার ধারণা মসনদের আশেপাশে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলে
ওর ওপর অধিকার পাওয়া সহজ। বুঝতে পারে না রাজনীতি অত সরল জিনি
নয়। নিজের মেজাজের বশে চলে রাজনীতি করা যায় না। রাজধানীর আমী
ওমরাহদের খোসামোদ করে নিজের দলে রাখার চেষ্টা রাজনীতির এক চালেই ভণ্
হয়ে যেতে পারে। জাহানারাকে বন্ধের আমীরের হাতে সঁপে দিলেও সব দিক রক্
করা যায় না। দাক্ষিণাত্য থেকে যে খবর ভেসে আসে, তাতে আওরঙজেব সম্ব
সবারই উঁচু ধারণা জন্মেছে। বাদশাহ্ চিন্তিত হয়েছেন—সেই সঙ্গে আমিও
আওরঙজেবের চতুরতায় যত বেশী শান্ পড়বে ততই বিপদ। দাক্ষিণাতে
শাসনকর্তা সে—অথচ নাকি ফকির সেজে বসে আছে। নিজের হাতে টুপি তৈ
করে বিক্রি করে। আর সেই পয়সায় সংসার চালায়। মুসলমান ধর্মের এত
আদর্শ সবার সামনে ধরে রেখে মন জয় করা কত সহজ। শুধু মাত্র জাহানারাকে
সমর্পণ করে এত ব্যাপকভাবে মন জয় করা সম্ভব নয়। দারা বিজ্ঞ কিন্তু সে চতুর নয়
আমার দুঃখ এইখানেই।

দশ-পঁচিশীর সেরা নর্তকী গোয়ালিয়রের গুলরুখবাঈ-এর নৃত্যের আয়োজন ক
প্রাসাদের ভেতরের বিরাট চত্বরে। স্থানটি দরবারের কাছাকাছি। গুলরুখের নূপুরে
শব্দ নিঃসন্দেহে দেওয়ান-ই-খাসে বাদশাহের কর্ণে প্রবেশ করবে। পাগল-ক
নৃত্যের তাল একসময়ে বাদশাহ্‌কে অন্যমনস্ক করে তুলবে। কিন্তু দরবার ছে
হয়তো তিনি আসবেন না। দরবারের সম্মান তিনি সব সময় বজায় রাখেন।
লক্ষ চিরাগদানির বাতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চত্বর এবং চত্বরের আশপাশ। হারেমে
সবাই আমার এই আয়োজনে নিমন্ত্রিত। একে একে তারা এসে আসন গ্রহণ করে
গুলরুখবাঈ অনতিদূরে একটি কক্ষে নিজেকে শেষবারের মতো সাজিয়ে নিচ্ছে। ত
একটা নিয়ম নৃত্য শেষ করে সে দাঁড়ায় না। হাওয়ায় উড়তে উড়তে দরবা
কক্ষের পাশের অলিন্দ দিয়ে ভেসে যায় তার নিজের আবাসে। অনেকদিন তা
বলেছি, নৃত্যের শেষে একটু অপেক্ষা করে বেগম শাহ্‌জাদীদের ধন্যবাদ গ্রহণ করতে
ওভাবে যাওয়া দৃষ্টিকটু। সে হাসে আমার কথা শুনে। তার হাসি এত সং
আর এত দৃঢ় যে আমি বুঝতে পারি নাচ শেষ করার পর বাদশাহ্ স্বয়ং তা
অপেক্ষা করতে বললেও সে অপেক্ষা করবে না। চলে যাওয়াটাও যেন তার নৃত্যে
একটি অঙ্গ। ওটুকু না হলে নৃত্য তার সম্পূর্ণ হয় না। সত্যিই যে অঙ্গ, সে ক

স্বীকার করেও লাভ নেই। তার এই অপসৃয়মান দেহখানা দেখবার জন্য ইতিমধ্যেই হারেমে একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

ওস্তাদদের বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে। এক স্বর্গীয় পরিবেশ। ভুলে যেতে হয় পৃথিবীর সবকিছু ক্লেদ-গ্লানি। ভুলে যেতে হয় রাজনীতির নোংরামি। মন চলে যায় ঊর্ধ্বে—বহু ঊর্ধ্বে।

পাশেই রোশনারা বসে রয়েছে। গুলরুখকে সে অপছন্দ করে। অপছন্দ করে তার রূপের জন্যে। তবু তার আসরে হাজির হয় সে। নাচ ভালবাসে রোশনারা। আওরঙজেবের সব নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেও নৃত্যের বেলায় আদর্শ-ভ্রষ্ট। আওরঙজেব নাকি দাক্ষিণাত্য থেকে লিখেছে, তার নিজের হারেমে নাচ-গানের চল্ বন্ধ করে দিয়েছে সে। ওসব ধর্মবিরুদ্ধ। দিন দিনই আমার ভাইটির মন শুকিয়ে যাচ্ছে। শেষ পরিণতি কি হবে জানি না।

গুলরুখ আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। হাতজোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গীতে সে আকাশের দিকে প্রণাম জানায়। হিন্দুদের রীতি। তারপর অভিবাদন করে আমাকে আর আশেপাশের সবাইকে। যারা তার নাচের ভক্ত, তাদের সবারই ভক্ত সে। শিল্পীর সঙ্গে শিল্প-রসিকের মনের যে সম্বন্ধ তাতে উভয় পক্ষই উভয়ের ভক্ত।

নাচ শুরু হয় মৃদুমন্থর গতিতে। স্তব্ধ আসর। শুধু গুলরুখের নূপুরের শব্দ। তার পা যেন মাটি স্পর্শ করে না। কী করে এমন সম্ভব বুঝে উঠতে পারি না। শুধু তার দেহখানা নানান্ ভঙ্গিমায় তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। হাওয়ায় যেমন নদীর জলে শিহরণ তুলে ঢেউ-এর সৃষ্টি করে, সুর তেমনি তার দেহে ঢেউ তোলে। কতবার দেখেছি, আশা মেটে না। প্রতিবারই নতুন করে চমক জাগে—প্রাণে এক অনাস্বাদিত সুরের হিল্লোল বয়।

গুলরুখকে আমি ভালবাসি। নারী হয়ে নারীকে যতটা ভালবাসা সম্ভব ততখানি। একবিন্দু কম নয়। অনেক দিন আমার নিজের কক্ষের দরজা বন্ধ করে ওর নাচ দেখেছি। সেখানে আমিই একমাত্র রসিক। সেই একক আসরে গুলরুখ যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। খেয়াল থাকে না তার কতক্ষণ সে নেচে চলেছে। আমারও খেয়াল থাকে না। কোন কোনদিন এমন হয়েছে, ক্লান্ত হয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। মৃত্যু [illegible] ভেবে ছুটে গিয়ে তার দেহখানা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছি। একটু পরেই [illegible] দেখেছি প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, সরে গিয়েছি তার কাছ থেকে। আ[illegible]জাদী। সে সামান্যা নর্তকী।

গুলরুখ [illegible]ছে। রোশনারা উত্তেজিত। এ উত্তেজনা কিসের বুঝতে পারি না। [illegible]য়, অক্ষমের উত্তেজনা। সে চায় গুলরুখের মতো নেচে নেচে

ক্লান্ত হয়ে পড়তে। সে চায় মোগলাইখানা প্রতিদিন তার শরীরে যে শক্তির সঞ্চ
করছে সে শক্তিকে সন্ধ্যার শীতলতায় নিঃশেষ করে দিতে। কিন্তু পারছে না।
গুলরুখের পায়ের ছন্দ, তার লীলায়িত দেহবল্লরীর গুণাবলীর অভাব রয়েছে
রোশনারায়। তাই সে উত্তেজিত।

তার এই অবস্থা একবার দারাশুকোকে দেখাতে পারলে হত। কিন্তু দারা নেই
যদিও পাশের দরবারে সে উপস্থিত, একবারও তাকে এই আসরে উঁকি দিতে দেখি
নি। দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের ব্যাপারে কিছুদিন থেকেই দরবারের প্রতি
লোক বড় ব্যস্ত। সেখানকার হর্ম্যরাজি অতি দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। দারা
নূপুরের শব্দ শুনেও তাই পালিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে না। নাদিরার দিকে
ফিরে চাই। একটু দূরেই সে বসে ছিল। তার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই হেসে
ফেলে। সে হাসির অর্থ পরিষ্কার। সেও দারার কথাই ভাবছিল।

নাচ-শেষে গুলরুখের চলে যাবার পথের সরু দীর্ঘ অলিন্দে শত শত প্রদীপের সারি
দুই পাশের সেই প্রদীপগুলির শিখা মৃদু হাওয়ায় দুলছে। নৃত্যের তালে তালে তা
দিচ্ছে যেন। প্রদীপের আলোয় গুলরুখকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে।

নাচের তাল দ্রুততর হয়। শেষ হয়ে আসছে। আমাদের সবার মন একাগ্র
রোশনারাও এ-সময়ে নিজের ব্যর্থতার কথা ভাবতে পারছে না। নাদিরা দারা
কথা ভুলে গিয়েছে। বাদশাহের অবহেলিতা বেগমদের জ্বালাধরা হৃদয়ে সাময়ি
শান্তি বিরাজ করছে। গুলরুখ বিদায় নেবে। যে কোন মুহূর্তে সে ওই অলি
পথ দিয়ে ছুটে যাবে।

সহসা ওস্তাদের বাদ্যযন্ত্র 'ঝম্' করে একটা আওয়াজ তুলে মুহূর্তের জন্যে থে
যায়। এই আওয়াজটি গুলরুখ-নৃত্যের বিশেষত্ব। তারই নির্দেশে বাদ্যের এই ছেদ
এই ছেদ মুহূর্তের জন্যে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুলরুখ। শুধু তার সর্বাঙ্গে এ
অপরূপ হিল্লোল। ঠিক তারপরই গুলরুখ ছোটে অন্দরের দিকে। 'বাহবা' ওঠে আ
থেকে। আমার মন তৃপ্ত। গুলরুখের সম্মানে আমার সম্মান। তার জয়ে আমার জ
কিন্তু একী!

আর্তনাদ করে ওঠে গুলরুখ! চিরাগদানির কম্পিত শিখা তার ওড়নার প্রান্ত স্প
করেছে। আগুন লেগেছে ওড়নায়। চুলের সঙ্গে আটকানো রয়েছে ওড়না
খুলতে পারছে না গুলরুখ। দিশেহারা সে। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

আসরে সবাই বোবা। তারাও গুলরুখের মতো দিশেহারা।

আমি ছুটে যাই পাগলের মতো। তাকে জড়িয়ে ধরতে যেতেই সে অসীম যন্ত্রণ
মধ্যেও দু'হাত সরে যায়,—না না শাহজাদী। আসবেন না।

—পাগলামী করো না গুলরুখ।

আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। ওর সর্বাঙ্গে লেলিহান শিখা।

—শাহ্‌জাদী মরতে দিন! বেঁচে আর লাভ নেই।

তার বাধা মানি না। সে বুঝতে পেরেছে অগ্নিদগ্ধ কুৎসিত রূপ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গুলরুখবাঈ-এর মৃত্যু ভাল। কিন্তু আমি তো তা ভাবতে পারি না। আমি দেখছি আমার প্রিয় নর্তকীর যন্ত্রণা। মৃত্যু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। জড়িয়ে ধরি তাকে। আমার শরীরের শীতলতা যদি তার দেহের অগ্নিশিখাকে শান্ত করতে পারে।

কিন্তু পারল না। লোভীর মতো লক্‌লকে জিভ বার করে নতুন জিনিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুন। চিৎকার করে ওঠে রোশনারা। কেঁদে ওঠে নাদিরা।

দেওয়ান-ই-খাসের টনক নড়ে এতক্ষণে। শুনতে পাই অনেক পুরুষের ব্যস্ত পদশব্দ। নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও লজ্জা পাই। দারা ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। পেছনে নজরৎ। সে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠি,—খবর্দার! মুঘল-শাহ্‌জাদীর গায়ে যেন হাঁতের স্পর্শ না লাগে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নজরৎ।

আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পাশেই মাটিতে অর্ধদগ্ধ গুলরুখ। ছট্‌ফট্‌ করছে। আমার গুলরুখ। তাকে আর চেনা যায় না। আমারও ওই অবস্থা হবে।

—জাহানারা। দারা চিৎকার করে ওঠে।

সহসা দেখি দেওয়ান-ই-খাসের ভারী পর্দা ছিঁড়ে নিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। আমি বাধা দিয়ে উঠি,—স্পর্শ করবেন না।

—শাস্তি দেবার যথেষ্ট অবসর পাবেন শাহ্‌জাদী। এখন ভাল মেয়ের মতো চুপ করে থাকুন।

সে পর্দা দিয়ে আমাকে বলিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরে।

মুহূর্তের জন্যে চেয়ে দেখি ওকে। এমন সুপুরুষ—অথচ আগে দেখি নি। চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ে এর মধ্যেও। সেই চোখ—তাজমহলের শিল্পীর মতো।

আমার আঁখি নিমীলিত হয় আপনা থেকে। নিজের যন্ত্রণাকাতর দেহকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করি। আর কিছু মনে নেই।

আমি স্বার্থপর। নইলে এই দুই মাসের মধ্যে গুলরুখের কথা একবারও মনে হয় নি

কেন ? শয্যাশায়ী হয়ে আকাশপাতাল অনেক চিন্তাই করি। অথচ গুলরুখের চিন্তা মাথা থেকে সেই দুর্ঘটনার পরই বিদায় নিয়েছে।

পাশে বাদশাহ্ বসেছিলেন। আমার কপালে তাঁর হাতখানা। দেখলে মনে হয় এর মধ্যে তাঁর বয়স আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমি অসুস্থ হবার পর তাঁকে দেখবার কেউ নেই। রোশনারা যদি একটু দায়িত্বসম্পন্ন হত, অনেক দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা পেতাম আমি।

বাদশাহ্।

আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি বলেন,—বাদশাহ্ কিরে ? বাবা বল্।

—বাবা। চোখ ছাপিয়ে জল বার হয় আমার।

বাদশাহ্ও অন্যদিকে মুখ ফেরান।

—গুলরুখ কেমন আছে বাবা ?

—সে নেই। ভালই হয়েছে জাহানারা। বেঁচে থাকলে সে আত্মহত্যা করত।

—তবে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন কেন ? নানান্ দেশে থেকে এত হাকিম আনার প্রয়োজন কি ? নর্তকী না হলেও মেয়ে তো আমি।

—জানি। তোকে বাঁচতে হবে আমার জন্য। তুই-ই যে আমার প্রাণ, জাহানারা।

এক নিদারুণ অসহায়তা ফুটে ওঠে বাদশাহ্ শাহজাহানের চোখে-মুখে। মায়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় শাহজাহানও স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের জন্য আমাকে কুরূপ নিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

—আমি বাঁচব না বাবা।

—কেন ?

—আমি শাহ্জাদী। রূপ না থাকলে আবার শাহ্জাদী ?

—কে বলে তোর রূপ নেই জাহানারা ?

ম্লান হেসে বলি,—সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

—না। তোর মুখে তো কিছুই হয় নি। তোর বুক আর উরু জখম হয়েছে।

—দেখা যায় না ?

—না। এতদিন তুই সত্যিই জানতিস না ?

মন আমার অনেক হাল্কা হয়ে যায়। বলি,—জানতাম না বাবা। আরশি চাইতে ভরসা হত না। যদি চোখের সামনে কদাকার একটি মুখ ভেসে ওঠে !

—তুই পাগল। বাদশাহ্ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান। অনুমানে বুঝতে পারি দরবারে যাবার সময় হয়েছে তাঁর।

আমার বুকের পাষাণ-ভার নেমে যায়। মনে মনে আল্লাকে ধন্যবাদ দিই। খুদার

কাছে প্রার্থনা করি। যত বড় শাহানশাহ্ই হোন না কেন, সবার উপরে তিনি। তিনি না থাকলে দেশ-বিদেশের হাকিমেরা কিছুই করতে পারতেন না। তিনি না থাকলে দেহের সব অংশ বাদ দিয়ে শুধু মুখখানাই দগ্ধ হত। আমার এই মুখের দ্বারা তাঁর সব উদ্দেশ্য এখনো সিদ্ধ হয় না। আমার এই দেহ দ্বারাও নয়। নইলে সাত সাগর তের নদী পার হয়ে এদেশে এসে ঠিক এই সময়েই সাহেব-হাকিম হাজির হত না। কি যেন হাকিমের নাম? গাব্রাল ব্রিংটন, না কি যেন। যেমন অদ্ভুত নাম, তেমনি অদ্ভুত চিকিৎসা। এদেশের সবাই হার মানলো, তারপর তো সে এল। সত্যিকারের ব্যথা সেই-ই কমিয়েছে। যদিও আরও দু'মাস লাগবে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠতে। সে নাকি পোড়া দাগও মিলিয়ে দেবে অনেক।

বাদশাহ্ বিদায় নেবার কিছু পরেই দরওয়াজার পর্দা আবার তুলে ওঠে। নিশ্চয়ই নাদিরা কিংবা দারা।

না। আওরঙজেব! ও এল কোথা থেকে? সে-ই কবে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিল, তারপর এই প্রথম।

—আওবঙজেব?

—জাহানারা। লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় সে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল আমার পাশে বসে আমার হাতে হাত রাখে। কিন্তু ওর সংযত স্বভাব বসতে দেয় না ওকে।

—আওরঙজেব?

হাসে আওরঙজেব। বলে,—বিশ্বাস হচ্ছে না?

—কতদিন পরে এলে?

—অনেক দিন। এখনো তো আসতাম না। কিন্তু দুর্ঘটনার খবর যে মুহূর্তে শুনলাম, সব ছেড়ে তখনি রওনা দিলাম। তবু আসতে কত দেরি হয়ে গেল।

—সত্যি?

—হ্যাঁ জাহানারা। আমার সম্বন্ধে তোমাদের মনোভাব কি আমি জানি। সে মনোভাব ভুল নয়। তবু, আমার ভেতরের স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা সবই আছে। কঠিন আবরণে ঢাকা পড়ে থাকে। সে আবরণ ধর্মের। মসনদের ওপর আমার কতখানি লোভ আছে তা জানি না। তবে তুমি যদি ধর্মের বিরোধিতা কর আর যদি আমার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে, তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে একফোঁটা চোখের জলও না ফেলে মনের ভেতরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলব।

—কী সাংঘাতিক!

—তোমরা একে সাংঘাতিক বল। কিন্তু নিজেকে আমি এই ভাবেই গড়ে তুলেছি।

আমি প্রতিবাদ করি না। এতদিন পরে এসেছে, তাই চুপ করে থাকি। প্রতিবাদ করার শক্তিও আমার নেই, একটানা কথা বলে বলে ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে।

এক্ষণে আওরঙজেব পাশে বসে। গায়ে হাত বুলিয়ে শেষে আলখাল্লার ভেতর থেকে মালা বার করে জপ করতে শুরু করে। আল্লার কাছে প্রার্থনা করছে ও আমার জন্যে। ওর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বড় ভাল লাগে। এক বিরাট ব্যক্তিত্ব।

অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে আওরঙজেব. মালাটি আলখাল্লার ভেতরে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—যাই জাহানারা। বাদশাহের সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি। ভেবেছিলাম তোমাকে আরও খারাপ অবস্থায় দেখব। তাই আগে এখানে এসেছি।

—আল্লার কৃপা।

—নিশ্চয়। সেই কথাই সব সময় মনে রেখো। আর সব ঝুট্।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বার হয়ে যায়।

নাজীর কাছে আসে নিঃশব্দে। তাকে বলি,—আজ অনেক খানার আয়োজন করতে বল। আমার খিদে পেয়েছে খুব।

নাজীরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিজে থেকে আমাকে ও খাবার কথা বলতে শোনে নি কখনো।

—সব বানাতে বল—বুজুগ, তন্দুরি বাব্বোরা, হালিম-গোস্ত সমকোক্ষ।

—আর কিছু? নাজীর ঢোক গেলে।

—দো-পালা, মুতাঞ্জন, মোরগ মুসল্লাম।

নাজীরের চোখ বড় বড় হয়। অসুস্থ ব্যক্তি এত খেতে পারে না। তার ভাগ্যেই সব জুটবে।

মনে মনে হাসি। আওরঙজেব এল এতদিন পরে সব রকম খানারই আয়োজন থাকা উচিত। তার মন যা চাইবে তাই খাবে। বাদশাহ্ আর দারার পাশে বসে খাবে সে আজ। অস্বস্তি হবে সবার—তবে খুশীও হবে। সরাবের আয়োজন করব কিনা বুঝতে পারি না। খাঁটি মুসলমান আওরঙজেব। সরাবের আয়োজন করলে যদি খানা ফেলে উঠে পড়ে?

শেষে খাদ্য-তালিকায় সরাবকেও রাখলাম। খাঁটি মুসলমান ও আজ নতুন হয় নি অথচ কোনদিনই সুরাপাত্রের মোহ ও ছাড়তে পারে নি। দাক্ষিণাত্যে যদি ছেড়েও থাকে সেখান থেকে শত শত যোজন দূরে এই আগ্রার প্রাসাদে খানার পাশে সুরাপাত্র দেখলে হাত তার আপনা হতেই এগিয়ে যাবে। মুসলমান হলেও আওরঙজেব

...। ওর শিরা-উপশিরায় ভারতে মুঘল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের রক্ত প্রবাহিত।
...রর মুখের প্রসিদ্ধ উক্তি :

নওরোজ উয়-নওবহার-উয়
মি-উয় দিলরে-খাশত্।
বাবর বেশ কুশকে আলম
দো-বারা নিস্ত।

রিকাবখানা, আবদারখানা আর মেওয়াখানার কর্মচারীদের কাছে আমার নির্দেশ পৌঁছে দেবার জন্যে নাজীরকে পাঠাই। সেই সঙ্গে বলে দিই, ঠিক সময়ের কিছু আগেই যেন 'খুরিশ গরাণ' খাদ্যের স্বাদগ্রহণের জন্য উপস্থিত থাকে।
পাশ ফিরে শুই। অসুস্থ হলেও দায়িত্বের বোঝা মাথা থেকে নামে না।
তাজমহলের শুধু আভাস পাওয়া যায় শুয়ে শুয়ে। নিশ্চিন্তে মা নিদ্রা যান সেখানে। কোন অশান্তি নেই তাঁর মনে। নিত্য দু'বেলা কোর-আন শরিফ আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন মৌলবী।
কেন যে সবটুকু ভার আমার ওপর ছেড়ে গেলেন তিনি। বইতে পারব তো ?

সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠি একদিন। আওরঙজেব চলে গিয়েছে। সব কিছু একঘেয়ে। কিছুই যেন ভাল লাগে না। এতদিন পালঙ্কে শুয়ে থাকার পর সুস্থ হবার যে আনন্দ, সে আনন্দ মোটেই উপভোগ করতে পারি না। নাদিরা এজন্যে আমার মনকে দায়ী করে। বলে, দু-চারদিন বাইরে ঘোরাফেরা করলে নাকি ঠিক হয়ে যাবে। দেখা যাক।
এদিকে বাদশাহ্ বড় ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আগ্রার জলবায়ু মোটেই আর সহ্য হচ্ছে না তাঁর। বাবর-বংশের কোন পুরুষের স্বাস্থ্য যে এত স্পর্শকাতর হতে পারে ভাবি নি। চূড়ান্ত বিলাসিতাই হয়তো তাঁর দেহকে এই পর্যায়ে এনে ফেলেছে। দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের জন্যে বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর ধারণা, দিল্লীতে ফিরে গেলে তিনি আবার স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন, আবার কর্মঠ হয়ে উঠবেন।
কক্ষের মধ্যে আপন মনে পায়চারি করি। নাজীরকে বাইরে পাঠিয়েছি। এ সময়ে একা একা থাকতে ভালই লাগছে। একা আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও সুখ। এতদিন শয্যাশায়ী থেকেও যেন তৃষ্ণা মেটে নি।
হঠাৎ একসময়ে নিজের দেহের দগ্ধ অংশ ভালভাবে দেখবার ইচ্ছে হয়। কেউ

কোথাও নেই। ধীরে ধীরে গিয়ে দরওয়াজা অর্গলবন্ধ করি। একটির পর একে ... রেশমের পোষাক পালঙ্কের ওপর রাখি। শেষে আর কোন পোষাকই থাকে না। দেয়ালে প্রকাণ্ড আরশি। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সুযোগ পেলে ... নিজের দেহকে সব মেয়েই যাচাই করে দেখতে চায়। যারা বলে যাচাই করে না, তারা মিথ্যা বলে। কিন্তু আমি নিজের দেহের সৌন্দর্য দেখতে চাই না। সে বাসনা ... মরলে যাবে না তাও জানি। তবু আজ আমি শুধু দেখতে চাই কতখানি অসুন্দর আমাকে করেছে সেই ভয়ংকর আগুনের শিখা যার গ্রাসে পড়ে গোয়ালিয়রের গুলরুখবাঈ-এর নূপুর-পরা পায়ের ছন্দ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে।

দেখতে পাই নিজের বুক। বাম স্তনের নীচে খানিকটা জায়গা সাদা হয়ে রয়েছে। কোমরের ওপরে আর কোথাও বিশেষ ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ে না। শুধু গায়ের রঙ যেন একটু মলিন। হয়তো শুয়ে থেকে থেকে এমন হয়েছে।

এবারে দেহের নীচের অংশের দিকে চোখ নামাই। কোমর থেকে পায়ের আঙুল অবধি। উরুর ক্ষত আরও বিস্তৃত। অনেকখানি জায়গা বিশ্রী হয়ে রয়েছে। থাকুক। জাহানারা বেগমের দেহের এই দুই বিকৃতি যদি আমরণ এইভাবেই থাকে তবু ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে দ্বিতীয় ব্যক্তির দেখার সুযোগ ঘটবে না। চাঘতাই-বংশের কুমারী জাহানারা বেগম—জীবন তার আকবর শাহের নিষ্ঠুর বিধানে গণ্ডীবদ্ধ।

হিন্দুরা আগুনকে বলে অগ্নিদেব। দেবতা যখন, তখন নিশ্চয়ই পুরুষ। আমার সঙ্গে রসিকতা করেছেন অগ্নিদেবতা। আমার কুমারীত্বের দিকে বহুদূর হাত বাড়িয়েছিলেন। কিছুটা হরণও করেছেন বলতে হবে। পৃথিবীতে পুরুষ মিলল না দেখে কৃপা করেছেন তিনি। আজ কোয়েল থাকলে আলোচনা করতে পারতাম। আমার বক্তব্য শুনে সে রাগত কিনা কে জানে। সে যে হিন্দু।

কোয়েল থাকলে আর একটি খবরও এতদিনে মিলত, যে খবরের জন্যে রোগশয্যার ওপর ছটফট করেছি, অথচ মুখ ফুটে কাউকে প্রশ্ন করতে পারি নি কখনো। আমার এই ধরনের সংকোচ জীবনে খুব অল্পই অনুভব করেছি।

এ পর্যন্ত কখনো কাউকে প্রশ্ন করতে পারি নি,—আমার রক্ষাকর্তা কে? সেই সুপুরুষ বলিষ্ঠ আগন্তুকের চাহনি একটি বারের জন্যও ভুলতে পারি নি। মনের মণিকোঠায় কৃপণের ধনের মতো আগলে রেখেছি। প্রশ্ন করতে ভয়ও হয়েছে। এক অজানা আশাভঙ্গের ভয়। কিন্তু আজ যখন দু'পায়ের ওপর দাঁড়াতে পেরেছি, আরশির সামনে নিজের নিরাবরণ দেহখানাকে মেলে ধরেছি, তখন আর নিজের এতদিনের সংযমকে ধরে রাখতে পারি না। জানতে হবে—এই মুহূর্তেই জানতে হবে।

পোষাকগুলি একটির পর একটি পরে ফেলি। একটু ক্লান্ত বোধ হয়। তবু দেয়াল ধরে দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হই। খুলে দিই দরওয়াজা। কিন্তু আর পারি না। চোখের সামনে কেমন যেন অন্ধকার হয়ে যায়। কোনরকমে শয্যায় এসে শুয়ে পড়ি।

বেহুঁশের মতো পড়ে থাকি—কতক্ষণ জানি না। শেষে একসময়ে কপালে নরম হাতের স্পর্শ পাই। চোখ মেলে দেখি নাদিরা। আমার মুখের সামনে ঝুঁকে উৎকন্ঠিত হয়ে চেয়ে রয়েছে।

—শরীর খারাপ হয়েছে?

—না নাদিরা। একটু দুর্বল বোধ করছি।

—এখন তবে যাই। পরে আসব।

—না বসো। ওর হাত ধরে বসাই।

চুপ করে বসে থাকে নাদিরা। কি ভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না বোধ হয়। এতদিন কেটে গেল তবু ওর সংকোচ গেল না। দারার নিশ্চয়ই ভালই লাগে এই ভীরু নম্র স্বভাব।

—দারার তসবির আঁকা কেমন চলছে নাদিরা।

—অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে।

—সে কি? ছাড়ল কেন?

—বলতে পারি না।

—অমন খেয়ালে চললে কোনটাই হবে না।

—এখন আবার সংগীত শিক্ষার ঝোঁক চেপেছে।

—সে আবার কি!

—বুন্দেলা রাজা ছত্রশালের গান শুনে মুগ্ধ হন। তারপরই গানের দিকে ঝোঁক।

—বুন্দেলা রাজা? তিনি তো দরবারে আসেন নি কখনো।

—এসেছিলেন। আপনি তখন অসুস্থ।

—তাই হবে।

হঠাৎ নাদিরার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সজোরে আমার হাত চেপে ধরে বলে ওঠে,—কিন্তু আপনি তো দেখেছেন তাঁকে।

—আমি?

—হ্যাঁ আপনি। নিশ্চয়ই দেখেছেন। তবে তা মনে থাকবার কথা নয়। অমন সময় কারও কিছু মনে থাকে না।

—কবে দেখলাম।

—সেই দুর্ঘটনার দিনে।

—কত লোক সেদিন দরবার ছেড়ে মজা দেখতে এসেছিস।

—কিন্তু তিনি যে আপনার আগুন নিভিয়েছিলেন। আপনার কথা শুনে কেউ সাহস পায় নি এগোতে। তিনি সেকথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপনাকে জড়িয়ে ধরলেন। তবেই তো বাঁচলেন আপনি। সামান্য আহতও হয়েছিলেন তিনি।

আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকে। চোখের সামনে আবার অন্ধকার হয়ে আসে যেন। কোনরকমে নাদিরাকে চলে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করি। মাথার দিকে দু'হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুই। ছত্রশাল—ছত্রশাল—ছত্রশাল। প্রশ্ন না করতেই উত্তর পেয়ে গেলাম। ছত্রশাল। গায়ক সে। আমি জানতাম এমন একটা কিছু হতেই হবে। দারা মুগ্ধ হয়েছে ওর গানে।

আবার কি আসবে সে? আসবে। আমাকে দেখেছে— আমার দেহ স্পর্শ করেছে। সে আসবে। আমার মন ডেকে বলেছে, সে আসবেই।

সে এল। আরও অনেক পরে।

জাহানারার শত স্বপ্ন মিথ্যে হতে পারে। কিন্তু তার মন ডেকে যা বলে তা কখনো মিথ্যে হয় না। তাই নিজের মনকে যেমন ভালবাসি, তেমনি ভয়ও করি।

ঝরোকার পাশে সেদিনও দাঁড়িয়েছিলাম। দৃষ্টি ঘুরে মরছিল দরবারের প্রতিটি মানুষের মুখে। মন ভরে উঠেছিল হতাশায়। সহসা দেখলাম প্রবেশ পথ দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এক পুরুষ। চমকে উঠলাম। ও চাহনি ভোলবার নয়। আমার গাল দুটি লাল হয়ে ওঠে কি? জানি না। সাক্ষী নেই কেউ। কোয়েল চলে যাবার পর থেকে একাই এসে দাঁড়াই এখানে। কিন্তু বুক যে বড় বেশী ওঠা-নামা করছে। মনে হয়, যতটা প্রশ্বাস সাধারণত আমি নিই তার চেয়েও বেশী বাতাস চাইছে আমার বুক। হাঁপিয়ে উঠি।

বাদশাহের একেবারে সামনে এসে অভিবাদন করে সে। বাদশাহ্ উঠে দাঁড়ান। বহু সম্মানের অতিথি কিংবা আমীর-ওমরাহ্ ছাড়া বাদশাহ্ নিজে কখনো উঠে দাঁড়ান না। নিজের পিতার প্রতি মন আমার প্রসন্নভায় ভরে যায়।

—ছত্রশাল, আপনার কাছে আমি ঋণী—সে কথা আবার স্বীকার করছি।

ছত্রশালের জবাব আমি শুনতে পাই না। চাইনি শুনতে। কারণ, যেটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিল তাও ভেঙে দিয়েছেন বাদশাহ্। নানান চিন্তার জাল আমার মস্তিষ্কে।

তবু তার মধ্যেও এটুকু আমি ভাবতে পেরেছি যে ছত্রশাল নয়, রাজা—আমি ওকে ছোট্ট করে 'রাজা' বলেই ডাকব।

ছত্রশাল সামনের একটি আসন গ্রহণ করেন। তাঁর পাশে নজরৎ খাঁ উপবিষ্ট। তুলনা হয় না। দেহে নজরৎ কম সুন্দর নয়। কিন্তু দেহের মধ্যেও সব মিলিয়ে দেহাতীত এক সৌন্দর্য রয়েছে রাজার যার তুলনা সহসা মেলা ভার। সেই সৌন্দর্য এক অপূর্ব আভিজাত্য এনে দিয়েছে তার বসবার ভঙ্গিতে তার দৃষ্টিতে। আমীর হয়ে জন্মালেই এ জিনিস পাওয়া যায় না—এ জিনিস আল্লার দান। নিজের চেষ্টায় যেটুকু পাবার নজরৎ খাঁ তা পেয়েছে, কিন্তু চেষ্টার অতিরিক্ত যে জিনিসটি রয়েছে সে তা কি করে পাবে?

দারাকে বলা ছিল যে ঝরোকার ছিদ্র দিয়ে ওড়নার প্রান্ত গলিয়ে দিলে সে বুঝবে যে তাকে আমি ডাকছি। ঝরোকার পেছনে আমি থাকলে সে তাই ঘন ঘন চায় এদিকে। কিন্তু আজ সে একবারও চাইছে না দেখছে না, বহুক্ষণ আগেই আমার ওড়নার অনেকখানি ছিদ্রপথে ওদিকে চলে গিয়েছে। হয়তো হাওয়ায় দুলছে ওদিকে আমার চুমকি-বসানো মসলিন।

বড় রাগ হয়। দারার খেয়াল নেই। সংগীতগুরুকে পেয়ে সে আত্মহারা। তার মুখ-চোখের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। নিজের আসন ছেড়ে সে গিয়ে রাজার পাশে শূন্য আসনে বসে তার হাতের ওপর হাত রাখে। রাজাও তার হাতখানায় চাপ দেয়। দরবার-কক্ষ না হলে দারার মুখ দিয়ে কথার ফিনকি ছুটত। বড় রাগ হয়। শেষে একসময় দয়া করে দারা এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেলে। দেখতে পায় সে মসলিনের চুমকির উজ্জ্বলতা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বাদশাহের পানে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে ঝরোকার দিকে এগিয়ে আসে। আমি আবার হাঁপিয়ে উঠি।

লজ্জিত হাসি হেসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে,—একেবারে মনে ছিল না।

—তা থাকবে কেন? অমন ভুলো-মন নিয়ে নাদিরার পাশে বসে থাকা যায়। মসনদে বসার দুরাশা করা যেতে পারে না।

—খুব রেগেছ?

—না, রাগব কেন? মুঘল-শাহ্‌জাদীদের রাগের কোন মূল্য আছে?

—জাহানারা।

—দারা, এতদিন পরে ছত্রশাল এলেন। তাঁর দয়াতেই আমি গুলরুখকে অনুসরণ না করে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ তোমাদের কারও একবারও মনে হল না যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি?

—অন্যায় হয়েছে। আমি এখনি নিয়ে আসছি তাঁকে।

—তুমি না এলেও চলবে। শুধু তাঁকে পাঠিয়ে দাও।

দারা চলে যেতেই আমি দেওয়ান-ই-খাসের পাশে ছোট একটি ঘরে গিয়ে বসি সে ঘর বেগম এবং শাহ্‌জাদীদের সঙ্গে বাইরের লোকদের সাক্ষাতের জন্যে নির্মিত সে ঘরের সবটুকুতে ঝরোকার সূক্ষ্ম কাজ। বেগম শাহ্‌জাদীরা যাকে কৃপা করে ঘরটির একপাশে এসে সে দাঁড়িয়ে মুঘল-নারীদের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করে। অথচ ঠিকমতো দেখতে পায় না ঝরোকার ভেতর দিয়ে। দরবার থেকে এই সাক্ষাৎকার দেখা যায় না।

কিছুক্ষণ পরে ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে। নজরৎ খাঁয়ের মুখের অবস্থা একবার কল্পনা করি। তার পাশের আসন ছেড়ে রাজা এদিকে আসায় তার মনে ঝড় বইছে কি? জানি না। জানার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। আমি ভাবি, কি ভাবে কথা শুরু করব।

রাজা এসে দাঁড়ায় নির্দিষ্ট স্থানে।

—রাজা!

আমার কণ্ঠস্বরে আরও মধু ঢালতে পারতাম কি? ঝরোকার ভেতর থেকে দেখতে পাই ছত্রশালের উন্নত বক্ষ ফুলে ওঠে।

—রাজা, যাকে আপনি বাঁচালেন একবার দেখতেও ইচ্ছে হয় নি কি?

বলা হল না। আমি জানি এর চেয়েও সুন্দর কথা আমি বলতে পারতাম। কিন্তু পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না। অতি সাধারণভাবে অতি নগণ্যভাবে তাই নিজের দীনতা প্রকাশ করে ফেলি।

জবার দেবার আগে অপেক্ষা করে রাজা। এমনভাবে কথার সূত্রপাত করব, সে কল্পনা করে নি। ভেবেছিল, নিয়ম-মাফিক একটু কৃতজ্ঞতা, একটু কুশল প্রশ্ন করে ইতি টেনে দেব। ভাবে নি আমার প্রথম প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন দাবির সুর মেশানো থাকবে।

ধীরে ধীরে বলে রাজা,—বিপদ থেকে রক্ষা করা রাজপুতদের ধর্ম শাহ্‌জাদী। আর শাহ্‌জাদীকে রক্ষা না করা অপরাধ।

—সেই অপরাধের ভয়েই তবে সেদিন—

—না না। কোন কিছুই মনে হয় নি সে মুহূর্তে।

—কিছুই নয়?

রাজা ইতস্তত করে।

—বলুন।

—শাহ্‌জাদী, রাজপুতরা তাদের মনের মধ্যে অনেক কথাই চেপে রাখতে পারে।

ফুটে একবার বলতে শুরু করলে মিথ্যা বলতে পারে না। আপনি আমাকে
-বেন না।
কণ্ঠ প্রশ্ন যে আমি করবই রাজা। একটা কথা জেনে রাখুন, যাঁর দয়ায় আমি
র বেঁচে আছি তিনি যদি সত্যি কথা বলেন, সে সত্যি যত অপ্রিয় হোক না কেন,
রাধ বলে গণ্য হতে পারে না।
স কথা ঠিক বলে মেনে নিলেও এখানে মুঘল-বংশ, রাজনীতি, আরও অনেক
ব-কায়দার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। আপনি শাহানশাহ্ শাহজাহানের দুহিতা আর
মি তাঁর অনুগত সামান্য এক রাজা।
আপনি তো কোন রীতিই মানেন না।
সেকি শাহ্‌জাদী!
আমার কথা শুনে নজরৎ খাঁ তো সেদিন আমাকে রক্ষা করতে সাহস পান নি।
পনি কেন এগিয়ে এলেন? আমি শাহ্‌জাদী, আমার আদেশ অমান্য করেছেন
পনি।
জা চুপ করে থাকে। সে বোধ হয় জবাব খুঁজে পায় না। খুব লজ্জা হয় আমার।
ন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ পুরুষ আমার সঙ্গে কথায় হেরে গেল।
-তাই আমি বলছিলাম রাজা, ওসব ভুলে যান। ভাবুন আমরা দুজনা সাধারণ
নুষ। এখানে সত্যি কথা বলায় বাধা নেই।
-তবু আছে।
-কোন্ বাধা?
-আপনি নারী।
-তবে আমি কি বুঝব নারীর কাছে পুরুষেরা সত্যি বলে না কখনো?
-বলে, নিশ্চয়ই বলে। তবে নারী-বিশেষকে।
-আর আমি সেই বিশেষ নারীটি না। তাই না রাজা?
জা আবার চুপ। বড় সাংঘাতিক লোক দেখছি। নজরৎ হলে এতক্ষণ কি
রত? সহজেই অনুমান করতে পারি। হাতে বেহেস্ত পেত সে। গলে পড়ত।
-রাজা, আগুনে আমি কতটা কুৎসিত হয়েছি জানেন?
-আপনি কুৎসিত হন নি।
-কে বললে?
-সব খবর আমি রাখি।
-ও। যদি হতাম?
-আফসোস থাকত।

বড় কাটা কাটা কথা বলে। ভেতরে কি রস বলে পদার্থ নেই? চোখের
অন্য কথা বলে। সে দৃষ্টির মধ্যে চূড়ান্ত কিছু আছে।
—হঠাৎ আমার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। রাজা বুঝতে পারে
ঝরোকার ওপাশে দাঁড়িয়ে।
—রাজা, সত্যি কথা জানতে চাই না। কিন্তু আপনাকে আমি জীবনে ভুলব না।
—শাহ্জাদী কাঁদছেন? ছত্রশাল পাথরের জালের ওপর হাত রেখে ছটফট্ করে।
—না কাঁদব কেন?
দরবার-কক্ষের উত্তেজিত আলোচনা ভেসে আসে। দিল্লীতে যাবার দিন স্থির হ
সম্ভবত। আর বেশী দেরি নেই। বাদশাহ্ দিল্লী গিয়ে দেখে এসেছেন ইতিমধ্যে
প্রাসাদ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। আমাদের দুজনার কথা এ-সময়ে কারও ম
নেই। শুধু নজরৎ ছাড়া।
ছত্রশাল ঝরোকার ওপর মাথা রেখে বলে,—আমি সত্যি কথাই বলব শাহ্জাদী।
আমার স্বর কেঁপে ওঠে,—কিন্তু আমি তো সেই বিশেষ নারী নই।
—হ্যাঁ। আপনিই সেই নারী। সন্দেহ নেই তাতে। শাহ্জাদী, সেদিনের মত
ঘটনা যে-কোন জায়গায় ঘটলেই আমি ছুটে যেতাম। কিন্তু সেদিন আমার মনে
প্রথম কথাটি ছিল এই অপরূপাকে পৃথিবী থেকে মুছে যেতে দেব না, কিছুতেই নয়
তাই আপনার আদেশ অমান্য করেছিলাম। আজ আপনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন
এবারে শাস্তি দিন।
এবারে কি বলব? মাথায় যে আসে না। সময় চলে যায়। ও পক্ষও নীরব
অথচ অনেক কিছুই যে বলার আছে। যদি শাহ্জাদী না হতাম, বলতে পারতাম।
—শাস্তি আপনি পেতে চান রাজা?
—হ্যাঁ, অন্যায়ের শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজপুতরা অভ্যস্ত।
—জানি। খুব ভালভাবে জানি। মুঘল-দুহিতাকে রাজপুত সম্বন্ধে বলবেন না
এই দেহের অনেকটাই যে রাজপুত।
একটু থেমে ধীরে ধীরে বলি,—শাস্তি আমি দেব আপনাকে। কঠিন শাস্তি।
আমার কথা বলার ভঙ্গি কতখানি কঠিন হল বলতে পারি না। কারণ অপরদিকে
রাজার মুখে কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সে বলে,—শাস্তির কথা কি দরবার-কক্ষে
শুনতে পাবো শাহ্জাদী?
—না। এখনি বলছি। আজ দরবার-শেষে সবাই যখন চলে যাবে, তখন দারাকে
ডেকে নিয়ে আপনি এই ঝরোকার সামনে গালিচায় এসে দাঁড়াবেন। আমি
তানপুরা আনিয়ে রাখছি।

শাহ্জাদী!
—কোন প্রতিবাদ নয়। আমার হুকুমের নড়চড় হয় না। এখানে বসেই আমি শুনব আপনার সংগীত।
—শাহ্জাদী, আপনার দেহটিকে রক্ষা করার জন্য সেদিন যখন ছুটে গিয়েছিলাম, তখন কিন্তু কল্পনাও করতে পারি নি আপনার মন এত সুন্দর।
—এত সহজেই আমার মন জানা হয়ে গেল?
—হ্যাঁ। এতক্ষণ ধরে কি তবে বৃথাই কথা বললাম?
—আর কিছু জেনেছেন?
একটু ইতস্তত করে রাজা বলে,—হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়?
—যায় বৈ কি। আমার গলা কাঁপে।
রাজার প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। সে বলে,—মাঝখানে পাথরের জালের ব্যবধান, শাহ্জাদী। চেষ্টা করলে বোধ হয় আমি এ জাল ভেঙে ফেলতে পারি।
—শুধু শুধু অত শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন নেই। সংগীত-শেষে দারা আপনাকে অঙ্গুরীবাগে পৌঁছে দেবে। সেখানে দেখা হবে। এখন আপনি দরবারে ফিরে যান। মুখখানা যতটা সম্ভব ফ্যাকাশে করে মাথা নীচু করে টলতে টলতে গিয়ে আসন গ্রহণ করুন।
ছত্রশাল অট্টহাস্য করে উঠতে গিয়ে চেপে যায়।
সে চলে যেতে আমি ভাবি, বাদশাহ্ শাহজাহানের দুহিতা হয়েও বড় তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেলাম। যেন এতদিন ধরা দেবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে বসে ছিলাম। নিজের দৈন্য এতটা কিছুতেই প্রকাশ করতাম না। কিন্তু ও যদি হঠাৎ আবার চলে যায়? তাছাড়া মাঝখানে রয়েছে নজরৎ খাঁ। তার প্রতি দারার প্রীতির প্রাবল্য। রাজার কাছে একটু সুলভ হলামই বা।

সংগীতের রস জীবনে প্রথম আস্বাদন করি। এতদিন যাকে সংগীত বলে ভাবতাম সবই ঠুনকো বোধ হয়। মুগ্ধভক্তের মতো বসেছিল দারা রাজার সম্মুখে। তার চোখে জলের আভাস।
সংগীত শেষ হবার পরও একটা স্তব্ধতা বিরাজ করে। সুর ভেসে বেড়ায় অনেকক্ষণ। শেষে দারা উঠে দাঁড়ায়। আমার কাছে এসে বলে,—ছত্রশালের সঙ্গে আজই দেখা করবে জাহানারা?
—হ্যাঁ। অঙ্গুরীবাগে পৌঁছে দিও।

দারা হেসে বলে,—ভুলে যেও না ছত্রশাল হিন্দু।

—তুমি ভুলে যেও না দারা, মুঘল-হারেমেও অনেক হিন্দু রমণী এসেছেন।

—ভুলে যেও না ছত্রশাল বিবাহিত।

—তুমি ভুলে যেও না দারা, শাহজাহানের মমতাজ ছাড়াও অন্য বেগম আছেন।

—ভুলে যেও না জাহানারা, নজরৎ খাঁয়ের মতো শক্তিশালী আমীরকে হারালে বাদশাহ্ দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন।

—তুমিও ভুলে যেও না দারা, ছত্রশাল নজরৎ-এর চেয়ে কম শক্তিশালী নন।

এতক্ষণ মুচকি হেসে, এবারে জোরে হেসে উঠে দারা বলে,—বেশ, শেষ রক্ষা হলে হয়।

আমি একটু গম্ভীর হই। নজরৎ সব খবরই পাবে। সে সহ্য করবে না। ভায়ে ভায়ে দিনে দিনে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা মোটেই প্রীতির নয়। সুজা বাঙলাদেশ থেকে মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে এখানকার হাল-চাল জেনে নেয়। আওরঙজেবের লোক তো হামেশাই আসে। সে সময়ে রোশনারা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আওরঙজেবের প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত করতে পারি নি। এই সমস্ত সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের ভেতরে অসন্তুষ্ট নজরৎ দরবারে থাকলে বাদশাহ্ আর দারার ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কিন্তু রাজনীতির ওপরেও আর একটি জিনিস রয়েছে—যুক্তিতর্ক ভেসে যায় যেখানে।

—তুমি যদি নারী হতে দারা, তুমি কি করতে? ছত্রশালকে এখান থেকে বিদায় দিতে পারতে? বল, তোমার ওপর নির্ভর করছি।

বেশ কিছু সময় ভেবে নেয় দারা। তারপর বলে,—আমি অন্য কিছু করার কথা ভাবতে পারতাম না। নারী না হয়েও যে মজে গিয়েছি।

এবারে আমার হাসির পালা—তবে?

—আমি ওঁকে অঙ্গুরীবাগে পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু বাইরে আনার ব্যবস্থা তুমি করবে। খোজাদের মুখোমুখি যেন না হন উনি।

—সে চিন্তা আমার।

তাড়াতাড়ি নিজের কক্ষের দিকে ছুটি। ভাল করে সাজতে হবে। যত ভাল করে পারি শরীরের সমস্ত অংশ আতরের গন্ধে ভরিয়ে দিতে হবে। রাজাকে মুগ্ধ করতে হবে। রাজাকে বন্দী করতে হবে। এমনভাবে বন্দী করতে হবে যাতে নিজের রাজ্যে বসেও দরবারে আসার জন্যে মন তার ছটফট করে।

আজ লিখতে বসে বহুদিন পূর্বের এক সন্ধ্যার ছবি স্পষ্ট মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। সে ছবির স্মৃতি যেমন মধুর, তেমনি বিষাদময়। দু'খানি কিতাব আমাকে আর রোশনারাকে উপহার দিয়েছিলেন পিতা! রাগে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রোশনারা তার

কিতাব। সযত্নে গুলিস্তানের তৃণের ওপর থেকে আমি সেটি তুলে নিয়েছিলাম। কথা দিয়েছিলাম রোশনারাকে, সত্যি কথা লিখব আমি কিতাবে। কথা রেখেছি আমি। যা সত্যি বলে উপলব্ধি করেছি, তাই লিখেছি। অনেক কিছুই বাদ গিয়েছে জানি, কিন্তু উপায় নেই। সব কথা লেখা যায় না।

অবচেতন মনের কোথাও হয়তো রোশনারার প্রতি ছিটেফোঁটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছি তার কিতাবখানা দেবার জন্যে। তাই হয়তো তার ছবি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নি আমার লেখায়। ভালই হয়েছে। সে আমার বোন। মমতাজ বেগমের গর্ভে তার জন্ম। শুধু শুধু কেন এক ছোপ কালি মাখিয়ে দিই তার মুখে। তাছাড়া আমি লিখছি নিজের কথা। এর মধ্যে রোশনারা আপনা হতে যতটুকু আসে আসুক। চেষ্টা করে আমি আনতে যাব না। কাউকেই আনব না। আনতে গেলে আমার এই রচনা হয়তো ঐতিহাসিক দলিলের গুরুত্ব পেয়ে বসবে। আমি তা চাই না। আমি চাই, ভবিষ্যতের কেউ যদি মুঘল-বংশের গৌরব আর অফুরন্ত ঐশ্বর্যের কথা শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হয়, আমার কাহিনী পড়ে সে যেন সেই সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলে। মুঘল-বাদশাহ্‌দের হারেম যে বেহেস্ত নয়, সে যেন মর্মে মর্মে তা অনুভব করে নিজের ক্ষুদ্র কুটিরে বসে শান্তি পায়।

দ্বিতীয় কিতাবে লিখতে বসেছি। কিন্তু কলম যেন কিছুতেই আঁচড় কাটতে চায় না। চলতে চায় না লেখনী। ভেবেছিলাম শুরু করব আমার রাজার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা নিয়ে। কিন্তু তা পারছি কই? কিতাবখানি সম্ভবত অশুভ মুহূর্তে খুলে বসেছি।

আজ সকালে খবর এল নূরজাহানের বুকের স্পন্দন চিরতরে থেমে গিয়েছে। নাজীর এসে খবরটি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম বাদশাহের কাছে। কিন্তু তিনি বড় ব্যস্ত। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি-জড়ানো আগ্রার এই প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে। চিরকালের মতো যেতে হবে। দিল্লী রওনা হব আমরা। আর কখনো এখানে এসে এই অতি মধুর অতি পরিচিত জায়গাগুলি দেখবার সুযোগ হবে কিনা জানি না।

বাদশাহ্‌কে নূরজাহানের মৃত্যুসংবাদ জানাতেই তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন,—তোমাকে কে বললে?

—হারেমেই খবর পেলাম।

—সব ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি ভেবো না।

—কখন যাব ?

—কোথায় ?

—জেসমিন প্রাসাদে ?

—তুমি ? না, তুমি না। শুধু দারা।

—আপনি ?

—আমিও না।

—বাবা, মস্ত অপরাধ করতে চলেছেন।

—জানি জাহানারা। নূরজাহান বেগম যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই শুধু আমার শত্রু ছিলেন।

—তাও ঠিক নয়।

বাদশাহ্ চকিত দৃষ্টি ফেলেন আমার দিকে।

—মৃত্যুর আগে মা গিয়েছেন তাঁর কাছে। আমিও গিয়েছি পরে। তাঁর অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছিল। আমার হিতৈষী ছিলেন তিনি।

—হুঁ।

মায়ের কথা বলার পরই নিজের কথা বলায় তাঁর মুখ বন্ধ রইল।

—আজ এসময়ে—

—না জাহানারা। বাদশাহ্ হতে হলে প্রতি ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলা যায় না।

—কিন্তু মৃত্যুটি যে মানুষের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি, বাবা!

—তবু। হারেমে যাও জাহানারা।

চলে আসার জন্য প্রস্তুত হই। তিনি ডেকে নিয়ে বলেন,—চোখের জল মুছে ফেল।

হতাশ হই। নূরজাহানের মুখখানা বার বার মনে পড়ে। সে মুখ এখন প্রশান্ত, সে আঁখি এখন নিমীলিত। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের স্মৃতি তাঁর মনকে আর দোলা দিতে পারে না।

নিজের কক্ষে গিয়ে অঙ্গুরীবাগের দিকে চেয়ে থাকি। ওই গুলআশরফী ফুলের পাশে সেদিন রাজাকে কত কথা শুনিয়েছিলাম। নির্বাক্ হয়ে শুনেছিল রাজা। হয়তো বাচাল ভাবছিল আমাকে। একজন পরপুরুষের সামনে ওভাবে কেউ বলতে পারে না। ভাবুক, বাচাল। তার পরের ঘটনা তো প্রমাণ করে দিয়েছিল ছত্রশাল আমার বন্দী। আজীবন আমার বন্দী।

সেদিনের সেই ঘটনার পর ভেবেছিলাম বুঝিবা সমস্ত মুঘল সাম্রাজ্যেরই সুদিন এল। নিজের ভরপুর হৃদয় নিয়ে সব-কিছুকেই অপূর্ব বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে যে কত

ভুল, নূরজাহান বেগমের মৃত্যু তার প্রমাণ দিচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, আরও ছে—আরও অনেক বাকী আছে। এক ঘোরতম দুঃসময় যেন এগিয়ে আসছে া-নিশ্চিত পদক্ষেপে। দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর, নূরজাহানের মৃত্যু, বাবার াভাব সেই ভয়ংকর দিনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে মাত্র। জানি না, এ আমার কল্পনা না—অলস মনের উদ্ভট কল্পনা। তাই যেন হয় আল্লা!

গ্রার দিন শেষ হয়ে এল।

ন পরে ঘুম থেকে চোখ মেলে এই আগ্রাকে আর দেখতে পাব না। স্মৃতিতে ন পাবে শুধু। ওই অঙ্গুরীবাগ, জানলা খুললে যার শত শত ফুলের গন্ধ ছুটে ন মনকে মাতিয়ে তোলে, যার অপূর্ব বৃক্ষরাজি আর তৃণ-গালিচা তৈমুরলঙের জধানী সমরখন্দ-এর 'কানিবুল' উদ্যানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, দুদিন পরে তা তের গর্ভে স্থান পাবে। অঙ্গুরীবাগ হবে অতীতের জিনিস। বাদশাহ্ স্থান -ত্যাগ লে এ উদ্যান নষ্ট হবে।

: যে শিশমহল। দিল্লীতেও হয়তো শিশমহল তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্মৃতিহীন মহলের আভিজাত্যহীন চাকচিক্য মনকে এমনভাবে দোলা দেবে না কখনো। শাহ্ আকবরের সাধের দশ-পঁচিশীর অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না। আর থাকবে তাঁর খা-আব-বাগ কক্ষ। খা-আব-বাগের কথা মনে হতেই বুকের ভেতরে কেঁদে ঠ। মা থাকতেন সেখানে।

ষবারের মতো কক্ষটি দেখার জন্যে ঘর ছেড়ে বার হই। এই সন্ধ্যায় আর কেউ ার আশেপাশে থেকে আমার ভাবাবেগে বাধা সৃষ্টি করবে না নিশ্চয়। শুধু আব কজন মাত্র থাকতে পারেন সেখানে। স্বয়ং বাদশাহ্। আগে অনেকবার দেখেছি। ন্তু আজ তাঁরও থাকার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। কারণ আজকাল যেন তিনি তাঁর তি প্রিয় মমতাজ বেগমের কথা ভুলে গিয়েছেন। আগের মতো আর ঘন ঘন াজমহলের দিকে চেয়ে থাকেন না। নিজের অজ্ঞাতে চোখের কোণে আর অশ্রুও খা যায় না তাঁর। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই অনেকের মুখে শুনি, কিন্তু বিশ্বাস রতে ইচ্ছে হয় না। হারেমে কত কথাই তো রটে। আমাকে কেন্দ্র করে যে বন্য অপবাদটি রটেছিল, তাও তো এই হারেম থেকেই। তবু অনেক সময়ই দশাহের দিকে চেয়ে থাকি আর অবাক্ হই তাঁর পরিবর্তন দেখে। আগ্রা ছেড়ে বার জন্যে তিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছেন।

ায়ের ঘরের পর্দা এখনো ঝুলে থাকে আগের মতোই। সেই পর্দা উঠিয়ে আস্তে

আস্তে পা বাড়াই। আগের মতো ঝাড়ের আলো আর এখন ঘরকে আলোকি
করে না। কোন বৃদ্ধা নাজীর শুধু একটি করে বাতি রেখে যায় ঘরের মাঝখা
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায়। সে বাতি হয়তো বেশীক্ষণ জ্বলেও না। আজও বা
জ্বলছিল—হয়তো শেষ বাতি। শাহানশাহ্ শাহজাহানের উপস্থিতিতেই যখ
এ-দশা, তিনি চলে গেলে যে কী হবে সহজেই অনুমান করা যায়। চোখ দুটো জ্বা
করে, অশ্রু জমা হয়।

মায়ের অনেক স্মৃতিই মনে পড়ছিল। শেষ দিনে এই গালিচায় বসে পড়ে শিশু
মতো কেঁদেছিলেন বাদশাহ্। আর আজ?

দেয়ালে টাঙানো পর্দার আড়ালে মায়ের তসবির রয়েছে। সে হাসি মুখখানি ফু
উঠবে পর্দা সরালেই। কিন্তু না, এখন নয়। ঘর ছেড়ে যাবার সময় মায়ের কা
থেকে বিদায় চেয়ে নেব। দিল্লীতে তাঁর এ তসবির যাবে না। বাদশাহের হুকুম
এমন অদ্ভুত হুকুম কেন যে তিনি দিলেন জানি না। দারা এ সবের একটা কা
আবিষ্কার করেছে। সেটা কতখানি সত্যি বোঝা কঠিন।

সে বলে, মায়ের কথা বাদশাহ্ কিছুতেই ভুলতে পারেন না। ভুলতে পারেন
বলেই তাঁর শেষ কয়েক গুচ্ছ কাঁচা চুল দ্রুত সাদা হয়ে যাচ্ছে। তিনি কোন কা
মন বসাতে পারেন না। বিবেকের কাছে সব সময়েই অপরাধী থাকেন। ত
আগ্রা ছেড়ে যাবার জন্যে পাগল হয়েছেন। মমতাজ বেগমের কথা জোর ক
ভুলে যেতে চাইছেন তিনি। তাই তাঁর এই কঠোরতা। তসবির অবধি নি
যেতে দেবেন না দিল্লীতে।

দূরে চন্দ্রকিরণ স্নাত তাজমহল। শিল্পীর সৃষ্ট তাজমহল। সে শিল্পী এখন
করছে? কোয়েলের কোলে মাথা রেখে হয়তো শুধু কেঁদে চলেছে তার অজ্ঞা
গ্রামের কুটিরে। সেখানেও চাঁদ উঠেছে।

মায়ের সমাধির পাশে এতক্ষণ নিশ্চয়ই কোরানের পুণ্যবাণী সুর করে পাঠ করা হচ্
কিন্তু শুনছেন কি তিনি? তাঁর প্রিয়জনেরা তাঁকে ছেড়ে যে চলে যাচ্ছে। বি
স্থির হতে পারছেন না। আজ তিনি কি সেখানে রয়েছেন? না না। অ
তিনি এখানে।

সহসা দমকা হাওয়া জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকে। দরওয়াজার পর্দা প্রচণ্ডভাবে দু
ওঠে। মায়ের তসবিরের পর্দা ওপর দিকে উঠে কিসের সঙ্গে যেন উৎকটভাবে আ
যায়। ভেসে ওঠে তাঁর দেহ, মুখ অবয়ব।

বাতি নিভে যায়। অন্ধকার।

কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলে ওঠে,—চলে যেও না জাহানারা।

কে? মা? নূরজাহান?

কে? গুলরুখ?

চিৎকার করে উঠি,—না না। আমি যেতে চাই না। আমি চাই না যেতে।

চারদিক থেকে যেন হাওয়ায় কথা বলে,—যেও না, যেও না।

—না না গুলরুখ। আমি যেতে চাই না। বাদশাহ্—তিনিই সব কিছুর মূলে।

ছুটতে থাকি। কোন্‌দিকে দরজা? যেদিকে ছুটি সেদিকেই দেয়ালে বাধা পাই। একি হল? ওই তো পর্দা। সাঁ সাঁ করে আবার দমকা হাওয়ায় তাড়া করে। পর্দাগুলো আমার পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায়—বেঁধে ফেলে আমাকে। পড়ে যাই আমি।

জ্ঞান হতে বাদশাহের উদ্বেগ-কাতর মুখ চোখে পড়ে। হাসার চেষ্টা করি।

—ভাল বোধ করছ জাহানারা?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছিল?

—কিছু না।

পিতা মুখ নীচু করেন। কি যেন ভাবেন। শেষে বলেন,—আমি এখানে না এলে কতক্ষণ পড়ে থাকতে ঠিক নেই।

—আমি ভেবেছিলাম আপনি আর আসেন না এখানে।

বাদশাহ্ বিচলিত হন। বলেন,—আমি জাহানারা। সবাই তোমরা আমাকে যা ভাবতে শুরু করেছ আমি ঠিক তা নই।

—ক্ষমা করবেন বাবা।

তাঁর চোখে জল দেখি। মায়ের তসবিরের পর্দা তখন আর উঠে নেই। স্বাভাবিক-ভাবেই ঝুলছে।

বাতিটি জ্বলছে। বোধহয় বাদশাহ্ জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

তিনি আবার প্রশ্ন করেন,—কি হয়েছিল জাহানারা?

—কিছু নয়, বাবা।

—আমি জানি।

—কি জানেন?

—সে তোমাকে ভালবাসত খুব। আর আমাকে।

—কি বলছেন বাবা!

—সত্যি কথা বলছি। ওই বাতিটা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি।

—আপনি এ সবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?

—না করলে যে উপায় নেই। মনে হয় ও আমাদের একেবারে ছেড়ে গিয়েছে। কি করে তা সহ্য করা যায় বল তো ?

স্তব্ধ হয়ে থাকি।

বাদশাহ্ গম্ভীর স্বরে বলেন,—তবে আর বিশ্বাস করব না। মমতাজ কোনদিন পৃথিবীতে ছিল, ভুলে যাব সেকথা। তাই তো দিল্লী যাচ্ছি। তাই ওর তসবির এখানেই পড়ে থাকবে।

অবাক্ হয়ে পিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। তিনি অনেকক্ষণ আপন মনে ভাবেন। শেষে বলেন,—চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মেয়ে হয়েও তাঁর সঙ্গে হারেমের দিকে যেতে সংকোচ হয়। তাই বলি,—আমি একাই যাই বাবা।

দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। ভ্রূ কুঞ্চিত হয় তাঁর। তারপর বলেন,—ও, আচ্ছা। হারেম বড় নোংরা জায়গা, তাই না জাহানারা ?

—হ্যাঁ বাবা।

—তাই তো হারেমে যাই না। তোমার মা বেহেস্ত থেকে ছিট্‌কে এসেছিলেন। চিন্তান্বিত হয়ে তিনি অন্যপথে প্রস্থান করেন।

দিল্লীর পথে রওনা হই সদলে। চোখে আমার জল। রোশনারার মুখে হাসি, মন চঞ্চল। নতুন জায়গার দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে পেয়ে বসেছে। তার দৃষ্টি সামনে। গাড়ীর সামনের দিকে সে বসেছে। আমার দৃষ্টি পেছনে। আমি দেখছি কেমন ধীরে ধীরে তাজমহলের মিনারগুলি একসময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার গম্বুজ আস্তে আস্তে কেমন ম্লান হয়ে আসছে। বার বার অবাধ্য চোখদুটোকে মুছে ফেলি।

আমার ছোট বোনের মুখে অসহায় ভাব। তার দৃষ্টি সামনেও নয়, পেছনেও নয়। সে চেয়ে রয়েছে ওপরের দিকে। যৌবনের রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে তার মুখে, বুকে, নিতম্বে। সে হয়তো ভাবছে দিল্লীতেও এমন সূর্য ওঠে কিনা, দিল্লীর আকাশে যাতে চাঁদের আলো ঝলমল করে কিনা। বড় অবহেলার মধ্যে মানুষ হয়েছে। শাহ্জাদী হিসাবে অনেক কিছুই সে জানে না, যা তার জানা উচিত ছিল।

আমাদের সামনের গাড়িতে রয়েছে দারা আর নাদিরা। নাদিরার ছোট ছেলে সিপারও রয়েছে তার কাছে। বড় ছেলে সুলেমান শুকো বাদশাহের গাড়িতে একেবারে সামনে। জাহাঙ্গীর যে গাড়িখানা উপহার পেয়েছিলেন সাগরপারের

রাজার কাছ থেকে, তাই চড়ে বাদশাহ্ চলেছেন। পেছনে আরও কতশত গাড়ি। তাতে রয়েছে আমীর-ওমরাহ্‌দের পরিবার। আরও পেছনে রয়েছে রসদ। অশ্বারোহী সৈন্যদলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একভাগ এগিয়ে গিয়েছে পথকে নিরাপদ করতে, অন্যদল রয়েছে পেছনে। তারও পেছনে রয়েছে হস্তী। চলতে চলতে কখনো আমরা যমুনা নদীর পাশে চলে আসছি, আবার কখনো দূরে সরে যাচ্ছি।

কল্পনা করতে বেশ লাগে, আমরা যেন বিরাট এক হজযাত্রীর দল। মক্কায় গিয়ে আমাদের যাত্রা শেষ। দূরে যেন দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। মাঝে মাঝে তার পাম্বপাদপের গাছ আর মরুদ্যান। ওই মরুভূমি-পথে যাত্রা শুরু করে শেষদিকে আমরা আমাদের পাদুকা আর মস্তকের আবরণ খুলে ফেলব। ভক্তি-নম্র চিত্তে আমাদের পরমপবিত্র তীর্থস্থানের দিকে অগ্রসর হব। পদতল প্রচণ্ড উত্তাপে আহত হবে। মস্তকের ওপর অসহ্য রৌদ্র। তবু বিচলিত হব না আমরা। মহম্মদদের শুভ্র বস্ত্র শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবার যে আর দেরি নেই। সে বস্ত্র স্পর্শ করতেই হবে। নইলে হজে এসে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করব না।

—এই !

চমকে উঠি। দেখি রোশনারা ডাকছে।

—অত কি ভাবিস বলতো ? তবু যদি বুঝতাম—

—সন্ধ্যে যে হয়ে এল রোশনারা।

—হ্যাঁ। নামবি না ?

তাই তো। আমাদের গাড়ি থেমে রয়েছে। ওদিকে শিবির ফেলা হচ্ছে। শতলোক কর্মব্যস্ত।

সে সন্ধ্যায় পাশের কোন গ্রাম থেকে এক জ্যোতিষী বাদশাহের দর্শনপ্রার্থী হন। জ্যোতিষীদের বাদশাহ্ কখনো ফিরিয়ে দেন না। শিবিরের ভেতরে ডেকে আনা হয় তাঁকে। আমারও ডাক পড়ে। নিজের তাঁবু থেকে বার হয়ে জাল-ঘেরা পথে বাদশাহের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। জ্যোতিষী তখন হস্তবিচারে ব্যস্ত।

ধীরে ধীরে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়। কপালে চিন্তার রেখা পড়ে।

—কি দেখলেন ?

—দেখছি আপনার অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ।

আমার মুখ রক্তশূন্য। বাদশাহ্‌ও হতবাক্। এমন স্পষ্টভাষায় তাঁর সামনে কেউ কখনো কথা বলে না।

বলে উঠি,—বাদশাহ্ হলেই ভবিষ্যৎ সব সময় উজ্জ্বল হয় না।

—তা মানি, কিন্তু এই হস্তের অধিকারীর ভাগ্যে রয়েছে অশেষ অপমান।
বাদশাহ্ রীতিমতো বিচলিত হন। আমার রাগ হয় জ্যোতিষীর
উত্তেজিত স্বরে বলি,—কোন্ স্বার্থান্বেষী আপনাকে পাঠিয়েছে? আপনি
ভাবছেন এসব বলে বাদশাহের মনোবল ভেঙে দিতে পারবেন?
শান্ত হাসি হেসে তিনি উত্তর দেন,—না মা, তা ভাবি নি। আমি বাদশাহের হিতৈষী।
তিনি যাতে তাঁর বিপদের কথা আগে থাকতে জেনে নিজেকে প্রস্তুত করতে
পারেন সে ব্যবস্থা করে যাব।
—কি ব্যবস্থা করবেন?
জ্যোতিষী আমার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি ফেলেন। তাঁর ভ্রূ-জোড়া কুঞ্চিত হয়। তিনি
বলেন,—সব বলছি। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ জান কি?
—না।
আশ্চর্য। বাদশাহের সঙ্গে তোমার ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গাঁথা। আপনি ভাগ্যবান
জাহাঁপনা, এমন কন্যা পেয়েছেন।
পিতা হাসেন। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার পিঠে হাত রেখে বলেন,—
আমি জানি। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট করে বললেন না।
—কেউ যদি আপনাকে নিহত করে সিংহাসনে বসতো বাদশাহ্ আমি কিছু বলতাম
না। কারণ এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে। কিন্তু বেঁচে থেকে আপনাকে তিলে
তিলে দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে।
—আরও স্পষ্ট করে বলুন।
—না। আর নয়।
জ্যোতিষী তাঁর ঝুলি থেকে দুটি সুন্দর কাশ্মীরী আপেল বার করে বাদশাহের দিকে
বাড়িয়ে বলেন,—এ দুটি ধরুন জাহাঁপনা।
পিতা দু'হাতে ধরেন।
—এবারে আপনার কন্যাকে দিয়ে দিন।
আমি আপেল দুটি পিতার হাত থেকে নিই।
—জাহাঁপনা, আপনার হাতে দেখুন সুমিষ্ট ফলের সুবাস। এই সুঘ্রাণ আপনার
হাতে লেগে থাকবে। শত ধুলেও যাবে না। আতরে নষ্ট হবে না। কিন্তু যেদিন
দেখবেন এর গন্ধ ক্ষীণ বলে মনে হচ্ছে সেদিন বুঝবেন আপনার অপমানের দিন খুবই
নিকটে। আর যেদিন দেখবেন কোন গন্ধই নেই, সেদিন বুঝবেন মৃত্যু অতি সন্নিকট।
আমাদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জ্যোতিষী সহসা উঠে বিদায় নেন। বাধা
দিতে পারি না।

শাহ্ স্তম্ভিত। তাঁকে বড় ক্লান্ত দেখায়। দিল্লীতে গিয়ে নতুন উদ্যমে দেশ-রাজ্যের সব উত্তেজনা যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হয় তাঁর মধ্যে থেকে।

তাজেশাহ্ শাহজাহান শূন্যদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অসহায়ের মতো আমার অখাে দু'হাত বাড়িয়ে বলেন,—দেখ তো জাহানারা আপেলের গন্ধ আছে তো?

—হ্যাঁ বাবা আছে। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমিও তো আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

—তা আছিস বটে। তা আছিস।

বাদশাহ্‌কে বড় বেশী বৃদ্ধ বলে মনে হয় হঠাৎ। কষ্ট হয় খুব। আমি ধীরে ধীরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

—জাহানারা, কালই আগ্রায় লোক পাঠাবো।

—কেন বাবা?

—তাজমহলের বিপরীত দিকে যমুনার অপর পারে আমার সমাধিস্থল নির্মিত হবে।

—ছি বাবা।

—ছি, নারে। এখন তৈরী না হলে পরে আর সময় পাবো না। কি রঙের হবে, জানিস?

—না।

—লাল। এপারে সাদা আর ওপারে লাল। যেন স্বর্গ আর মর্ত্য। তাজমহল থেকে একটি কৃষ্ণবর্ণ সেতু বার হয়ে নদীর ওপর দিয়ে আমার সমাধিস্থলের সঙ্গে যুক্ত হবে। এই সেতুটি যেন মৃত্যু, আমাকে আর তাকে এক করে দেবে। বেশ হবে।

—হ্যাঁ বাবা। কিন্তু এত ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? দিল্লী গিয়ে লোক পাঠালেই চলবে।

—যদি দেরি হয়ে যায়?

—একটুও দেরি হবে না।

আবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন,—দেখ তো গন্ধটা আছে কি না?

জ্যোতিষীর ওপর ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। ইচ্ছে হয় অশ্বারোহী পাঠিয়ে তাকে ধরে এনে মৃত্যুদণ্ড দিই।

বাদশাহ্ কি শেষে উন্মাদ হয়ে যাবেন? নিজের হাতের ঘ্রাণ নিজে নিয়েও হয়তো বিশ্বাস হবে না তাঁর। দিনে-রাতে নিদ্রায় জাগরণে আমার কাছে ছুটে আসবেন।

—ঠিক তেমনই রয়েছে, বাবা। মনে হচ্ছে চিরকালই এ-গন্ধ থাকবে।

—তাই কি কখনো হয়? মানুষ অমর হতে পারে না। তবু মানুষ নিভাবনায় থাকে। কারণ সে তার ভবিষ্যৎ জানতে পারে না। যদি জানত, কী সর্বনাশই না হত!

শিবিরের বাইরে অন্ধকার হয়ে আসে। উন্মুক্ত প্রান্তরের অপর সীমা থেকে ঝড়ের মতো হাওয়া ছুটে এসে বালিরাশি উড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। কিছু দূরে সৈন্যদলের হৈ-হুল্লোড়। অশ্বের ছটফটানি আর হ্রেষা রব এক অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে ভাবি যদি দিল্লীতে গিয়ে দেখি ছত্রশাল সেখানে হাজির, তবে আনন্দে হয়তো আমি মরেই যাব।

—জাহানারা।

অল্প সময়ের মধ্যেই বড় বেশী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বাদশাহের ডাকে তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ি।

—জাহানারা, হারেমকে এখন কে শক্ত হাতে চালনা করে আমি জানি। তোমার মায়ের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে যে তুমি তাঁর স্থান দখল করেছ, সে কথা কেউ না বললেও বুঝতে দেরি হয় না।

—কিন্তু আমি তা চাই না।

—না চাইলেও অনেক জিনিস আপনা হতেই ঘাড়ে এসে পড়ে। তার মূল কারণ বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব। আওরঙজেব ছাড়া তোমার সমকক্ষ আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ নেই।

—আপনি আমাকে একটু বেশী স্নেহ করেন।

—না। স্নেহের আধিক্যে আমার বিচার-বুদ্ধি এক্ষেত্রে অন্তত আচ্ছন্ন হয় নি। জাহানারা, এতদিন যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে এসেছ, দিল্লীতে গিয়ে তাই হবে তোমার প্রথম কর্তব্য। নতুন জায়গায় শক্ত হাতে যদি লাগাম না ধর তবে অনেকেই ছিটকে যাবে। দিল্লীর হারেম অনেক বেগমের মাথা খারাপ করে দেবে।

—এত সুন্দর?

—হ্যাঁ। সেজন্যেই বলছি জাহানারা, ওখানে পৌঁছেই তোমার নানান্ কাজ। শুধু হারেমের নয়—বাইরেরও।

—কেন? দারা?

—দারার পাশে তুমি না থাকলে সে মসনদে বেশীদিন টিকতে পারবে না। এক্ষেত্রে আকবরের নির্দেশ অন্তত কাজে লেগেছে।

আমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। রাজার মুখখানা চোখের সামনে ভাসে। অতি কষ্টে দীর্ঘশ্বাস রোধ করি।

—জাহানারা, খলিলুল্লা খাঁয়ের শিবির কি অনেক দূরে?

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি খলিলুল্লা খাঁ সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে তিনি কাজে পাঠান আগ্রা থেকে দূরে। অর্থও দিচ্ছেন তাঁকে

প্রচুর। এসবের কারণ হারেমে বসে পাওয়া যায় না। কিন্তু একদিন খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগমকে হারেমে দেখে আমার তীব্র কৌতূহল হয়েছিল। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, হারেমে আসার কারণ সম্বন্ধে। সে জবাব দিতে পারে নি। মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল তার। যাবার সময় শুধু বলেছিল,—শাহ্‌জাদী, মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর আর কোন বেগমই বুঝি বাদশাহ্‌কে শান্তি দিতে পারছেন না?

কিছু বলতে পারি নি সেদিন তাকে।

আগ্রা ছেড়ে আসার আগের দিন বাদশাহ্‌ খলিলুল্লা খাঁকে সুরাটে পাঠাতে চেয়েছিলেন। অসুস্থতার অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। তাঁর এই চালাকি বাদশাহ্‌ বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ তাঁর চোখেমুখে দেখেছি ক্রোধের অভিব্যক্তি।

বাদশাহের প্রশ্নের উত্তরে বলি,—তাঁদের শকট আমাদের অনেক পেছনে ছিল।

গম্ভীর হন পিতা। একটা চাপা উত্তেজনা মুখময় ছড়িয়ে পড়ে তাঁর। বাদশাহের শকট থেকে নিজের শকট অনেক দূরে রাখাও কি খলিলুল্লার চালাকি?

বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ধীরে ধীরে পিতার শিবির থেকে চলে আসি। ইচ্ছে ছিল রোশনারার কাছে গিয়ে কিছু সময় গল্প করে কাটাই। কিন্তু এ সময়ে তার কাছে যেতে ভরসা হয় না। কি অবস্থায় দেখব ঠিক নেই। ওদিকে নাদিরার শিবিরও স্তব্ধ। একটু দূরে পদশব্দ। চেয়ে দেখি সুলেমান শুকো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ বড় হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। আওরঙজেবের ছেলেটাও নিশ্চয় এত বড় হয়েছে। কখনো দেখি নি তাকে। আগ্রার সংস্পর্শ থেকে আওরঙজেব তার সমস্ত পরিবারকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখে। বোধহয় সে ভাবে, যে তার ছেলেরা হবে ভবিষ্যতের বাদশাহ্‌। এ ভাবনার একটি ইতিহাস আছে। আগে বলেছি কি না মনে নেই। কোন এক ফকির একবার বলেছিল বাদশাহ্‌কে, যে তাঁর সর্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ পুত্রই হবে তাঁর উত্তরাধিকারী। কথাটা সেদিন আওরঙজেবের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। সে-ই সব চাইতে গৌরবর্ণ।

—কে? সুলেমান চিৎকার করে ওঠে।

—আমি। দেখে ফেলেছ?

কাছে এগিয়ে আসে সে। হেসে বলে,—দেখব না? আমি যে পাহারা দিচ্ছি।

—কেন? পাহারা দেবার লোকের অভাব হল না কি যে তোমাকে পাহারা দিতে হচ্ছে?

—এ সব অচেনা জায়গায় তাদের ওপর নির্ভর করা যায় না কি? মেয়েরা কিছু বোঝে না।

খুব আমোদ লাগে তার কথা শুনে। বলি,—ঠিক বলেছ।
—কোন্ দিকে যাচ্ছ?
—বুঝতে পারছি না সুলেমান। বল তো কোথায় যাই?
—কোথাও গিয়ে কাজ নেই। নিজের শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম কর।
—একথা বললে কেন?
সুলেমান হেসে ওঠে। রোশনারার শিবিরের দিকে ইঙ্গিত করে বলে,—ওখানে খুব জমেছে।
—ছিঃ সুলেমান। তোমার এখনো এমন কিছু বয়স হয় নি যে ওভাবে কথা বলবে।
গম্ভীর হয় সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—না বলতে পারলেই সুখী হতাম।
সে চলে যায়।
ভাবি সত্যিই সুলেমান বড় হয়ে উঠেছে। দারার বিবাহের দিনের কথা একের পর এক চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নাদিরার ব্রীড়া সংকুচিত মুখভাব বড়ই সুন্দর লাগছিল দেখতে। তখন সে কিশোরী।

শাহানশাহ্ শাহজাহানের সখের রাজধানী দিল্লী প্রান্তে এসে উপস্থিত হই। দূরে রক্তবর্ণ 'কিল্লাই মুবারকের' মাথায় বৃহৎ গম্বুজ অপূর্ব লাগছিল দেখতে। বড় গম্বুজের পাশে ছোট সাতটি মিনার কিল্লাই মুবারককে এক অভূতপূর্ব আভিজাত্য দান করেছে।
অধৈর্য হই ওখানে গিয়ে পৌছবার জন্যে। শকটগুলি যেন তাদের গতি শ্লথ করেছে। রোশনারা ছট্‌ফট্ করতে করতে অস্ফুটস্বরে গালাগালি দিয়ে ওঠে।
—ওতে লাভ হবে না রোশনারা। শকটের গতি একটুও কমে নি। তোর মনের গতি বেড়েছে।
—অপদার্থ সব।
হাসি আমি। বয়স রোশনারার কম হল না। অথচ এখনো আগের মতোই। ছোট বোনটি কিন্তু নির্বিকার। আশা, উদ্যম, কৌতূহল—কিছুই যেন নেই তার। ছোট বোনকে ঠেলা দিয়ে বলি,—কিরে চুপচাপ কেন। আনন্দ হচ্ছে না তোর?
—হুঁ।
—শুধু হুঁ। জানিস ওখানকার হারেম আর বেহেস্ত একই।
—তাই আবার হয় নাকি?
—হয় না মানে? সারা ভারতের অধীশ্বর, ইচ্ছে করলে কী না হতে পারে?

বার ... এমন ... আর নিশ্চিত মতাম ...
জমহ ... কোন মেয়েকে দেখি নি। একে গুজরাটে ...
রেছেন ... দের মহৌষধ। কাউ ...
আ ... হলে তরবারির খোঁচা দিয়ে ...
মারে।

মনোভাব অনুমান করতে পেরে মৃদু হেসে বোনটি বলে,— ...
মতাজ বেগমকে বাঁচাতে পেরেছিলেন।

তে পারি কোথায় ব্যথা ... জ যদি মমতাজ বেগম বেঁচে থাকতেন তাহলে
ই অবহেলা আর নিরান ... করতে হত না তাকে। আমাদের মতোই হাসতে
রত, খেলতে পারত।

ড় কষ্ট হয় আমার। ওর মাথায় হাত রেখে বলি,—ঠিকই বলেছিস। ওই ওপরে
নি রয়েছেন, সবাই ওঁর হাতের পুতুল।

কটগুলি হঠাৎ একের পর এক থেমে যায়। এবারে সত্যিই আমি বিরক্ত হই।
দশাহ্ যেন আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন। এ সময়ে এমনভাবে গতিরুদ্ধ করার
কান অর্থ হয় না।

লেমান সামনে থেকে ঘোড়ায় চড়ে দারার দিকে যাচ্ছিল। থামাই তাকে।

—কি ব্যাপার স্থলেমান?

দশাহ্ বলে দিলেন যমুনার তীরে খিজরী দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে।

—বেশ তো। উনি সামনে আছেন। উনি যেদিকে যাবেন, আমরাও তাই যাব।
ার জন্য এভাবে থেমে যাওয়া কেন?

—তবু সবাইকে একবার বলে দিতে বললেন।

—বলে এসো।

রোশনারা দাঁতে দাঁতে ঘষে। তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ।

আমি বলি,—দেখিস, আর রাগিস না। টুস্‌টুস্ করে রক্ত গড়াবে এবার।

—ঠাট্টা করার সময় অসময় আছে।

—এটাই সময়। বেশ লাগছে দেখতে তোকে।

আমার ছোট বোন মুখে ওড়না চাপা দিয়ে নিঃশব্দে হেসে ওঠে। তার দিকে জ্বলন্ত
ষ্টি হেনে রোশনারা গুম হয়ে থাকে।

একটু পরেই শকটশ্রেণী চলতে শুরু করে।

রাজধানী দিল্লী।

...সেছি। নতুন প্রাসাদের ... ছোট্ট ... মতো রোশনারার ... ফুল ছিঁড়েছি—ছড়িয়েছি ... গিয়ে দাঁড়িয়ে কি ... ভেবে পাই নি। ... নিজেকে মনে হয়েছে স্বর্গের অপ্সরী ... কাব... বয়ে ... নহরী-বেহেস্ত। কোন প্রকোষ্ঠের ভেতর দিয়ে এভাবে মন্দাকি... নির্দিষ্ট প্রণালী বয়ে যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। নানান্ ব... আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে। সব দেখে রোশনারারা পাগল হয়েছে। ছো... বোনটি পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু আমি?

আনন্দ আমারও হয়েছে। ওরা যেভাবে আনন্দ প্রকাশ করেছে, আমিও তা করেছি... কিন্তু ওদের মতো নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারছি কই? বুকের ভেতর কোথ... যেন কাঁটা বিঁধে রয়েছে। সব আনন্দ একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম কর... চাইলেই খচ্ করে বেঁধে। বড় ব্যথা পাই তখন। বড় খারাপ লাগে। মনে হ... যা দেখছি সবই যেন বাইরের—মনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই।

মাকে ফেলে এসেছি আগ্রায়। সেইদিন সন্ধ্যায় আমাকে ধরে রাখার জন্যে নিশ্চ... তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কথার ছলে খ্রিতা যে কথা বলেছিলেন, তা বিশ... করতে ইচ্ছে হয়। মা সেদিন আমাকে ধরে রাখতে পারেন নি। পারা সম্ভব ন... নূরজাহান বেগমও হয়তো সমাধির নীচে থেকে অশ্রুজল ফেলেছিলেন—তাঁর ... প্রিয়জন কাছ ছাড়া হল বলে।

তবু সহ্য হত, তবু সব ভুলে যেতে পারতাম—যদি সে আসত। দিল্লীর দেওয়ান... আমের একটি আসন আলো করার জন্যে সে এখনো আসে নি। হয়তো ভুলে গিয়... আমাকে। নিজের রানী, নিজের সন্তানের স্নেহ-ভালবাসার গণ্ডীর মধ্যে সে আ... হারা। সেখান থেকে ছিট্‌কে এসে সেবারে আগ্রায় সামান্য একটু উত্তেজনার মে... হয়তো অঙ্গুরীবাগে আমার দিকে অমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল, অমন মধুর কথা ... আমার মন হরণ করে চলে গিয়েছিল। এখন আর ওসব কথা মনে নেই।

একলা ধীরে ধীরে কিল্লার শীর্ষে উঠে সাতমিনারের একটি পাশে গিয়ে দাঁড়া... পাশেই যমুনার জল, তাতে গম্বুজ আর মিনারগুলি স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত। উত্তর... দিকে শেরশাহ্-পুত্র সুলেমানের সেলিমগড়ের দুর্গ মাথা উঁচু করে এখনো সাব... করে দিচ্ছে শক্তিশালী মুঘল বাদশাহ্‌কে।

ার যমুনার দিকে দৃষ্টি ফেরাই। এই বারিরাশি এগিয়ে যেতে যেতে আগ্রার
জমহলের পাশে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার মনের ব্যথা কি মায়ের হৃদয় স্পর্শ
রবে না? তিনি কি অস্থির হবেন না তখন? নিশ্চয়ই হবেন। শেষ বিচারের
ন আল্লার কাছে তাঁর প্রথম প্রার্থনা হবে নিজের পুত্র-কন্যাদের জন্যে তাঁর মতো
ম মা-ই যেন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ না করে।

মার বিশ্বাস, আমার মা তাঁর প্রিয়জনদের জন্যে অবিরত অশ্রু বিসর্জন করে
েছেন। তাই চাঁদনী রাতে যখন সমস্ত পৃথিবী হাসে তখন তাঁর সমাধির দিকে
লে মনে হয় এক ফোঁটা অশ্রুজল যেন পৃথিবীর বুকের এক একান্ত কোণে টল্‌টল্‌
াছে।

দলা ছত্রশাল! আমার এত যে ভাবনা, এত যে ব্যথাতুর কল্পনা—সব কিছুই তুমি
 দিতে পারতে যদি আর একবার শুধু আমার সামনে এসে দাঁড়াতে! আর
বার শুধু আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলতে যে সত্যিই তুমি আমাকে
লবাস।

ন্তু এলে না তুমি। এই যমুনার ওপর দিয়ে কত কিশ্‌তী যাতায়াত করছে, কত
মীর-ওমরাহের কিশ্‌তী ঘাটে এসে ভিড়ছে। কিন্তু কই, তুমি তো এলে না।

াৎ আমার চিন্তা ধাক্কা খায়। তীরে এসে একটি কিশ্‌তী লাগে। তার থেকে
বেং লাফ দিয়ে মাটিতে নামে। একটু দূরে হলেও চিনতে পারি তাকে। সে
বার কিল্লার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর খিজরীর দরওয়াজার দিকে যায়।

নো আশা ছাড়ে নি নজরৎ। দারা এখনো নজরৎ সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে
ল আমাকে। সে তো জানে না, এতে ভাবনা-চিন্তার ঠাঁই নেই। মুহূর্তেই এ
 ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

—জাহানারা!

কে উঠি। বাদশাহের কণ্ঠস্বর। কিল্লার ওপরে এই নির্জন স্থানে যে আমি এসেছি
 কথা তাঁকে কে বলল? তবে কি আমার গতিবিধির ওপর অলক্ষ্যে কেউ দৃষ্টি
খছে? কিন্তু কেন? নিজের হারেমে এভাবে নজরবন্দী হবার কী কারণ থাকতে
রে?

—বাদশাহ্‌ এগিয়ে আসেন।

—একলা কি করছ জাহানারা?

—এমনি। নতুন জায়গায় এসে আগ্রার কথা মনে পড়ে।

—আমারও। কিন্তু তোমাকে একটু বেশী বিচলিত দেখছি কদিন থেকে। তাই
তোমার নাজীরকে বলেছি তোমার ওপর দৃষ্টি রাখতে।

সব স্পষ্ট হয়। কিন্তু তবু এ সাবধানতার সংগত কারণ খুঁজে পাই না।
—অবাক্ হলে তো ?
—সত্যিই অবাক্ হয়েছি বাদশাহ্।
—আকবরশাহ্ যখন ফতেপুর সিক্রিতে চলে যান, তখন এক শাহ্জাদী তোম মতো বিমর্ষ হয়ে পড়েন। শেষে ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জ না তৈমুরের রক্তে এ-নেশা ছিল কিনা। তোমার মধ্যে যদি এ-নেশা চাড়া ওঠে ?
—দিক না। মুঘল-শাহ্জাদীরা সংখ্যায় কমে গেলে কারও কিছু এসে যাবে বরং অনেক জটিলতা থেকে অনেকে মুক্তি পাবে।
স্নেহের হাসি হেসে বাদশাহ্ বলেন,—তোমার দুঃখ আমি বুঝি জাহানারা। তো নিজের পথে চল, আমি বাধা দেব না।
পিতার কথায় বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পাই না। তিনি নিরপেক্ষ। বহুদিনের এ প্রথাকে ভাঙতে হলে একমাত্র বাদশাহ্ই উদ্যোগী হয়ে ভাঙতে পারেন। কিন্তু তি উদ্যোগী হতে চানন। বহু আগে রোশনারার সাদির প্রস্তাব করলে দারার মু বাদশাহ্র মনোভাব জানতে পেরেছিলাম। তাই চুপ করে থাকি।
—শোন জাহানারা। আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি ধীরে ধীরে। ভেতরে বাইরে বিরাট সংঘাতের দিন এগিয়ে আসছে। এ সময়ে তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজ শুধু হারেম সামলাতে নয়, দরবারের অনেক ব্যাপারেই তোমার মতামত জা জানা দরকার।
বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি,—আমার মতামত ?
—হ্যাঁ, তোমার বুদ্ধিতে আমার আস্থা রয়েছে। আগেও সেকথা বলেছি।
—বাবা ভুলে যাবেন না আমি পুরুষ নই।
—ভুলি নি। তবু এমন অনেক গুণ তোমার মধ্যে রয়েছে, পুরুষের মধ্যেও যা দুর্লভ মনে মনে আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, আমি চাই না পুরুষের গুণ। বিন্দুমাত্রও না। অণুতে অণুতে নারী হতে চাই। প্রতিটি অণু দিয়ে যাতে আমি নারীত্ব অনুভব করতে পারি।
পিতা তাঁর কথার জের টেনে বলেন,—তাই আজ তোমাকে আমি নতুন উপাধি দিচ্ছি। আজ থেকে তুমি 'বাদশাহ্-বেগম জাহানারা'।
সমস্ত শরীরের রক্ত একসঙ্গে মাথায় এসে ধাক্কা খায়। মাথা ঘুরে ওঠে আম তবে বুঝি ছত্রশাল আমার ভেতরে পুরুষালী ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে ফিরে গিয়েছে আর আসছে না।

ঁকটে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বলি,—আপনার আদেশ শিরোধার্য বাদশাহ্।

শোন বাদশাহ-বেগম, তোমার সুরাট রাষ্ট্রের শাসনকর্তা এবার থেকে তুমি নিজেই ক করবে। সেখানকার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকেও আমি এই মুহূর্তে মুক্ত চ্ছি। আর—

শাহ্ তাঁর হাতের হস্তীদন্ত নির্মিত পেটিকা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন,— । মধ্যে রয়েছে আমার পাঞ্জা। এটি তোমার তত্ত্বাবধানে রইল।

মি অস্থির হই। নিষ্কৃতিলাভের শেষ চেষ্টায় চিৎকার করে বলে উঠি,—এত সব রিত্ব আমার মাথায় চাপিয়ে দিলেন বাদশাহ্, কিন্তু আমার দায়িত্ব? আমার দায়িত্ব নেবে? রা

ষাণ মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বাদশাহ্। অনেকক্ষণ পরে খুব ায় বলেন,—সেটিও তোমার ওপর। দৃষ্টির

তা কি পারব? । না।

পারবে। বাবর পারেন নি? আকবর পারেন নি? আমি পারছি না। তারপর লাম কিসের ইঙ্গিত দিলেন পিতা। পুরুষের মতোই আমাকে অবাধ স্বা লন জীবনকে উপভোগ করার। অথচ নিজের কন্যাকে সেকথা স্পষ্ট করে তে পারলেন না। তিনি বুঝলেন না দেহটাই সব নয়। ভালভাবে জেনেও কি লেন না। দেহটাই যদি সব হত মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর জন্যে বেগম বেগমদের কাছে ছুটতেন। হারেমে বেগমের অভাব হয় নি কারণে নয় তো? সব হত তাহলে যমুনার তীরে তাজমহল শোভা পেত না মহলের দিকে যাই। তাহলে রোশনারা এখনো জলেপুড়ে মরত না। সে বরাবরই স্বা ভেতর দিয়ে ছে দেহটার প্রাধান্য কত বেশী জানি না, তবে নারী চায় ধর্মসিদ্ধ আইনসি চাইতেই শান্ত ভাব। রোশনারা যদি নিজের ঘর পেত তবে তার চেহারার তার তখানি উগ্রতা থাকত কি?

তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ বাদশাহ্-বেগম। অত নীচ মি নই। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি, তোমার যাতে তৃপ্তি তুমি তাই তে পার। কিন্তু তোমার কর্ম যে তোমার রুচির ওপর নির্ভর করবে এ দৃঢ়বিশ্বাস মার আছে।

শাহের এ উক্তি না শুনলে সত্যিই তাঁকে ছোট বলে ভাবতাম। মনে মনে স্বস্তি স্ব করি। তবু অবাধ স্বাধীনতা তিনি যখন আমায় দিয়েছেন, তখন তাঁকে র সন্ধানী দৃষ্টির প্রথম পরিচয় দেবার লোভ সামলাতে পারি না। এখানে র প থেকেই লক্ষ্য করছি, দরবারে শায়েস্তা খাঁ, নজরৎ খাঁ, মীরজুমলা,

আমীন খাঁ সবাই হাজির হচ্ছে অথচ খলিলুল্লা খাঁয়ের আসনটি খালি পড়ে থাকে
গোপনে খবর নিয়ে জেনেছি তিনি সুস্থ আছেন এবং নিয়মিত তাঁকে নগরীর রাস্তা
দেখা যায়।

বাদশাহের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলি,—খলিলুল্লা খাঁয়ের কাছ থেকে কোন
কৈফিয়ত তলব করেছেন কি ?

পিতার শরীরের কম্পন আমার দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি ঢোঁক গিলে আমার দি
চেয়ে বলেন,—কেন বলতো ?

—নতুন জায়গায় এসে এভাবে দরবারে অনুপস্থিত থাকা অমার্জনীয় অপরাধ।

ব হয়তো সে অসুস্থ।

স্নে না। আর আপনি জানেন সেকথা।

নি জাহানারা !

পিত দশাহ্, তাঁর প্রতি আপনার এই দুর্বলতার কি কোন বিশেষ কারণ আছে
প্রথা থেকে আসার পথে তাঁর ব্যবহারে আপনাকে রাগান্বিত হতে দেখেছি
উচ্ছে তো দেখি না।

নিজের দেহকে সোজা রাখবার জন্যেই যেন মিনারের গায়ে হেলান দেন। যমুন
—স্রোতের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকেন। শেষে বলেন,—জাহানারা, অতটা বুদ্ধিম
বিরাট সংঘাতে তুমি নিজেই দুঃখ পাবে।

শুধু হারেম সাম্রাজ্য সম্বন্ধে একবার সচেতন করে দিয়েছেন, তখন তাকে আ
জানা দরকার। দখার চেষ্টা করবেন না। আমি স্বাধীন।

বিস্মিত হয়ে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কোন কথা না বলেই তিনি স্ব
—হ্যাঁ, ন।

. . ভাবতে বসি।

বাদশাহ্-বেগম উপাধি দেবার পরমুহূর্তেই তাঁকে এভাবে আঘাত না দিলে
পারতাম।

কদিন পরেই খলিলুল্লা খাঁয়ের রহস্য আমার চোখের সামনে বীভৎসভাবে উদ্ঘাটি
হল। এভাবে না হলেই ভাল হত। বাদশাহ্ ঠিকই বলেছিলেন—বেশী বুদ্ধিম
হলে দুঃখ পেতে হয়। দুঃখ আমি পেলাম—চূড়ান্ত দুঃখ। আবাল্য-পোষিত
শ্রদ্ধার মিনার যেন মাটি ধসে একদিকে হেলে পড়ল। কবে তাকে আবার
সর্বশক্তি নিয়োগ করে সোজা করে তুলতে পারব জানি না।

সেদিনও অপরাহ্নে দাঁড়িয়েছিলাম কিল্লার ওপরে যমুনা দেখার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে। যমুনার কালো জল ধীরে ধীরে আরো কালো হয়ে উঠছিল। হঠাৎ নজরে পড়ে একটি শিবিকা. চারদিকে ঢাকা তার, খিজরী-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে প্রাসাদে। বিস্মিত হই আমি। জানি, হারেমের কেউ বাইরে যায় নি। কৌতূহল জাগে মনে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসি। চেয়ে দেখি শিবিকাটি দিশেহারা হয়ে প্রাঙ্গণের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বুঝলাম ভেতরের কর্ত্রীর নির্দেশে বাহকেরা বয়ে নিয়ে চলেছে। প্রথমে নহবৎখানার সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপর তাড়াতাড়ি মহতাব-বাগের পাশ দিয়ে দেওয়ান-ই-খাসের সামনে গিয়ে স্থির হয়। শেষে মতিহমল পার হয়ে রঙমহলের কাছাকাছি এসে শিবিকাটিকে মাটিতে নামানো হয়। বাহকেরা স্থানত্যাগ করে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই আমি। রঙমহলের দিকে এগিয়ে যেতে গেলে শিবিকাটি দৃষ্টির আড়ালে পড়বে। সেই মুহূর্তে যে নারী মাটিতে পা দেবে তাকে দেখতে পাবো না। তাই অপেক্ষা করি। শিবিকার পর্দা উঠিয়ে দুটি পা বাইরে বার হয় প্রথমে। তারপর দেহ। চিনতে পারি। সত্যিই চিনতে পারি আমি। চেনার জন্যে মুখখানা স্পষ্ট দেখার প্রয়োজন হয় না। খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগম। কিন্তু কেন? বাদশাহের কাছে আমীরের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য? তবে কি আমার কথা শুনে সত্যিই কৈফিয়ত তলব করেছেন বাদশাহ্? কিন্তু বাদশাহের সঙ্গে একজন আমীরের বেগম এই অদ্ভুত সময়ে কেন দেখা করতে আসবে? অন্য কোন কারণে নয় তো? মানসিক দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে শেষে দ্রুতপদে অনেক কক্ষ পার হয়ে রঙমহলের দিকে যাই। নহরী-বেহেস্ত কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। রঙমহলের প্রকোষ্ঠের ভেতর দিয়ে বাইরে থেকে শব্দ পাই। গেল কোথায় সে? শেষে রঙমহলের ভেতরে চাইতেই চমকে উঠি। চেয়ে দেখি খলিলুল্লা খাঁয়ের পর্দানশীন বেগম খুব তাড়াতাড়ি তার দেহের প্রতিটি পরিচ্ছদ খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে নহরী-বেহেস্ত-এর মধ্যে গিয়ে বসে। তারপর আঁজলা আঁজলা জল তুলে নিজের চোখ-মুখের ওপর ঢালতে থাকে। সে হাসছে—সব পাওয়ার পরিতৃপ্ত হাসি। মুখের ওপর জল ঢালতেই সুযোগ বুঝে আমি চট করে প্রকোষ্ঠের ভেতরে একটি আসবাবের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করি। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। জীবনে কখনো নহরী-বেহেস্ত-এ অবগাহনের সুযোগ হবে না দেখে চোরের মতো আকাঙ্ক্ষা মেটাতে এসেছে।

খলিলুল্লা খাঁয়ের বিবি সত্যিই সুন্দরী। তার নগ্ন দেহ-বল্লরী দেখে আমার মতো নারীরও ঈর্ষা হয়। অপেক্ষা করি, স্নান শেষের জন্যে। কিন্তু তার আগেই এক হাস্য কাণ্ড ঘটল।

২৬মহলের একটি দ্বার দিয়ে স্বয়ং বাদশাহ্ প্রবেশ করেন। তাঁ খালি পড়ে থাবে
বর্ণের আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছিল। দারুণ উত্তেজিত হই আমি তাঁকে নগরীর রাস্ত
দেখে ফেলবেন খলিলুল্লার বেগমকে। তারপর যে কি ঘটবে
দিয়ে ওঠে। কাছ থেকে কো
বাদশাহ্ বড় একটা এখানে আসেন না। তিনিও নিশ্চয় আমার মতে
দেখেছেন।
বাদশাহ্ এগিয়ে আসছেন। খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগম কিন্তু নির্বিকার। কোনদি
খেয়াল নেই তার। আগের মতোই জল নিয়ে খেলা করছে। বাদশাহ্ একেবা
কাছে দাঁড়ান। তাঁর মুখে যেন হাসির আভাস।
খলিলুল্লার বেগম তাঁকে দেখতে পেয়েই জল থেকে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ
ঝুলতে থাকে। সব স্পষ্ট হয়ে যায় আমার কাছে। বুকের ভেতরে হাতুড়ির আঘাত
চোখ মুখ কান লজ্জায় রাগে পুড়ে থাক্ হয়ে যায়।
বাদশাহ্ ধীরে ধীরে তাঁর পাদুকা খুলে জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসেন। খলিলুল্লা
বেগম নাচতে নাচতে তাঁর কোলের ওপর বসে।
শয়তানী হাসে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। বাদশাহের কোলের ভেতরে তার দেহখা
সাপের মতো কিল্‌বিল্ করে। শেষে জলের মধ্যে শব্দ হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ সমে
জলের মধ্যে নেমে পড়ে বাদশাহ্। অগভীর নহরী-বেহেস্ত।
এ সময়ে আল্লা যদি আমার চোখে ঘুম এনে দিতেন বড় ভাল হত। কিন্তু তা দিবে
না। নিজের দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।
মমতাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব আর বাদশাহের ওপর নেই। আগ্রা ছেড়ে আসার স
সঙ্গে সে প্রভাব ফিকে হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গিয়েছে। নইলে এ নোংরামি
মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন না বাদশাহ্। নিজের বেগম রয়েছে তাঁর। তা
যত খারাপই হোক মানবী। মন ভোলাতে সাময়িকভাবে যেটুকু অভিনয়ের প্রয়োজ
তারাও জানে। হয়তো খলিলুল্লার বেগমের চেয়ে ভালই জানে। কিন্তু বাদশা
পরীক্ষা করে দেখেন নি। তিনি চেষ্টাই করেন নি। এই বয়সে নতুনত্বের মো
ভুলেছেন। সর্বনাশ ডেকে আনছেন।
এই জন্যেই মা হয়তো শেষ চেষ্টা করেছিলেন আমাদের আগ্রায় ধরে রাখতে। পারে
নি। মৃতার পক্ষে পারা সম্ভব নয়। মা বুঝতে পেরেছিলেন আগ্রা ছাড়ার পথে বু
শাহজাহানের পতন। এতো পতনই। এই পতন ধীরে ধীরে আরও কালিমা
ডেকে আনবে কে জানে। নরীর
ইচ্ছে হচ্ছিল, মাথা তুলে একবার বাদশাহ্‌কে চিৎকার করে বলি,—দেখ

।দিনও অপরাহ্নে ানার হাতে আপেলের গন্ধ আছে কি না ! খলিলুল্লার বেগমের ত্বকের ়য়। যমুনার কসর সুঘ্রাণ নষ্ট হয়েছে। আপনার হাত দূষিত। নহরী বেহেস্ত-এর ড় একটি শিবিকা। জলও আর আপনার হাত পরিষ্কার করতে পারবে না।

স্মিত হই আমি।. মর। আপন মনে বিড়বিড় করি। পাগলারা যেমন করে।

ড়াতাড়ি নীচেভাবে ছিলাম জানি না। শেষে এক সময়ে মুখ তুলে দেখি রঙমহল নির্জন। া চলে গিয়েছে ওরা। কখন গিয়েছে বুঝতে পারি নি। বাইরে এসে দেখি শিবিকা নেই।

পরদিন সকালে বাদশাহের সামনে গিয়ে বলি,—এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি বাবা।

—স্বপ্ন ?

—হ্যাঁ।

—সে তো অনেকেই দেখে। বলার কি কারণ ঘটল ?

—স্বপ্নটা অদ্ভুত বলেই আপনাকে বলতে এলাম। অনেক স্বপ্ন নাকি আমার সত্যি হয়। এটি সত্যি হলে সমূহ বিপদ।

—বল শুনি।

অনেক চেষ্টায় তৈরি করা কল্পিত কাহিনী বলতে শুরু করি,—দেখলাম জুম্মা মসজিদে গিয়েছি আমি। নির্জন মসজিদে কেউ কোথাও নেই। একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল,—জাহানারা। চমকে চেয়ে দেখি চারদিকে নির্জন। গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে। আবার শুনি,—ভয় নেই। আমি খোদাতাল্লা। শুনে ম শান্তিতে আমার মন ভরে ওঠে। প্রার্থনার ভঙ্গীতে মাটিতে বসে পড়ি। তিনি বলেন,—নহরী বেহেস্ত-এর জল দূষিত হয়েছে।

বাদশাহ্ আমাকে থামিয়ে ভীত কণ্ঠে বলে,—সে কি ?

—আমি যা শুনলাম তাই বলছি বাবা। আল্লা বললেন,—মুঘল-হারেমের বাইরের এক শয়তানী ওতে অবগাহন করেছে, পাপ করেছে।

বাদশাহ্ চিৎকার করে ওঠেন,—আর কি বললেন আল্লা ?

শান্তভাবে বলি,—আমি আরও জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, আর কিছু আপাতত তিনি বলবেন না। তাতে নাকি আমি দুঃখ পাব - আত্মহত্যা করব। আর আমি আত্মহত্যা করার পরদিন নাকি আপনার পতন।

বাদশাহ্ আমার হাত ধরে কাকুতি করেন,—জাহানারা, তুমি আত্মহত্যা করো না।

—না বাবা, আমি আত্মহত্যা করব না। তা ছাড়া সব কথা তো আল্লা আমাকে

বলেন নি। তেমন সময় এলে বলবেন। সব শোনার জন্যেও বেঁচে থাকতে হবে আমাকে।
—আমি আজই রঙমহলের চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করছি। বাইরের কেউ যাতে আর এদিকে না আসতে পারে।
—তাই করুন। আপনার আপেলের গন্ধ ঠিক আছে তো?
—দেখতো, দেখতো। তিনি সাগ্রহে হাত এগিয়ে দেন।
নাকের কাছে হাত এনে তার আড়ালে হাসি গোপন করি। তারপর বলি,—ঠিকই আছে।
ঘরের বাইরে আসি। বাদশাহ্ স্থাণুর মতো বসে থাকেন। বুঝলাম আরও কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকবেন তিনি।

রাজা!
হ্যাঁ, কোন ভুল নেই।
বুকের ভেতর লাফিয়ে ওঠে। দরবারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজা। কিন্তু এলো কখন? কোন সংবাদই তো পাই নি। হয়তো কয়েক দিন আগেই এসেছে—হয়তো আজই চলে যাবে। দারার ওপর অভিমান হয়। আজকাল সে কেমন যেন তফাতে সরে গিয়েছে। আগ্রার সেই স্নেহের বন্ধন অনেক আলগা হয়েছে।
রাজাকে কিভাবে সংবাদ দিই? আমি যে অনেক দূরে। কি করি? শেষে নাজীরকে ডাকি। সে এসে দাঁড়ায়। দারাকে খবর দিতে বলি। দরবারে যাবার আগে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।
একটু পরে সে এসে বলে, দারা অনেক আগেই বাইরে চলে গিয়েছে। নাদিরা বলেছে, সে দরবারে যাবে না। জ্যেষ্ঠ পুত্রই বটে। আমি বাদশাহ্ হলে অমন ছেলেকে এই মুহূর্তে নাকচ করে দিতাম। আওরঙজেব আর যাই হোক, সে কৌশলী; সে কর্মঠ, সে সংযত। মুরাদ যত নেশাই করুক, সে বীর, সে যোদ্ধা। সুজাও ভাল। দারার আলস্য আর খামখেয়ালীপনা তার পাণ্ডিত্যকেও হার মানিয়েছে। আজকাল সে সময়ে-অসময়ে নগরীতে চলে যায়—জানি না কেন। নাদিরাকে প্রশ্ন করলে তার মুখ ম্লান হয়ে ওঠে। সে নির্বোধের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।
নিজের কক্ষে গিয়ে বাদশাহ্‌কে চিঠি লিখি। মাত্র দুই ছত্রের চিঠি। সুরাটের শাসন ব্যাপারে আমি বুন্দীরাজের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। দরবার শেষে তিনি যেন আমার সঙ্গে ঝরোকার সামনে দেখা করেন।

নাজীরের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলি, দরবারে পৌছে দিতে। কে বসরে আমিও গিয়ে ঝরোকার আড়ালে দাঁড়াই। আমার ভয় হয়, পাছে বাদশাহ্ সবার সামনে জোরে আমার চিঠিটি পাঠ করেন। নজরৎ শুনলে জ্বলে উঠবে।

চিঠিখানা বাদশাহের হাতে পৌছায়। তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই সেটা তাঁর হাতের মধ্যে রেখে দেন। তাঁর মুখভাবের কোন বৈলক্ষণ্য দেখলাম না। রাগ হয় আমার। যদি তাঁর মুখে মৃদু হাসিও দেখতে পেতাম, মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যেত। কিন্তু এ যেন চূড়ান্ত অবহেলা। উপাধি দিয়েছেন তিনি আমাকে 'বাদশাহ্-বেগম', অথচ আমার এই কাজ তাঁর কাছে যেন ছেলেমানুষী। আজই তাঁর সামনে উপাধি ত্যাগ করার মনস্থ করি। ওই তো বসে রয়েছে আমার রাজা। আর সবার রূপ ওর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। ও যদি আমাকে ভালবাসে তাহলে বাদশাহ্-বেগম কেন, শাহ্জাদীও থাকতে চাই না।

—বেবাদল খাঁ। বাদশাহের গুরুগম্ভীর উচ্চারণ শুনি।

বিস্মিত হই। মণি-মাণিক্য-জহরৎ-এর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বেবাদল খাঁ। বাদশাহের সমস্ত ঐশ্বর্য তার মুঠোর ভেতরে। সাধারণত কোন বড় রকম যুদ্ধ ছাড়া বেবাদল খাঁ কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত কারও ডাক পড়ে না। হ্যাঁ, ডাক পড়েছিল একবার। তাজমহল নির্মাণের সময়। কিন্তু আজ বেবাদল খাঁকে তলব কেন? কোন রকম সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে কি? কিন্তু বাদশাহ্ তো আমাকে জানান নি। এখানেও বোধ হয় সেই অবহেলা। যত বুদ্ধিমতীই হই না কেন, আমি নারী। তাই যুদ্ধের ব্যাপারে আমার পরামর্শের প্রয়োজন হয় নি।

বেবাদল খাঁ কাছে এসে দাঁড়ায়।

—কত সোনা রয়েছে ভাণ্ডারে?

—কত আপনার প্রয়োজন বাদশাহ্?

—একলক্ষ তোলা।

সমস্ত দরবারে একই সঙ্গে বিস্ময়-সূচক-শব্দ ওঠে। আমিও অবাক্ হই। এত সোনার হঠাৎ এমন কি দরকার পড়ল?

—শুধু সোনা নয়, হীরা চুনিও লাগবে।

একজন আসন ছেড়ে উঠে বলে,—জাহাঁপনা।

বাদশাহ্ হাত তুলে ইশারায় তাকে বসতে বলেন,—সব বলছি। দেশে যখন কোন অশান্তি নেই তখন আর একটি অত্যাশ্চর্য জিনিস তৈরিতে আপত্তি আছে আপনাদের?

নজরৎ খাঁ বলে,—কী সেই অত্যাশ্চর্য জিনিস যার জন্যে এত সোনার প্রয়োজন?

—তক্ত-তাউস! —আমার মনের মতো একটি তক্ত-তাউস। থাকতে হবে তার জন্য এত অপব্যয়!

বাদশাহ্ গম্ভীর হয়ে বলেন,—নজরৎ, এত দেখেও মুঘল-ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তোমার কেউ ধারণা জন্মায় নি। বেবাদল খাঁ—

—জাহাঁপনা।

—কোষাগার কি একেবারে শূন্য হয়ে যাবে?

—না জাহাঁপনা। সামান্য একটা অংশও ব্যয় হবে না।

বাদশাহ্ হাসেন। বলেন,—শুনলে নজরৎ খাঁ।

—আমায় মাফ করবেন জাহাঁপনা।

—বেবাদল খাঁ, তোমারই ওপর ভার দিলাম। এটি ভারতবর্ষ। এ দেশের আসল পাখি হল ময়ূর। আমি হিন্দুদের মতো সিংহাসন চাই না—আমি চাই ময়ূরাসন।

—জো হুকুম।

—তোমাকে এবারে একটি ভাল জিনিস হাতছাড়া করতে হবে।

বেবাদল খাঁ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—ইরানের শাহ্ বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে যেটি দিয়েছিলেন।

বেবাদল খাঁ চোখ দুটো বড় বড় করে প্রশ্ন করে,—পদ্মরাগ মণি? সেটি বাইরে আনবেন?

—হাঁ। ভাল জিনিস সবাই যদি না দেখল, তবে থেকে লাভ কি? আল্লা ওটি রাজার হাতে দিয়েছিলেন সবার চোখকে তৃপ্তি দেবার জন্যে।

হঠাৎ দেখি রাজা উঠে দাঁড়ায়। তার মুখে হাসি। আমার মনের ভেতরেও হাসিতে ভরে যায়।

এছত্রশালের বক্তব্যটি কি?

—জাহাঁপনা, পদ্মরাগ মণি আপনার ময়ূরাসনকে অলঙ্কৃত করুক ক্ষতি নেই। কিন্তু চোখকে তৃপ্তি দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে আর একটি জিনিসও জাগায় মানুষের মনে।

কী সে জিনিস?

—হিংসা ও লোভ। পরিণামে অশান্তি।

—আশা করি দরবারের কারও মনে তেমন কিছু জাগবে না।

রাজা দুষ্টু হেসে বলেন,—হলপ করে তা কি বলা যেতে পারে?

—তোমার মনে?

—আমার কথা আলাদা জাহাঁপনা। প্রাণহীন কোন রত্ন মহামূল্যবান হলেও আমাকে চঞ্চল করতে পারবে না।

নাজীরের হৃদয়ে ছম্ করে ওঠে। রাজার এ কথার কি গভীর কোন অর্থ আছে? গিয়ে ঝরোকা জোড়া। সে ঝরোকার দিকে এভাবে চাইছে কেন? সে ঠিক বুঝতে পারছে আমি এখানে রয়েছি কি না।

নজরৎ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রাজার দিকে ঘুরে বলে,—এর অর্থ কি দাঁড়ায় ছত্রশাল? আপনি ছাড়া আমরা সবাই হিংসায় জ্বলে মরি?

—ছি ছি খাঁ সাহেব। নিজেকে অত ছোট ভাবেন কেন? আপনার দৃষ্টিও যে অনেক উঁচুতে, অন্তত আমি সেকথা জানি।

নজরৎ-এর চোখে সন্দেহের ছায়া নামে। সে রাজার দিকে বার বার আপাদমস্তক চেয়ে তার কথার অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করে। সে আর যাই হোক, বোকা নয়। কিন্তু এখন চালাক হয়েও কিছু করার নেই। তাই মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে তার আসনে বসে পড়ে।

দরবারের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়। ময়ূরাসনই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। বাদশাহের অনুমতি নিয়ে এক সময়ে সবাই ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করে। বাদশাহ্ নিজেও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আমি রাজার দিকে চেয়ে থাকি। সে তার আসনে বসে রয়েছে তখনো। নজরৎ উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে দেখে আবার বসে পড়ে। গা জ্বালা করে আমার।

বাদশাহ্ সামনের দিকে চেয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর হাতের মুঠোয় আমার চিঠিখানা। হয়তো ভুলে গিয়েছেন সেটির কথা। ওমরাহ্‌রা তাঁকে অপেক্ষা করতে দেখে ফিরে চাইতেই, ইশারায় তাদের চলে যেতে বলেন। শূন্য দরবার-কক্ষে শুধু দুজনা বসে থাকে। নজরৎ আর রাজা।

বাদশাহ্ তাদের বলেন,—বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি?

—না জাহাঁপনা। নজরৎ খাঁ জবাব দেয় প্রথমে।

—ছত্রশাল?

—শাহ্‌জাদা দারাশুকো অপেক্ষা করতে বলেছেন আমাকে। সংগীতচর্চা হবে একটু।

—তবে তুমি অপেক্ষা কর। নজরৎ, তুমি যেতে পার। কাল তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ পরামর্শ আছে।

—পরামর্শটা যদি আজ—

—না, না। আজ আমি বড় পরিশ্রান্ত।

নজরৎ-এর মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে বলে,—সংগীত জিনিসটা শিখতেও চেষ্টা করলাম না কোনদিন। বড় আফসোস হয়।

বাদশাহ্ হো হো করে হেসে ওঠেন। রাগ ভুলে আমি নিজেও হেসে ফেলি। ভাগ্যিস্

শব্দ হয় নি।

হাসতে হাসতে বাদশাহ্ বলেন,—এখন আর আফসোস করে কি হবে নজরৎ।

আমাকেও তাহলে আফসোস করতে হয়।

—একটু শুনে যেতে পারব না জাহাঁপনা?

—না। বেরসিক লোক উপস্থিত থাকলে, রসিকদের রসগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মায়।

নজরৎ রাজার দিকে জ্বলন্ত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাইরে চলে যায়।

বাদশাহ্ ডাকেন,—ছত্রশাল।

—জাহাঁপনা।

—রাজা বাদশাহের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে একটু অবাক্ হয়েছে।

—হাতের মুঠো থেকে চিঠিখানা বার করে রাজার দিকে বাড়িয়ে দেন পিতা। আর সেই মুহূর্তে আমি নহরী বেহেস্ত-এ খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগমের সঙ্গে নোংরামির কথা —জো ভুলে যাই। ইচ্ছে হল শাহানশাহের দুই পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ি। নিজেকে —বেশী বুদ্ধিমতী বলে মনে করি আমি। শাহানশাহ্ নিজেই আমার মনে এ অহঙ্কার সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। কিন্তু তিনি কতবড় কৌশলী, আজ তাঁর কার্যে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। দেশে যুদ্ধ নেই, বড় রকমের অরাজকতা নেই। সারা ভারতে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছে। শান্তি সবাই চায়। তাই ভাল লাগে এ অবস্থা। কিন্তু আমার মনে হয়, এই নিশ্চিন্ততা শাহানশাহ্ শাহজাহানের বুদ্ধি আর প্রতিভার একটা বড় দিক-নেপথ্যে রেখে দিয়ে গেল। শাহানশাহ্ নিজেও হয়তো বুঝেছেন একথা। তাই ঐতিহাসিকরা যাতে তাঁর কথা দুই পৃষ্ঠায় শেষ করে না দিতে পারে সেজন্যেই ময়ূরাসন, কিল্লাই মুবারকও সেজন্যে, সেজন্যে জুম্মা মসজিদ। তাজমহলকে এই পর্যায়ে টেনে আনতে মন সায় দেয় না।

পিতা চলে যান। যাবার সময় ঝরোকার দিকে একবার চেয়ে যান।

দরবারে একমাত্র ব্যক্তি আমার রাজা। তেমনি বসে রয়েছে। অনড় নিস্পন্দ।

আঃ, বড় অদ্ভুত মানুষ তো? নড়ছে না কেন? এদিকে আসছে না কেন? মজা দেখছে নাকি? ঝরোকার পেছনে আমি ছটফট করছি—খুব ভাল লাগছে ওর।

পাথরের জালের গায়ে মুখ লাগিয়ে ডাকি,—রাজা!

নিজের স্বর নিজের কানেই বড় করুণ শোনায়। বড় মিষ্টি শোনায় যেন। এভাবে ডাকলে কি পুরুষ সাড়া না দিয়ে পারে?

কিন্তু তবু যে বসে রয়েছে। আমার ডাক তার কানে গিয়ে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।

—রাজা। চোখ দিয়ে আমার জল বার হয়। কিছুতেই সামলাতে পারি না।

আসন ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে আসে ও। ভারী পায়ের শব্দে স্তব্ধ দরবার-কক্ষ কম্পিত।
—শাহ্‌জাদী।
—রাজা।
—সুরাটের শাসন ব্যাপারে?
—না, না। বুঝতে পার না?
—এখন বুঝলাম। আমার ধারণা ছিল শাহ্‌জাদীদের মন প্রতিমুহূর্তে বদলায়।
—আঙ্গুরীবাগে দেখা হবার পরেও।
—হ্যাঁ।
—তবে আর কিছু বলার নেই আমার।
শরীরের সমস্ত শক্তি যেন অন্তর্হিত হয়।
—রাগ করো না জাহানারা। আগ্রায় অঙ্গুরীবাগের সেই কয়েকদিনের সন্ধ্যা পা হয়েছে। ভেবেছিলাম মুঘল-হারেমে বাস করে সে-সন্ধ্যার স্মৃতি বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।
—ভুল ভেঙেছে রাজা?
—হ্যাঁ। অনুতাপ হচ্ছে এখন। তোমার কাছে কী ভাবে ক্ষমা চাইব ভেবে পাচ্ছি না।
দুষ্টু বুদ্ধি জেগে ওঠে মনে। বলি,—যে ভাবে আমি বলব। রাজী?
—রাজী।
—বেশ তবে মহতাববাগে যাও।
—সেখানে অন্য কেউ নেই?
—না। আর সবাই হায়াত-বক্স-বাগে।
—তুমি এখনি আসবে?
—একটু পরে।
রাজা চলে যায়।
নিজের কক্ষে গিয়ে ভাবতে বসি, কোন্ সাজে সাজব। এতদিনের গোপন প্রতীক্ষায় আমার স্নায়ুগুলের ওপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলছিল আজ তা নেই। স্নায়ুগুলি শিথিল যেন। রাজা মহতাববাগে বসে আছে জেনেও সাজসজ্জা করতে অবসাদ অনুভব করি। অথচ রাজার কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বিন্দুমাত্র কমে নি। শেষে অতি সাধারণভাবে নিজেকে সাজিয়ে মহতাববাগে প্রবেশ করি।
আজ আর এক সন্ধ্যা। এ সন্ধ্যায় দূরে তাজমহল শীর্ষ দেখা যায় না। দিগন্তের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চোখে পড়ে খোয়াবগাহ্। মাঝখানে নহবৎখানা রিক্ত অবস্থায়

দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহানশাহ্‌, শাহজাহানের জন্মদিনের অপেক্ষায়। সেদিন ওই নহবৎখানা থেকে ভেসে আসবে সুমধুর তান। সে তানের ঝংকার আজ আমার মনের মধ্যে। নহবৎখানার প্রয়োজন নেই।

তবু এমন একটি বিশেষ দিন আগ্রাতে হয়তো আরও ভালভাবে উপভোগ করতে পারতাম। সেখানে যে মমতাজ বেগম রয়েছেন, আর রয়েছেন বেগম নূরজ'হান।

নির্জন মহতাববাগের নির্জনতম স্থানে রাজার সাক্ষাৎ পাই। সামনে দাঁড়াতেই সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে। নতুন করে ভুলে যাই যৌবনের পথে আমি বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছি। আমি যেন কিশোরী—যৌবন উঁকি দিচ্ছে আমার জীবনে। মুখ নীচু হয়ে যায়।

—শাহ্‌জাদীর এই বেশ ?

—শাহ্‌জাদী নই আমি।

—তবে ?

—আমি শুধু—

—কি ?

ওর সামনে বসে, ওর উরুদেশে মুখ রেখে বলি,—জানিনে।

ধীরে ধীরে আমার একটি হাতে সে তার নিজের হাতে তুলে নেয়। কী তীব্র সুখ। শুধু পুরুষের দেহের সংস্পর্শে কি এত সুখ সম্ভব ? যদি সম্ভব হয়, তবে বুঝব রোশনারা ঠিক পথেই চলছে। মুঘল-হারেমের কোন কালের কোন শাহ্‌জাদীই তবে ভুল করে নি।

রাজার হাতের আঙুল আমার আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরে। আমার শরীর যেন অবশ হয়ে যায়।

—এ কি বিরহের বেশ জাহানারা ?

আমার দুই চোখে বন্যা আসে। তবু তার ঝাপসা মুখের দিকে চেয়ে বলি,—আর অভিনয় নয় রাজা।

রাজার মনের মুখোশ মুহূর্তে খুলে পড়ে। সে আগ্রহভরে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চেপে ধরে। মুখে কথা নেই। তারও নয়, আমারও নয়। সব কথা তখন শিরায় শিরায়—বুকের ওঠা-নামায়।

মুদ্রিত নয়নে রাজার ওষ্ঠের সহস্র স্পর্শ অনুভব করি আমার সর্বাঙ্গে। এই কি বেহেস্ত ? গুলরুখবাঈকে রক্ষা করার চেষ্টায় যে আগুনের ছোঁয়াচ অনুভব করেছিলাম দেহের ওপরে, তার চেয়েও তীব্রতর আগুন আমার দেহের মধ্যে। কিছুতেই নিজেকে রাখতে পারিনে। একি হল! কি করব এখন ? কোথায় যাব ? আমি কি পাগল

য়ে গেলাম ? নইলে এমনভাবে আমার নখের আঘাতে রাজার দেহ ক্ষতবিক্ষত রছি কেন ?
ীষণ ভয় পেয়ে যাই। চিৎকার করে উঠি,—আমাকে বাঁচাও রাজা।
বলীলাক্রমে রাজা আমাকে নরম ঘাসের ওপর শুইয়ে দেয়। কানে আমার ঝঙ্কৃত য় রাজার অসংলগ্ন অতি সুমিষ্ট কথা। নিমীলিত চোখে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে াজার অপরূপ মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে। হে আল্লা, এই মুহূর্তে পৃথিবীকে ধ্বংস করে াও—
প্নের ঘোরে নিজের কক্ষে ফিরি আমি অনেক রাতে।
াজীর আমার রাতের খাবার আগলে নিয়ে বসে ছিল। তাকে বাইরে যেতে বলি। জ্জ্বল আলোয় তার সামনে যেতে সংকোচ হয়। ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় া। শাহ্‌জাদীদের পদস্খলন দেখাই যেন ওদের কাজ। কিন্তু আমি পৃথিবীর সামনে ুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি, এ আমার পদস্খলন নয়। এ যদি তাই হয়, তবে াদশাহের সঙ্গে মমতাজ বেগমের সম্বন্ধও পদস্খলনের নজীর। তবু জগৎ বড় কঠিন াই। শাহ্‌জাদী হয়ে শাস্তির ভয় না থাকলেও সমালোচনার ভয় আছে—যে মালোচনা ধীরে ধীরে পক্ষ বিস্তার করে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়তে পারে, অথচ া ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

ক যেন রটিয়েছে দিল্লীতে এসে বাদশাহের শরীর একেবারেই সুস্থ যাচ্ছে না। তারপরই আমার বিদেশের তিন ভাই-এর কর্মতৎপরতা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠি। ুজা তার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের দু'চারজনকে দিল্লীতে রেখে দিয়েছে। মুরাদও তার লাক রেখেছে এখানে। আর আওরংজেব তার অনুচরকে নিয়মিতভাবে দরবারে াসন গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। রোশনারাকে কৌশলে প্রশ্ন করে জানতে ারলাম মীরজুমলার ছেলে আমির খাঁ দিল্লীর নাগরিকদের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চলেছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে। রাগে দুঃখে আমি অভিভূত হই।
ুঘল-বংশের সেই একই নাটক পুনরাভিনীত হবে সন্দেহ নেই। রক্ত! তক্ত-তাউসের জন্যে রক্ত। কেউ ছাড়বে না। দাক্ষিণাত্যের 'জৌন্দাপীরেরও' মনের রসনা থেকে লালা নিঃসৃত হচ্ছে। সেই লালা বিষাক্ত। তাতেই আমার সব চাইতে ভয়। দারা যদি একটুকু রাজনীতিজ্ঞ হত, কিংবা আমি যদি পুরুষ হতাম, তবে জৌন্দাপীরের জন্যে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হতাম না। কিন্তু আমি নারী। হারেমের বাইরে আমার ক্ষমতা বেশীদূর বিস্তৃত হতে পারে না। পারত, যদি রাজা দিল্লীতে

বরাবরের জন্যে থাকত।। কিন্তু তাকে নিজের রাজ্য বুন্দী ছেড়ে এখানে থাকতে বলতে পারি না। তবু কোন কোন মনসবদারের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে, কোন কোন সামন্তকে উচ্চ সম্মান দিয়ে, কয়েকজন বিদেশী রাজ্যের রাষ্ট্রদূতদের অযথা জাঁকজমকের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে জীন্দাপীর আওরঙজেবের সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার অনেক অংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম। তাই কিছুদিনের মধ্যেই তার কাছ থেকে পত্র পেলাম : তোমাকে যদি আমি পরামর্শদাতা হিসাবে পেতাম তাহলে আমি পৃথিবী জয় করতে পারতাম। কিন্তু সহজে পাব না জানি। কারণ আমার প্রতি তোমার স্নেহের অংশ বড়ই কম। তাই আল্লার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি তোমাকে নারী করে পাঠিয়েছেন।

আবহাওয়া যখন এই রকম ঠিক সেই সময়ে এক সন্ধ্যায় নাদিরা ছুটে আসে আমার কক্ষে। তার চোখ-মুখের চেহারা দেখে আমি আতঙ্কিত হই। কিছু বলার আগেই সে পালঙ্কের ওপর আছড়ে পড়ে বুকভাঙা কান্না কেঁদে ওঠে।

চমকে উঠি আমি। দারা? সুলেমান? সিপার? জানি না কার কি হল।

—কি হয়েছে নাদিরা?

কথা বলে না সে। তেমনি কেঁদে চলে। শয্যার একটি অংশ একেবারে ভিজে যায়, তবু কথা বলে না সে। বার বার নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

উদ্বেগে আমি ছট্‌ফট্‌। তাকে বলি,—এভাবে কেঁদে চললে তো কিছুই হবে না নাদিরা। কি হয়েছে বল। যদি প্রতিকার করার থাকে করতে হবে তো?

সে হাত নাড়িয়ে জানিয়ে দেয়, কিছুই করার নেই।

এবারে সত্যি সত্যিই ভয় পাই আমি। তবে কি চূড়ান্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেল? কী এমন দুর্ঘটনা যা শুধু নাদিরাই জানল?

কঠিন স্বরে বলে উঠি,—চুপ কর নাদিরা। যদি শুধু কাঁদতেই চাও, নিজের ঘরে গিয়ে কাঁদো। আমি এসব পছন্দ করি না।

বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে চেয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলে,—আপনি ছাড়া যে আমার কেউ নেই।

আমার চোখ দুটো ভিজে ওঠে ওর কথার ধরনে। বিয়ের পরদিন থেকেই ওর প্রতি আমার দুর্বলতা। নিজের বোনদের ওপরও হয়তো অত টান নেই।

চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে স্নেহের স্বরে বলি,—বলতে চেষ্টা কর নাদিরা।

একটু চুপ করে থেকে শুধু বলে,—রানাদিল্।

—রানাদিল্?

সে ঘাড় ঝাঁকায়।

—বাঈজী রানাদিল্?

ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে বলে,—হ্যাঁ।

—রাস্তার রানাদিল্?

—হ্যাঁ।

—বাজারের রূপসী রানাদিল্?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে বলে,—হ্যাঁ।

—কি করেছে সে?

—দারাশুকো পাগল হয়েছে।

—কি বললে?

সত্যি কথা। একটুও মিথ্যে নয়। প্রায় নগরে যেত। প্রথম প্রথম খেয়াল করি নি। পরে অস্বাভাবিক বলে মনে হল। শেষে সন্দেহ করতে শুরু করলাম। পেছনে লোক লাগাই। আজ সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

—দারাশুকো রানাদিলের কাছে যায়। রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় যে রানাদিল্, তার কাছে যায় শাহ্জাদা দারাশুকো?

হ্যাঁ। গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায় রানাদিল্। চারণ-কবির গান। সুন্দর গলা। দেখতে আরও চমৎকার। আমার চেয়েও। বয়স অনেক কম।

—বাজে কথা বলো না নাদিরা। দারার এ রুচি হতে পারে না। সে তো শিল্পী—সে এলেমওয়ালা লোক।

—রানাদিল্ও শিল্পী—সুগায়িকা। আমি কিছুই পারি না।

—আর কেউ জানে?

—সবাই জানে, শুধু আমরা ছাড়া। রানাদিল্ যে পথ দিয়ে হেঁটে যায় সে পথে গাড়ি-ঘোড়া যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। শাহ্জাদার হুকুম।

এতদূর?

—রানাদিল্ বাজারের পথে গান গেয়ে চললে আগে সবার চোখে লোভের আগুন জ্বলে উঠত, এখন সেই অগুনতি চোখে জাগে বিস্ময়, জাগে সম্ভ্রম।

—পায়াভারী হয়েছে রানাদিলের, তাই না?

—না। একবিন্দুও পরিবর্তন হয় নি তার। ঠিক আগের মতোই রয়েছে। সবার সঙ্গে কথা বলে। হাসে। শুধু তার রূপ আরও ফুটে বার হয়েছে।

—দারার মতলব কি?

—জানি না। আপনি ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমার কথা বলার

ইচ্ছে নেই।

নাদিরা আর কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলে ধীরে ধীরে উঠে যায়। পেছন থেকে তার দিকে চেয়ে কষ্ট হয় আমার। কত বিশ্বাস, কতখানি স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে সে হারেমে থাকত। আজ থেকে তার সব শান্তি অন্তর্হিত। দিল্লীর আবহাওয়ায় যখন বিপদের সংকেত, অন্য তিন ভাই যখন অতিমাত্রায় কর্মব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে শাহানশাহ্ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র বাজারের নর্তকীর প্রেমে হাবুডুবু। চমৎকার?

দারাকে ডাকালাম। সব কিছু খুলে বলে রাগলাম, কাঁদলাম, অভিমান করলাম। কোন ফল হল না। নাদিরাকে সে ভালবাসে ঠিকই। কিন্তু রানাদিল্‌কে সে ছাড়তে পারবে না। নাদিরা এখন আর তার মনকে আগের মতো সতেজ করে তুলতে পারে না।

দারার মুখে এমন কথা শুনে দুঃখ হল খুবই। আরও দুঃখ পেলাম সে যখন কোর-আনের নির্দেশ তুলে ধরল। কোর-আনে রয়েছে এক সঙ্গে চার বেগমকে রাখা যায়। তাতেও সন্তুষ্ট হল না সে। এ বিষয়ে আবু-বিন-লায়লার ব্যাখ্যাও শুনিয়ে ছাড়ল আমাকে। কোর-আনের নির্দেশ ব্যাখ্যা করে নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন একসঙ্গে উনিশজন বেগমকে রাখা যায়। দারা হঠাৎ এমন খাঁটি মুসলমান হয়ে উঠবে স্বপ্নেও ভাবি নি। কোনদিন যে কিতাব স্পর্শ করে নি সে-ও বোধ হয় নিজের সাদির ব্যাপারে কিতাবী-তত্ত্ব হাতড়ে বেড়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে।

শেষে নিরুপায় হয়ে বাদশাহের কাছে গিয়ে রানাদিল্ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। তিনি হেসে উঠলেন।

তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করি,—বাদশাহের হাসির কি কারণ ঘটল জানতে পারি কি?

রাগ হলে 'পিতা' সম্বোধন না করে এভাবে ঘুরিয়ে কথা বলা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে আজকাল।

বাদশাহ্ হেসে জবাব দেন,—নিশ্চয় জানতে পার বাদশাহ্-বেগম। মুঘল বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের এমন দু-একটা তুচ্ছ কাজকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখার কোন অর্থ হয় না।

—তাই বলে একজন সাধারণ নর্তকী?

—সবার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় বলেই সে সাধারণ। পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে হারেমে রাখলে সে সাধারণ থাকবে না। সে হয়ে উঠবে অসাধারণ।

—দারার বেগম হবে সে?

—বাইরের সমালোচনা বন্ধ করার জন্যে হবে বৈ কি।

—তৈমুর-বংশের বেগম?

—তৈমুর-বংশের এমন অনেক বেগমই ছিল। শোন বাদশাহ্-বেগম। রানাদিল্

নামটা আমার অজানা নয়। সে সাধারণ নয় মোটেই। সে এক দুর্লভ বস্তু।

—আপনি জানেন ?

—দারা ঘন ঘন দরবারে অনুপস্থিত বলে, তার কারণ অনুসন্ধানের গরজ যে আমার।

স্তব্ধ হই। ভেবে পাই না, দারার প্রতি বাদশাহের এটি অন্ধ স্নেহ, না আর কিছু। নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্যেই কি রাতারাতি এমন উদার হয়ে উঠলেন তিনি ? শুনতে পাই, শায়েস্তা খাঁয়ের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক সম্প্রতি আগের মতো নেই। কোন এক বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন।

নিজের কক্ষে এসে চোখের জল ফেলি। মায়ের কথা মনে পড়ে। বড় অসহায় বোধ হয় নিজেকে। আজ যদি মমতাজ বেগম বেঁচে থাকতেন !

নাদিরার অশ্রুসিক্ত চোখের সামনে একদিন রানাদিল্ এসে প্রবেশ করে হারেমে। দারার মুখে কী তৃপ্তির হাসি। নাদিরার দিকে চাইবার অবসরই পায় না সে। আমার বুক ভেঙে যায়। তবু এগিয়ে যাই। বাদশাহ্-বেগম আমি। সংযতভাবে রানাদিল্‌কে অভ্যর্থনা করি। দেখে সত্যিই মুগ্ধ হই। কী নিষ্পাপ চাহনি। কোন খেদ থাকে না। মনে মনে দারাকে তারিফ না করে পারি না। মুহূর্তের জন্যে নাদিরার দুঃখের কথাও ভুলে যাই।

রানাদিল্ ধীরে নাদিরার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে। দারা অপ্রস্তুত। রানাদিল্ নাদিরার মুখের পানে চেয়ে দরদী কণ্ঠে বলে,—আপনাকে দেখেই চিনেছি। এ অবস্থাতেও আপনি সামনে রয়েছেন। অন্য কেউ হলে পারত না।

নাদিরা নীরব।

রাণাদিল্ বলে,—আপনার অধিকার ছিনিয়ে নিতে আসি নি। আপনার অধিকার আপনারই রইল। আমি শুধু একপাশে পড়ে থাকব। এতে শাহ্‌জাদার সময় অনেক বাঁচবে। এতদিন শাহ্‌জাদা বাইরে যেতেন, দরবারে উপস্থিত হবার সময় পেতেন না। আপনার কাছেও আসতে পারতেন না।

নাদিরা ধীরে ধীরে বলে,—আল্লা তোমার মঙ্গল করুন। অধিকার কি কেউ নিজে থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে ? সবই হচ্ছে আল্লার ইচ্ছে। আমি ব্যথা পেয়েছি খুবই। তাই বলে তোমাকে শত্রু বলে ভাবব না কখনো।

রানাদিলের মতো আমার মাথাও এই প্রথম নাদিরার প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা হতে নত হয়।

বাদশাহ্-বেগম আমি। দারাকে ডেকে নিয়ে রানাদিলের কক্ষ দেখিয়ে দিই। তার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। হারেমের একেবারে এক কোণে রাণাদিল্‌কে রাখার ব্যবস্থা করেছি বলে মনে মনে সে ক্ষুণ্ণ মনে হয়েছে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পায় না।

অন্তঃপুরে আমার ওপর কথা বলার অধিকার স্বয়ং বাদশাহেরও নেই।

রানাদিল্ বেগম হল। 'রাস্তার মেয়ে হারেমের বিলাসিতার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। আমিও যেন তৃপ্তি পেলাম। এক ঝলকেই বুঝতে পেরেছি দারার প্রতি মেয়েটির প্রেমে বিন্দুমাত্র ভেজাল নেই। এ প্রেম সে নিজের জীবন দিয়েও রক্ষা করবে। বাদশাহ্ ঠিকই বলেছিলেন—দুর্লভ রত্ন রানাদিল্।

পরদিন দারাকে ঠিক সময়ে দরবারে উপস্থিত হতে দেখে বাদশাহ্ হাসলেন। নজরৎ খাঁয়ের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। রাজা নেই। থাকলে কি করত জানি না। হয়তো হাসত। হাসি নেই শুধু নাদিরা আর রোশনারার মুখে। নাদিরার না হাসার কারণ রয়েছে। কিন্তু রোশনারার চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠল—যেমন হয়েছিল বহুদিন আগে আগ্রায় 'দশ-পঁচিশী' ঘর হাত-ছাড়া হবার সময়ে। নহরী-বেহেস্ত-এ রোশনারার কর্তৃত্ব প্রায় বিলুপ্ত। বেশীক্ষণ আর সেখানে থাকতে পারে না সে। এখন সেখানে দারার সঙ্গে রানাদিলের আধিপত্য।

ইচ্ছে করে এই সব বিলাসিতার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় না রানাদিল্। দু-চারদিন তার সঙ্গে মিশে আমি বুঝতে পেরেছি। খুব সাধারণভাবে থাকতে চায় সে। কিন্তু দারা নাছোড়বান্দা। সে চায় রানাদিল্‌কে অপ্সরীর মতো সব সময় সাজিয়ে রাখতে।

রোশনারা আমার ঘরে এসে ফেটে পড়ে,—যত সব ভিখিরীর আস্তানা।

—কি হল আবার ?

—আজ বাইরে বার হয়ে রাস্তায় যত ভিখিরী দেখব, সব এনে ভরে দেব দারার হারেমে।

—এত রাগ কেন ?

ঝাঁঝিয়ে ওঠে সে,—তুই তো বাদশাহ্-বেগম। শুনি নাকি শাহানশাহের পরেই তোর ক্ষমতা।

—ঠিকই শুনিস।

—অতই যখন ক্ষমতা, তখন নহরী-বেহেস্ত-এ কুষ্ঠরোগীদের স্নানের ব্যবস্থা করে দে।

—সোজা কথা বল্ না রোশনারা।

—রানাদিল্ কি রঙমহলেই পাকাপোক্ত থাকার ব্যবস্থা করেছে ?

—কেন ?

—আর কেউ তো সেখানে যেতে পারে না। যখনি যাই, দেখি গা চুবিয়ে বসে রয়েছে।

—তুই সামনে গেলে নিশ্চয়ই উঠে যেত।

—গা ঘিন্ ঘিন্ করে যেতে।

—কিন্তু ওর রূপ? অস্বীকার করতে পারিস?

রোশনারা চুপ করে থাকে।

—ওই রূপের জন্যে মেহের-উন্নেসা নূরজাহান হয়েছিলেন। ওই রূপের জন্যে আরজমন্দবানু হয়েছিলেন মমতাজ বেগম।

—তাদের পিতৃপরিচয় ছিল—আধিপত্য ছিল।

—ওরও হয়তো রয়েছে। আমরা শুনতে চাই নি।

—আভিজাত্য থাকলে, মরে গেলেও রাস্তার নর্তকী হয় না।

—রোশনারা, কে কখন যে কী হয়, কিছুই বলা যায় না।

একটু সময় গুম্ হয়ে থেকে সে প্রশ্ন করে,—কি ব্যবস্থা করছ?

—কিছুই না।

—আর তাই মেনে নিতে হবে?

—নিশ্চয়ই।

—বেশ।

রোশনারা যাবার জন্যে পা বাড়ায়, ঠিক সেই সময় আমার নাজীর এসে উপস্থিত হয়। সে উত্তেজিত।

—কোন খবর আছে?

—হ্যাঁ, বাদশাহ্-বেগম। ময়ূরাসন নিয়ে এইমাত্র বেবাদল খাঁ দরবারে এলেন। তাজ্জব বনে গিয়েছে সবাই।

রোশনারার রাগ মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়। সে ঝড়ের মতো বার হয়ে যায়।

আমি কিছুক্ষণ বসে থাকি। আজকাল সব কিছুই যেন অকস্মাৎ ঘটে চলেছে—আমি জানার আগেই। ময়ূরাসন আসবে আজ, সে খবরও বললেন না বাদশাহ্। হয়তো তিনি নিজেও জানতেন না। নিয়মহীন এই সৃষ্টিছাড়া অব্যবস্থা সুলক্ষণ নয় মোটেই।

দরবারে ঝরোকার পেছনে হারেম ভেঙে পড়েছে। শাহ্জাদী, বেগম, নাজীর কেউই বোধ হয় বাদ নেই। দরবারের সব কয়টি চোখ ময়ূরাসন ছেড়ে এখন ঝরোকার দিকে। একসঙ্গে একগাদা মেয়ের ভিড়ের স্বাভাবিক আওয়াজ তাদের কৌতূহলান্বিত করেছে।

রোশনারা ঝরোকায় মুখ লাগিয়ে রেখেছে। তার পেছনে রানাদিল্ বেগম। রোশনারা নিশ্চয়ই জানে না রানাদিলের উপস্থিতি। জানলে, ছিট্‌কে বার হয়ে আসত।

রানাদিলের চোখ ময়ুরাসনের দিকে নয়। তার চোখ পাশের স্বর্ণসিংহাসনের দিকে। সবাই জানে ওটি তৈরি হয়েছে শাহ্‌জাদা দারাশুকোর জন্যে—ময়ুরাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী।

রোশনারা মুখ তোলে। রানাদিল্‌কে সরিয়ে সে আমার কাছে আসে। এতই অন্যমনস্ক সে যে দেখতেই পায় না রানাদিল্‌কে।

—কেমন দেখলি রোশনারা ?

—অপূর্ব। তবে আওরঙজেব দেখলে হয়তো বলত বাজে খরচ।

—সে কি বলত, তাতে কিছু আসে যায় না।

—নিশ্চয়ই আসে যায়। তবে ওটির ওপর বসে কাজ চালাতে বোধ হয় আপত্তি হবে না তার।

চিৎকার করে উঠি,—কী বলতে চাস্ তুই ?

—মাথা ঠাণ্ডা রাখো বাদশাহ্-বেগম। শাহানশাহ্ শাহজাহানের পরে ওটি অধিকার করার মতো শক্তি, সাহস আর বুদ্ধি কার রয়েছে সেকথা তোমার অজানা নয়।

হারেমের সব কয়টি নারীর ভীত-চকিত চোখ আমাদের উভয়ের দিকে। আমাকে সবাই ভয় পায়, সমীহ করে। তাই রোশনারার ঔদ্ধত্যে তারা বিস্মিত। তারা ভালভাবেই জানে ইচ্ছে করলে আমি রোশনারাকে বহিষ্কৃত করতে পারি—যদিও সে আমারই মতো শাহ্‌জাদী। শুধু হারেমে নয়, দরবারেরও অনেক সিদ্ধান্ত আমি উল্টে দিতে পারি, সে প্রমাণ তারা পেয়েছে।

কিন্তু আমি কিছুই করলাম না। রোশনারা শাহ্‌জাদী। সবার সামনে তাকে শাস্তি দেওয়া অবমাননা করা। গম্ভীর স্বরে বলি,—ভবিষ্যতে গুণে গুণে পা ফেলো রোশনারা। হয়তো আমার বাক্য, আচরণ কিংবা মুখমণ্ডলে বিস্ফোরণের পূর্বাভাষ ছিল, যার ফলে রোশনারা কোন কথা না বলে মুখ নীচু করে চলে যায়। হারেমের নারীদের মধ্যে সাংঘাতিক কিছু দেখতে না পাওয়ার হতাশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করে। আমি একলা বসে থাকি ঝরোকার কাছে। কিছুই ভাল লাগে না। মনে হয়, অনেক ভুলই করেছি আমি স্বাভাবিক মমতাবশে। সব জমা হচ্ছে। একদিন তার ফল পেতেই হবে। তবু উপায় নেই। মনুষ্যত্বকে বলি দিতে পারি না। পারতাম হয়তো, যদি রাজা আমার জীবনে না আসত।

মহতাব-বাগের মাথার ওপরে নির্মল আকাশ। সেই আকাশের গায়ে সন্ধ্যা না হতেই একখণ্ড চাঁদ উঁকি দিতে শুরু করেছে। যেদিকে তাকাই শুভ্র ফুলের শোভা।

বহুদিন পরে মহতাব-বাগে এসেছি। তাই এত শ্বেত শোভার অকৃপণতায় বিমুগ্ধ হই। এই বাগের একটি ফুলও অন্য রঙের নেই।

আমার হাতে গজমতির পাতা। সেই পাতায় রয়েছে রাজার হস্তাক্ষর। আজই পেয়েছি আমি চিঠিখানি। রাজার এক অতিবিশ্বস্ত অনুচর পৌছে দিয়ে গিয়েছে। খুবই ছোট চিঠিখানি। তবু যেন তার মধ্যে অনেক কিছু লুকানো রয়েছে। যত পড়ি, ততই নতুন নতুন অর্থ বার হয়—ততই বুক উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সেদিনের সেই চিরস্মরণীয় সন্ধ্যার মতো একটা আবেশ অনুভব করি। বুকের ভেতরে চেপে ধরি পত্রখানি।

মুহূর্তের জন্যে ভুলে যাই, আমি বর্তমান যুগের কোন নারী। ভুলে যাই শাহানশাহ্ শাহজাহানের কন্যা আমি। মনে হয় আমি যেন অতীতদিনের সমরখন্দের তৈমুরের কোন দুহিতা। আমার ইচ্ছা পূরণে সহস্র অশ্ব পর্বতশিলা প্রকম্পিত করে দিগ্বিদিকে ধাবিত হয় রাজ্যের সীমার বাইরে কোন শস্যশ্যামলা দেশের দিকে। আমায় সন্তুষ্ট করার জন্যে শত শত বীর তরুণ ছুরিকাঘাতে নিজেদের বক্ষ ক্ষতবিক্ষত করে। আর আমি স্বর্গীয় কানিবুল উদ্যানের গুলবাহার দেখতে দেখতে সে সব কথা ভেবে মনে মনে হাসি। আমি জানি আমার প্রিয়তম কে, আমার হৃদয়ের তক্ত-তাউসে কার স্থায়ী আসন। সে আর কেউ নয়—বুন্দেলা ছত্রশাল।

চমক ভাঙে। চিন্তার অসংলগ্নতায় লজ্জিত হই। প্রতি নারীই এমন অবস্থায় বোধহয় এইরকম চিন্তা করে। বাস্তবজগৎকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। নইলে শাহানশাহ্ শাহ্জাহান নন্দিনী হয়েও কেন আমি কানিবুল উদ্যানের স্বপ্ন দেখলাম। বাদশাহ্ তো তৈমুর-বংশের মধ্যে সব চাইতে ঐশ্বর্যশালী। তাজমহল নির্মাণের কথা অতীতে কেউ চিন্তা করতে পেরেছে কি? তবু—এ সবই রূঢ় বাস্তব। সুদূর সমরখন্দের অতীত দিনের স্বপ্ন মেশানো নেই তাতে।

রাজা লিখেছে শেষেঃ বিন্ধ্যাচলের পরপারে যে দিগন্তরেখা সেখান থেকে উঠে আসছে এক সর্বনাশা ঝড়। জানি না, শাহানশাহ্ সামলাতে পারবেন কিনা।

আমিও বুঝতে পারি। দিল্লী অরক্ষিত। ঝড়ের গতিবেগ রোধ করতে হলে যে সাবধানতা, যে যোগ্যতা প্রয়োজন দিল্লীতে তার নিদারুণ অভাব। তার পরিবর্তে এখানে একদল লোক ঘরের ভিত দুর্বল করে তুলতে তৎপর হয়েছে—সামান্য ঝড়েই যাতে ধসে পড়ে। বাদশাহ্‌কে বলে ফল হয় নি। তিনি দারার ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে শুরু করেছেন। অথচ তিনিই এক সময়ে আমাকে বলেছিলেন, জন্মের কয়েকদিন পরে দারার ললাটে, তিনি জয়তিলকের পরিবর্তে দেখেছিলেন পরাজয়ের মসিরেখা। জ্যেষ্ঠপুত্রের এই দুর্ভাগ্যের চিহ্ন মমতাজের চোখে জল এনে দিয়েছিল।

ভারী গলায় তিনি বাদশাহ্‌কে বলেছিলেন—মুঘল-বংশের গৌরব সূর্য সম্ভবত অস্তমিত হল। তোমাকে আমি সুখী করতে পারলাম না।
আরও অনেক কথাই নিশ্চয় হয়েছে, পিতা হয়ে যা তিনি আমাকে বলতে পারেন নি। কিন্তু আজ সম্ভবত সব তিনি ভুলে গিয়েছেন। কিংবা ভুলে যাবার ভান করেছেন। কারণ দারার প্রতি স্নেহ তাঁর অন্ধ। তাঁর শেষ রক্তবিন্দু থাকতে সাধের ময়ূরাসন অন্য কোন পুত্রকে ছেড়ে দেবেন না। অথচ অতি দ্রুত অশক্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। দুর্ভাবনার সঙ্গে শেষ বয়সের অমিতাচার তাঁকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছে। তাঁর রক্তের মধ্যে ঘুমন্ত যৌবনের নেশা হঠাৎ শেষ বারের মতো জেগে উঠে তাঁর আয়ুকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। বুঝতে পেরেও বড় একটা বাধা দিতে পারি না। মেয়ে হয়ে সেটা সম্ভব নয়। বুঝতে তিনিও পারেন। তাঁর কোন কোন অঙ্গ এক এক সময় অবশ হয়ে যায়। ভীত হয়ে আমায় ডেকে পাঠান তিনি। অসহায়ের মতো তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—দেখতো জাহানারা, আপেলের সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে কি? শুনে চোখে জল আসে আমার। এ অবস্থায় কোন্ পিতাই বা বড় ছেলের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিতে না চায়।

মহতাব-বাগে সন্ধ্যা হয়। চাঁদ আরও ওপর দিকে ওঠে। চাঁদের আলোয় সাদা ফুলগুলি একাকার—তাদের পৃথক্ অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।
হঠাৎ একটু দূরে মৃদু পদশব্দ। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। শব্দ এগিয়ে আসে। গাছের আড়ালে যাই।
একজন স্ত্রীলোক। মুখের বোরখা তার মাথার ওপরে তোলা। তবু চিনতে পারি না দূর থেকে। বুকের ভেতরে চাপা উত্তেজনা অনুভব করি। হারেমের কেউ নয়। কোন নাজীরও নয়। নাজীরদের পরিচ্ছদ এত মূল্যবান হয় না।
আমি ভীত হই। আবার হয়তো কোন নারকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করা হবে আমার সাধের মহতাব-বাগে। কিছু ঘটবার আগেই পালাতে হবে। নহরী-বেহেস্ত-এ খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগমের ঘটনার পর থেকে সব সময়ই আমি ভয়ে ভয়ে থাকি।
স্ত্রীলোকটি আমার খুব কাছেই তৃণের ওপর বসে পড়ে। এবারে তাকে চিনতে পারি। শায়েস্তা খাঁয়ের বেগম। মহতাব-বাগে তার উপস্থিতির কি কারণ ঘটল বুঝতে পারি না। কানে যা আসে তাও কি তবে সত্যি? বাগের মধ্যে এরা সব আসেই বা কি ভাবে? কঠোর শাস্তি দিতে হবে প্রহরীদের। নইলে ওদের অর্থের লোভ কমবে না। আজ আমি একে যে ভাবে দেখছি, দুদিন পরে আমাকেও এর চাইতে খারাপ

অবস্থায় কেউ দেখবে কিনা ঠিক কি? তখন রাজা থাকবে। কী লজ্জা। আড়াল থেকে কেউ সব কিছু দেখছে কল্পনা করলেও আত্মহত্যার ইচ্ছে যাগে।

শায়েস্তা খাঁয়ের বেগমকে প্রহরীরা হয়তো বাধা দিতে সাহস পায় নি। কোন বড় আমীর-ওমরাহের বেগম এসব বাগিচায় আসতে পারে না। তারা সাধারণত যায় শালিমার-বাগে। আজকের ব্যাপারে বাদশাহের কোন সম্মতি নেই তো? বেগমের চঞ্চলতা এবং চারদিকে অস্থির চাহনি দেখে সেই রকমই যেন মনে হয়।

আবার পদশব্দ।

এবারে শায়েস্তা খাঁ। মুখের কুটিল হাসিতে তার ঘৃণা ঝরে। বেগম আঁতকে ওঠে,—তুমি!

—হ্যাঁ, আমি। কত সাধ করে তোমায় সাদি করেছিলাম মনে আছে তো?

বেগম কথা বলে না।

—ঘরের খেয়ে তুমি বাইরে মজা লুটবে, তাই কি সহ্য করতে পারি?

—বাজে কথা বলো না।

চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে অতবড় পুরুষটি,—চোপ্, রহ্। তোমার মতলব বুঝতে আমার দেরি হয় না। আমি খলিলুল্লা খাঁয়ের মতো নিরেট নই।

—বলছ কি তুমি?

—ঠিকই বলছি। বাদশাহের ঠাণ্ডা দেহে যেটুকু উত্তাপ অবশিষ্ট রয়েছে, তুমি তাই উপভোগ করতে এসেছ। তাঁর ছেলের বয়সী আমি—অথচ আমার ফুটন্ত যৌবনে তোমার অরুচি ধরেছে। আমার যে তক্ত-তাউস নেই। তাই না বেগম?

—খাঁ সাহেব, বাদশাহ্ বৃদ্ধ।

—হ্যাঁ, বৃদ্ধ তো বটেই। তাই আমার বিশেষ ভয় নেই।

—তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হয়।

—তোমার দিকে চাইতেও আমার মাথায় আগুন জ্বলে।

আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার পা কাঁপে। খাঁ-সাহেবের কথাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। নহরী-বেহেস্ত-এর ঘটনার পর সবকিছু ঘটাই সম্ভব।

বেগম মাটি ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়ায়। খাঁ-সাহেবের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বলে,—কেন এসেছ তুমি?

—তোমার হাত ধরে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নয়। খলিলুল্লা খাঁয়ের মতো আমার বুকের মধ্যে আশ্রয় দেবার জন্যেও নয়।

বেগম হেসে ওঠে। নিজের হাতের ওপর মাথার বেণীকে আছড়াতে আছড়াতে বলে,—ওসব বড় বড় কথা ঘরে গিয়ে বলো। এটা মহাতাব-বাগ। এখানে তেমন

কিছু করলে খাঁ-সাহেবের অমন সুন্দর মাথাটি ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ে সাদা মহতাব-বাগকে একটু লাল করে দেবে মাত্র।

শায়েস্তা খাঁ মোলায়েম স্বরে বলে,—আকাশে কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছো? পাঁচদিন আগে ঈদ শেষ হয়েছে। আবার ঈদ আসবে। ঈদের পরে মহতাব-বাগের এ-দৃশ্য আরও কত বছর দেখতে পাওয়া যাবে কে জানে।

আমি বিস্মিত হই শায়েস্তা খাঁয়ের কথা বলার ভঙ্গিতে। বেগমও কম বিস্মিত নয়। সে নিশ্চয় ভেবেছে খাঁ-সাহেব ভীত। কিন্তু আমি ভালভাবে চিনি তাকে। সহজে ভীত হবার পাত্র সে নয়।

সহসা কোষ থেকে তলোয়ার টেনে বার করে শায়েস্তা খাঁ। চাঁদের কিরণে খাঁটি ইস্পাত ঝলসে ওঠে। শূন্যে বার-দুই ঘুরিয়ে সে বলে ওঠে,—কিন্তু বেগম সাহেবা, আল্লার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তোমাকে জানাই, এর পরের আর কোন ঈদই দেখার সৌভাগ্য হবে না তোমার। কালকের চাঁদটি কেমন উঠবে তাও দেখবে না।

বেগম আর্তনাদ করে ওঠে।

চোখের সামনে একজন নারীকে হত্যা করা হবে। কয়েক মুহূর্ত বাকী। কি করব ভেবে পাই না। নারীহত্যাকারীদের আমি ঘৃণা করি। অথচ শায়েস্তা খাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি আর সাহসের জন্যে।

সামনে এগিয়ে যাই। ধীরে ধীরে বলি,—খাঁ সাহেব কি তাঁর বেগমকে নির্জনে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন?

কেঁপে ওঠে পুরুষের দেহ। আমাকে সসম্মানে কুর্নিশ করে হেসে খাঁ-সাহেব বলে,—ঠিকই ধরেছেন বাদশাহ্-বেগম।

—কিন্তু এ উদ্যান শুধু হারেমের জন্যে। আপনার বেগম এলেন কি করে? আর আপনিই বা এলেন কেমনভাবে?

অপরাধ হয়েছে বাদশাহ্-বেগম। শাস্তি দিন। আমার ধারণা ছিল সন্ধ্যার পর সাধারণত উদ্যানে কেউ থাকেন না।

—আপনাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারারাতও এখানে কেউ থাকতে পারে। সব কিছু নির্ভর করে শাহ্জাদী আর বেগমের মর্জির ওপর।

—ঠিক বলেছেন। এখনি চলে যাচ্ছি।

—প্রহরীরা আপনাদের দেখে ছেড়ে দিলেও আসার চেষ্টা করবেন না ভবিষ্যতে।

শায়েস্তা খাঁ চলে যায়। তাকে অনুসরণ করে তার বেগম। শুধু আমার জন্যে সে বেঁচে গেল। বেঁচে গেল সারা জীবনের জন্যে হয়তো। কারণ খাঁ সাহেব যত

ঘৃণাই করুক না কেন তাকে, চতুর হলে তলোয়ারের খেল্ আর দেখাবে না তার ওপর।

যা আশঙ্কা করেছিলাম, শেষে তাই হল। বাদশাহ্ শয্যা নিলেন। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ভারতের চারদিক থেকে উঠেছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। রোশনারা অতিমাত্রায় ব্যস্ত। খবর পেলাম মীরজুমলা আর আমিন খাঁয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে সে। আওরঙজেব প্রায় প্রতিদিনের খবরই পাচ্ছে বোধ হয়। ওদিকে গুজরাটে মুরাদের মতো ভালমানুষও রণহুঙ্কার ছেড়েছে। সুজা তো তৈরী। বাঙলাদেশ অনেক দূরে। তাই সে চঞ্চল।

এই অবস্থায় রাজার অভাব অতিমাত্রায় অনুভব করি। আজ যদি সে আমার পাশে থাকত, কোন কিছুতেই বিচলিত হতাম না। দারাশুকো দায়িত্বের সমস্ত বোঝা একা বইতে পারবে কিনা জানি না। সে এখন বাদশাহের সব ক্ষমতাই পেয়েছে—শুধু ময়ূরাসন ছাড়া। হস্তীযুদ্ধের আদেশও সে দিচ্ছে—যে আদেশ বাদশাহ্ ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। আত্মতৃপ্তিতে দারা ভরপুর। রানাদিলের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে সে গর্বিত। কিন্তু এ গর্ব যে কতটা ক্ষণভঙ্গুর, তার মতো বিদ্বান লোক জেনেও, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করছে না। বরাবরের কল্পনা-বিলাসী সে। কল্পনার ঘাড়ে চেপে আরও কতদূর অগ্রসর হবে কে জানে।

দারার হুকুম মেনে চলতে আমীর-ওমরাহ্দের মধ্যে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। খুবই অশুভ লক্ষণ। এ সমস্ত মীরজুমলার কৌশল। ধীরে ধীরে সে কূটনীতির বিষ প্রয়োগ করেছে সবার মনে। দারা বিধর্মী—সে কাফের। এর চাইতে ভাল অস্ত্র আর হতে পারে না।

সব বুঝি। অথচ বিশেষ কিছু করতে পারি না। বাদশাহের মনে বজ্র আর কুসুমের মেলামেশা। দারার মনে শুধুই কুসুম। বজ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন।

মীরজুমলা। পারস্য থেকে এসেছিল একদিন। গোলকুণ্ডার পথে জুতো বিক্রি করত। পাকে-চক্রে শেষে একদিন সে দরবারে স্থান পেল। প্রথম দিনেই লোকটিকে আমার ভাল লাগে নি। বাদশাহ্কে সাবধান করে দিলাম। তিনি শুধু কান দিয়ে শুনলেন। কারণ মমতাজ বেগমের পর অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছিল তখন। তাই আমার পরামর্শ আর আমার কথার মধ্যে তখন হয়তো মমতাজের ছায়া পান নি। একদিন দেখলাম তিনি মীরজুমলাকে দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করলেন। উপাধি দিলেন "মুয়াজ্জুম খাঁ"। সেদিন আমি সত্যিই বিষাদে অভিভূত হয়েছিলাম।

আজ সেই মুয়াজুম খাঁ বিষদাঁত দেখাতে শুরু করেছে। তার পুত্র আমিন খাঁও গোখরোর বাচ্চার মতো কিল্‌বিল্‌ করছে। অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলব একে ?

নানান্‌ চিন্তায় ভারাক্রান্ত মনে পিতার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি তাঁর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেন। আমি বুঝতে পারি কেন তিনি বাড়িয়ে দিলেন হাতখানা। আজকাল অনেক সময় মুখে কিছুই বলেন না।

আমি ঘ্রাণ নিয়ে বলি,—আছে বাবা। প্রথম দিনের মতোই আপেলের গন্ধ। একটুও কমে নি।

মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—তবে মরব না, কি বলিস ?

আমি সায় দিই।

বহুক্ষণ অসাড় হয়ে পড়ে থাকেন তিনি। কোন কথা বলে না। আমি তাঁর শয্যার পাশে বসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। সে মুখে প্রতিমুহূর্তে অভিব্যক্তির পরিবর্তন। তাঁর মন কাজ করে চলেছে অবিরত—তারই প্রতিচ্ছবি।

শেষে এক সময়ে নিজেই বলে ওঠেন,—ইয়া তক্ত, ইয়া তাবুত।

চমকে উঠি আমি। বলি,—হঠাৎ একথা বললেন কেন ?

মৃদু হাসেন তিনি। বলেন,—আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম জাহানারা, আমার চার ছেলে ময়ূরাসনের সম্মুখে সাংঘাতিক এক যুদ্ধে লিপ্ত। যুদ্ধ করতে করতে মাঝে মাঝে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠছে,—ইয়া তক্ত, ইয়া তাবুত। সে যে কী ভীষণ যুদ্ধ, না দেখলে কল্পনা করা যায় না। আমার বুক ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। এক এক জনের গায়ে আঘাত লাগছিল, আর আমার বুক থেকে রক্ত ঝরছিল। চেঁচিয়ে বলতে গেলাম,—তোরা থাম্‌। তোদের আমি ভাগ করে দিচ্ছি। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হোক্‌, কিন্তু তোরা বেঁচে থাক। তোরা যে মমতাজের ছেলে। শুনল না! কেউ শুনল না। একই ভাবে চেঁচিয়ে উঠল,—হয় সিংহাসন, নয় তো মৃত্যু। জাহানারা আমি কি করব বলতে পারিস ? তোর মা হলে কি করত বলত ?

বাদশাহ্‌ হাঁপাতে থাকেন। তাঁর সারা গা ঘামে ভিজে ওঠে। আমি মুখ নীচু করে ভাবতে থাকি।

—চুপ করে রইলি কেন জাহানারা ?

—বাবা, দেশকে খণ্ডিত করার পক্ষপাতী আমি নই। তার চেয়ে বরং মমতাজ বেগমের তিন পুত্রের দেহ ক্ষতবিক্ষত হোক্‌।

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে বাদশাহের। যেন বিশ্বাস করতে পারেন না কথাগুলো আমিই বললাম।

—তুই—শেষে একথা বললি ?

হ্যাঁ বাবা। ওদের চেয়ে দেশ বড়। একথা কি অস্বীকার করা যায়! ভারতবর্ষে বহু বংশ রাজত্ব করে গিয়েছে। সবারই এক ছেলে ছিল না। কিন্তু ভাইদের মধ্যে মনোমালিন্য না ঘটেও একজনই সিংহাসনে বসেছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তোমার ছেলেদের সে শিক্ষা হয় নি—তুমি দাও নি। তার জন্যে সারা দেশ ভুগতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে শুধু স্বপ্ন না দেখে, ওদের মধ্যে যদি ছেলেবেলা থেকে ভ্রাতৃপ্রীতি জাগিয়ে তুলতে পারতে তবে স্বপ্ন সত্যি হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও থাকত না। কিন্তু তুমি তা পার নি। আজ এই শুধু আফসোস করতে পার—আর কিছু নয়।

বাদশাহ্ স্তব্ধ। দেখে মনে হয় আমার কথাগুলো চার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বারবার তাঁর কানের মধ্যে প্রবেশ করছে। তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। চোখের পাতা ভিজে ওঠে তাঁর। শেষে ধীরে ধীরে বলেন,—তুই বড় নিষ্ঠুর জাহানারা। এমনভাবে সত্যি কথা কখনো বলতে হয় ? আমি যে অসুস্থ।

—তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করছি বাবা, তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একদিনের তরেও নিজের ইচ্ছেতে তোমাকে ছেড়ে থাকব না। কিন্তু আমার যা সত্যি বলে মনে হবে, তাই বলতে দিও আমাকে। মিথ্যা স্তোক বাক্য আমাকে দিয়ে বলিও না।

—তাই বলিস। কিন্তু দেখিস, আমার যেন খুব আঘাত না লাগে। যদি বুঝিস আঘাত পাবো, খুব আঘাত পাবো, তবে না হয় চুপ করে থাকিস।

ঠিক সেই সময়ে কোনরকম খবর না দিয়ে নজরৎ খাঁ কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে। রাগে আর সঙ্কোচে আমি লাল হয়ে উঠি বুঝতে পারি। কারণ পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলার সময় দারার উপস্থিতিও আমি সহ্য করতে পারি না। বাদশাহের সুবিধার জন্যে অসুস্থ হবার পর তাঁকে বাইরের দিকের এই কক্ষটিতে রাখা হয়েছে, যাতে আমীর-ওমরাহেরা খবরাখবর পৌছে দিতে পারে কিংবা নিজেরা এসে বাদশাহের পরামর্শ নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের ওপর নির্দেশ রয়েছে দেখা করার আগে অন্তত আগমনবার্তা জানাতে। নজরৎ খাঁ সে নির্দেশ মানে নি।

দুপা এগিয়ে এসে বিগলিত স্বরে সে বলে,—মাফ্ করবেন বাদশাহ্-বেগম। আমি ভেবেছিলাম বাদশাহ্ একা রয়েছেন।

বাদশাহের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। তিনি বলেন,—কোন জরুরী খবর আছে নজরৎ ?

—হ্যাঁ জাহাঁপনা। শাহ্‌জাদা সুজা দু-একদিনের মধ্যেই বাঙলা ছেড়ে এগিয়ে আসবেন।

উত্তেজিত স্বরে বাদশাহ্ বলেন,—এ খবর নতুন নয়। আমি জানি সে আসছে। তার ব্যবস্থাও করেছি।

নজরৎ খাঁ যেন হতবাক্। শৃগালের মতো খল হলেও আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না।

— আপনি জানেন? আমি ভেবেছিলাম—

কক্ষ ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াই আমি। ওর উপস্থিতি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাইরে আসে সে। এত তাড়াতাড়ি আসবে বুঝতে পারি নি। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—বাদশাহ্-বেগম।

—বাদশাহের সঙ্গে আপনার কথা শেষ হয়েছে?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এমনভাবে কথা বলছেন কেন?

যতটা সম্ভব ভদ্র হবার চেষ্টা করে বলি,—এর চেয়ে ভালভাবে কথা বলবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই খাঁ-সাহেব। পিতা অসুস্থ। চারিদিকের সংবাদও আপনার অজানা নয়।

—আমি আছি বাদশাহ্-বেগম। প্রাণ দিয়ে আপনার আর পিতার সম্মান রক্ষা করব। তাঁর মনে যে ইচ্ছাই থাকুক, সে ইচ্ছা পূরণের জন্যে আমি জীবন দেব।

—আপনারাই বাদশাহের ভরসাস্থল।

—কিন্তু একটি প্রার্থনা।

কী প্রার্থনা তা আমি জানি। তাই তাড়াতাড়ি বলি,—অন্য সময় কথা হবে। এখন আমি বড় ব্যস্ত।

নজরৎ সহসা নতজানু হয়ে আমার পায়ের ওপর দুটো হাত রেখে বলে,—ফিরিয়ে দিও না জাহানারা। কতদিন আমি অপেক্ষা করে আছি। আমি যে মানুষ।

প্রহরারত খোজা এই পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার করে। সে নিয়ম-মাফিক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। নজরৎ উঠে দাঁড়ায়।

—জাহানারা।

—আপনি তো জানেন খাঁ-সাহেব, এভাবে কথা বললে আমি বিরক্ত হই।

—বিরক্ত? ও। কিন্তু ছত্রশাল যদি একথা বলত?

—তাহলে আমি কি করতাম, সে কথা দেখছি আপনার জানা আছে। শুধু শুধু প্রশ্ন করছেন কেন তবে?

—বেশ। মনে থাকে যেন বাদশাহ্-বেগম।

—বাদশাহ্-বেগমের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তা কি জোর করে শিখিয়ে

দিতে হবে খাঁ-সাহেব ?

কুর্নিশ করে দ্রুত চলে যায় নজরৎ। সেদিক পানে চেয়ে বুঝতে পারি। দারাশুকোর একজন পরাক্রমশালী শত্রু বাড়ল। কিন্তু উপায় নেই।

পরদিন প্রাতেই আমার সবচাইতে প্রিয় এবং শিক্ষিত কপোতটিকে তার ঘর থেকে বার করি। গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। গালের সঙ্গে গাল ঠেকাই। তারপর তার পায়ে একটি ছোট্ট চিঠি বেঁধে প্রথম সূর্যের আলোয় একটি মিনারের পাশ থেকে যমুনার দিকে উড়িয়ে দিই। চিঠিতে লেখা ছিল: তোমার জিনিসটিকে যে সবাই ছিনিয়ে নিতে চায় রাজা। তুমি নিশ্চিন্তে বসে আছো? খুব তাড়াতাড়ি এসো। বড় বিপদ।

এই দুর্দিনে দারা আর এক কাণ্ড করে বসল।

দিল্লীর বাজারে প্রতি বছরই পশ্চিম দেশের স্ত্রী-পুরুষের চালান হয়। সে সময়ে বাজারে আমীর-ওমরাহ্‌দের ভিড় বাড়ে। মুসলমান নারীরা পর্দানশীন। নইলে, আমি হলফ করে বলতে পারি, নারীদের ভিড়ও কম হত না। অমন দুধে-আলতা রঙের রক্তমাংসের মানুষকে শুধু মোহরের বদলে সারাজীবন নিজের করে নেবার আদিম প্রবৃত্তি সবার মনেই সুড়সুড়ি দেয়। দুর্ভাগ্য নারীদের। তেমনি সৌভাগ্য আমীর-ওমরাহ্‌ আর শাহ্‌জাদাদের। প্রায় প্রত্যেকের অন্তঃপুরে সে দেশের যুবতীরা ঘর আলো করা রঙ নিয়ে বর্তমান। সুজার তো নেশাই ছিল ক্রীতদাসী ক্রয় করা। কিন্তু দারার ওসব বাতিক ছিল না।

সেই দারা একদিন বাজার থেকে নিয়ে এল একজনকে। হারেমের প্রবেশ পথে নাদিরা পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সে সময়ে আমিও ছিলাম নাদিরার পাশে।

দারা থতমত খেয়ে প্রশ্ন করে,—এ কি করছ নাদিরা ?

—রানাদিল্‌ হারেমে স্থান পাওয়ায় তোমার স্পর্ধা বেড়েছে। নাদিরার নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে। দারার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আগে কখনো দেখি নি তাকে। কল্পনাও করি নি এরকম দৃশ্য। একটু অবাক্‌ হই। আবার ভাবি বয়স যত বাড়ে, নারীর লজ্জা সংকোচ আর সৌন্দর্য ধীরে ধীরে ঝরে পড়তে থাকে। এতে অবাক্‌ হবার কিছু নেই। নাদিরা মানবী। দুইপুত্র আর এক কন্যার মা সে। সহ্যের একটা সীমা আছে তার। হয়তো সে আগের মতোই লজ্জাশীলা থাকতে পারত—কিন্তু দারার অবিবেচনা তাকে থাকতে দিচ্ছে না।

নাদিরার দিকে চেয়ে অসহিষ্ণু স্বরে দারা বলে ওঠে,—আঃ, তোমার ছেলেমানুষী গেল না। এতো বেগম হতে যাচ্ছে না। এ যে ক্রীতদাসী।

দুঃখের হাসি হেসে নাদিরা বলে,—অমন অনেক আগুন-রঙের ক্রীতদাসী হারেমে,

আগুন জ্বালিয়েছে শাহ্জাদা। তাছাড়া, তোমাকে যে আগের মতো বিশ্বাস
করতে পারি না।

—তাই বলে নাজীর হিসেবেও ঠাঁই পাবে না হারেমে?

—না।

দারা মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলে,—বাদশাহ্-বেগম, হারেমের কর্ত্রী
নাদিরা হল কবে থেকে?

—এ ক্ষেত্রে নাদিরার ইচ্ছাই, আমার ইচ্ছা দারা।

দারার মুখে হতাশা ফুটে ওঠে।

—তোমার লজ্জা হয় না দারা? দেশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ কখনো।
সুজার মতো সৌখীন মানুষও ধেয়ে আসছে দিল্লীর দিকে। তোমার নিজের পুত্র
গিয়েছে তাকে বাধা দিতে। আর তুমি? উপযুক্ত পুত্রের পিতা হয়ে কী করছ
ছি ছি। তুমি পণ্ডিত, তুমি চিন্তাশীল, তুমি দাতা—তোমার গুণের অন্ত নেই
অথচ কিছুদিন থেকে বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছ। যদি দৃষ্টিকে সামান্য একটু
বাইরের দিকে মেলে দিতে তাহলে ক্রীতদাসের বাজারে গিয়ে ভিন্‌দেশী সুন্দরীদের
হাত ধরে টানাটানি করতে না।

—কিন্তু—

—কোন 'কিন্তু' নয়। আমার কথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে দারা।

নাদিরার দিকে ঘুরে দাঁড়াই আমি। ইচ্ছা করে যতটা পারি নাসিকা কুঞ্চিত করি
তারপর বলি,—নাদিরা, এই বিদেশিনীকেও হারেমে ঠাঁই দাও। দেখিয়ে দা
পুরুষেরা হীন আত্মকেন্দ্রিক হলেও নারী তা নয়। নারীর ভালবাসা দেহসর্বস্ব নয়
একদিন আসবেই যখন দারা নিজের ভুল বুঝতে পারবে। সেদিন পৃথিবীর স
নারীকে ছেড়ে তোমার এই পা-দুখানির সামনে লুটিয়ে পড়বে।

পাষাণ-প্রতিমার মতো নাদিরা দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রশ্ন করি,—রাজী আছো নাদিরা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব আস্তে আস্তে সে বলে,—হ্যাঁ। আমারই ভুল হয়েছিল বাদশাহ্
বেগম। ভুলে গিয়েছিলাম দুর্ভাগ্যবশত আমি মুঘল-শাহজাদার বেগম হয়েছি।

দারার মুখের সব রক্তটুকু অন্তর্হিত হয়। সে বোবার মতো চেয়ে থাকে তার স
চাইতে পুরাতন বেগমের দিকে।

—দাঁড়িয়ে আছো কেন দারা। নিয়ে যাও তোমার নতুন বেগমকে।

—আঃ জাহানারা। একে না হয় বাইরেই কোথাও রেখে আসি।

-না। বাইরে রেখে এসে এই দুর্দিনে সব সময় সেখানে বসে ওর রূপসুধা পান করা হবে না। যা কিছু করতে চাও হারেমে কর। কারণ তুমি হতভাগ্য বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। স্নেহান্ধ বাদশাহ্ সময়ে অসময়ে তোমার উপস্থিতি কামনা করেন।
দারা তার ঠোঁট কামড়ে ধরে প্রশ্ন করে,—আমি কি সত্যিই এতটা নীচে নেমে গিয়েছি জাহানারা ?
—আমি সামান্যা নারী দারা। যা বলি, হয়তো ভাবাবেগে বলি। আমার কথার মূল্য কতটুকু ? সময়ে সব কিছুরই বিচার হবে। তবে তখন আমরা কেউ-ই থাকব না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, নাদিরার মতো বেগম পেয়ে যে পুরুষ অন্য নারীকে বেগমের মর্যাদা দেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করে সে পণ্ডিত হলেও মূর্খ। সে উদার হলেও হীন। আমি বলছি না, যে পুরুষ হয়ে, শাহ্‌জাদা হয়ে, তুমি আজীবন শুধু নাদিরার আশেপাশে ঘুরে ঘুরে মর। তবে একটু কৌশলী হলে নাদিরার সম্মান অটুট রেখেও তোমাদের উৎকট প্রবৃত্তির তুষ্টিসাধন করতে পারতে। রানাদিলের সময় একথা আমার মনে হয় নি। কারণ তার চোখে দেখেছি তোমার প্রতি এক গভীর প্রেমের জ্যোতি। কিন্তু একে দেখে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। নাদিরাও হয়তো সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তাই এবারে কান্নায় ভেঙে না পড়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই বিদেশিনী ঘর সাজাবার সামগ্রী। ভুলেও ভেবো না, এ কোনদিন একান্তভাবে তোমার হবে। যেখানে শক্তি, যেখানে মধু, সেখানেই ছুটে যাবে এ। এর কাছে হৃদয়ের মূল্য কানাকড়িও নয়।
—এইটুকু দেখেই এত কথা বলে দিতে পারলে ?
—আমিও নারী দারা। নারীকে চিনতে একটি মুহূর্তই যথেষ্ট। নিয়ে যাও হারেমে। যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে।
—কি নাম দেব ?
—উদীপুরী বেগম।
—এতো কথা বলতে পারে না।
—সে ব্যবস্থা আমি করছি। প্রেম-নিবেদনের ভাষাটা অন্তত যাতে তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে পারে, সেদিকে নজর রাখব।
নাদিরা বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে। দারার মুখখানা লাল হয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি উদীপুরী বেগমকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। নাদিরা সেদিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।
পুরুষরা সত্যই অদ্ভুত! কিন্তু, আমার রাজা ? ছত্রশাল ? সে অদ্ভুত নয়—অপূর্ব!

আমার বয়স হয়েছে। নিশ্চয়ই হয়েছে। পিতার বার্ধক্য দেখে বুঝতে পারি আমা
বয়স হয়েছে। দারার মুখের আবছা রেখা দেখে বুঝতে পারি আমার বয়স হয়েছে
আর বুঝতে পারি, সাম্প্রতিক ঘটনার জন্যে। দারার পুত্র সুলেমানশুকো এ
বিরাট সৈন্যদলের নায়ক। সেদিনের ছেলে সুলেমান। যাকে দুধ খাওয়াতে ন
পারলে নাদিরার স্তনজোড়া টন্‌টন্‌ করত। ভাবতে আনন্দ হয়। আবার সংকো
স্বীকার করছি, ভয় হয়। রাজার সঙ্গে কতটুকু মিশেছি আমি? এর মধ্যেই সে য
আমাকে পেয়ে মহতাব-বাগের সন্ধ্যার মতো উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তবে কিসের আনন্দ
সে আমাকে ভালবাসে, চিরকাল বাসবে। কিন্তু সে যদি আমাকে পেয়ে পাগল ন
হয়, তবে যে লজ্জায় মরে যাব। সুলেমান আজ সেনাপতি, সে আজ প্রায় যুবক
আমি আর নিজেকে কীভাবে যুবতী বলে ভাবি।

আরশির সামনে দাঁড়ালে বুঝতে পারি, যৌবন যেন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে আমা
দেহে। কিন্তু তবু কি একটু স্থূলাঙ্গী মনে হয় না নিজেকে? কোমর কি আগে
মতোই সরু। জানি না। জানার জন্যে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে ভয় হয়। রোশনার
বলতে পারত। কিন্তু তাকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় না। আমি যে বাদশাহ
বেগম। আমার সম্মান আকাশ ছোঁয়া। তাই মনে মনে জ্বলে-পুড়ে মরি।

শুধু নাজীরকে ডেকে নির্দেশ দিই রুটি আমি একখানার বেশী খাব না। গোস্ত খ
নামমাত্র। আমার খাবার প্রধানত মেওয়াখানা থেকে আসবে। শরীরের ওজ
কমাতেই হবে। রোশনারা ঈষৎ স্থূল হয়েছে। সে শরীরের দিকে বিশেষ নজ
দিতে পারছে না। তার নজর এখন দক্ষিণ ভারতের দিকে। আওরঙজেব য
আমার ভাই না হত তবে রোশনারাকে কবে দূর করে দিতাম।

রোশনারার পরামর্শে আমিন খাঁ রটিয়েছে শাহানশাহ্‌, শাহজাহান মৃত। রাজধান
অনেকেই কথাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তাদের ধারণা দারাশুকো বাদশাহে
মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখেছে। কারণ, প্রকাশ পেলে তক্ত-তাউস নিয়ে রক্তার
হবে। সবার বুক কাঁপে। একটা সাংঘাতিক কিছু আসন্ন।

ঠিক সেই সময়ে এক সন্ধ্যাবেলায় বাদশাহ্‌ ডেকে বলেন,—আয় তো জাহানার
তুলে ধরত আমাকে।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বলি,—তুমি পারবে না বাবা।

—পারব না? আমি পারব না? ভুলে যাসনে আমি শাহানশাহ্‌, শাহজাহা
আমি ইচ্ছে করলে সব পারি। আয়।

তার ধমকে ভীত হই। তাঁর কণ্ঠস্বরে এ দৃঢ়তা বহুবছর শুনি নি। ভুলেই য়েছিলাম। স্মৃতিতে ভেসে ওঠে আমার ছেলেবেলার কথা। তখন বাদশাহের তিটি কথাতেই ছিল ঠিক এইরকম জোর। মুখে ছিল তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা। জও দেখলাম সেই দৃঢ়তার ছাপ।

কিম বলেছে, চুপচাপ শুয়ে থাকতে। নড়লে ক্ষতি হতে পারে। অথচ আমি র গায়ে হাত দিতেই তিনি আমার কাঁধের ওপর বাঁ-হাতখানা ফেলে দিয়ে লন,—পারবি তো?

চেষ্টা করি।

হ্যাঁ। তাই কর। ছেলেদের হাতের পুতুল হতে পারব না। শাহানশাহ্ হজাহান ছেলেদের হাতের পুতুল! হাঃ হাঃ হাঃ।

কে উঠি।

—ওকি, কেঁপে উঠলি কেন? আমি পাগল হই নি। ঠিক উঠব আজ। দেশের ার সামনে গিয়ে দাঁড়াব। তারা দেখবে, আমি মরি নি। বেঁচে আছি। তাদের তাই বেঁচে আছি।

রপরে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমার ওপর সামান্য ভর দিয়ে সত্যিই তিনি ঠে দাঁড়ালেন। আমি কথা বলতে পারি না। আনন্দে বিস্ময়ে আমি মূক। দশাহ্ও নবজীবন পেয়ে খুশীতে বিহ্বল।

ক সেই সময় দারা প্রবেশ করে ঝড়ের বেগে। কিন্তু বাদশাহের দিকে নজর ড়তেই সে থেমে যায়। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

দশাহের মুখে মৃদু হাসি। তিনি একবার আমার দিকে, একবার দারার দিকে য়ে—শেষে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে দারার দিকে এগিয়ে যান।

রা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে। সেই মুহূর্তে যদি ভারতের সবাই পস্থিত থেকে দৃশ্যটি দেখত, তাহলে বিশ্বাস করত যে দারাই একমাত্র পুত্র যে য়ূরাসনের চেয়ে বাদশাহ্ শাহজাহানকে বেশী ভালবাসে। শত দুর্বলতা আর অক্ষমতা ত্ত্বও কেন যে বাদশাহের স্নেহের প্রধান ধারা তার উপর বর্ষিত হয় এই মুহূর্তে আমি রিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করলাম। আমার চোখে জল আসে।

তক্ষণ পার হয় জানি না। দারা একসময়ে বাদশাহ্‌কে ধরে এনে শয্যার ওপর সিয়ে দেয়। তাঁর পায়ের কাছে সে নতজানু হয়ে বলে,—আওরঙজেব এগিয়ে াসছে।

—আসুক। আমি যখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি তখন হাজার আওরঙজেব এলেও লার দাপে তো উড়ে যাবে।

—আপনি কি পারবেন্? দারা প্রশ্ন করে।
—এখনো অবিশ্বাস?
—না। কিন্তু কঠিন পরিশ্রমে যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন? তার চেয়ে আপনি চলে-ফিরে বেড়ান, এই যথেষ্ট। লোকে তো জানল আপনি সুস্থ আছেন।
—না। আমার কথার নড়চড় হবে না। পরশু রওনা হব আগ্রার পথে।
দারা আর আমি পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারি না। সে সাহস আমাদের হয় না।

আকুল প্রতীক্ষায় থেকে শেষে হতাশ হলাম। আমার চিঠির উত্তর পেলাম না রাজার কাছ থেকে। আমার প্রিয় কপোতটিও আর ফিরে এল না। দুর্ভাবনা হল হয়তো পথের মধ্যে কপোতটির মৃত্যু হয়েছে। হয়তো ঝড়ের মধ্যে পড়ে নিজেকে বাঁচাতে পারে নি। কিংবা কঠিন দায়িত্বের বোঝা নিয়ে যাবার সময় তৃষ্ণা পেলেও জল খায় নি। বুকের ছাতি ফেটে মরেছে। চিঠিখানা বেহাত হলে কোন ভয় নেই। নীচে নাম লিখি নি। ওপরে সম্বোধন করি নি কাউকে। রাজা আমার হাতের লেখা চেনে। সে আমার কপোতটিকেও চেনে।
আশঙ্কা হয়, রাজার কোন অমঙ্গল হয় নি তো? নজরৎ খাঁ যেভাবে সেদিন বিদায় নিল, তারপরে সবকিছু হওয়াই সম্ভব। রাজা দুর্বল না। নিজেকে রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তার রয়েছে। তবু হীন ষড়যন্ত্রের কাছে তার মতো বিরাট হৃদয়ের পুরুষ প্রায়ই পরাস্ত হয়। ইতিহাসের পাতায় এমন নজীরের অভাব নেই।
অস্থির হয়ে ওঠে মন। ভেতরটা কেমন আনচান করে।
সেই অবস্থাতেই দিল্লী ত্যাগ করি। যাবার আগে হায়াৎবক্স্-বাগ আর মহতাব বাগের দিকে সজল নয়নে চাই। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এখানে। অথচ যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন কোন স্মৃতিই ছিল না এদের বুকে। জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে কী লেখা আছে জানি না। জানতে চাই না। এ একটি প্রার্থনা আমার আল্লার কাছে—রাজা যেন সুস্থ থাকে। সে যেন দীর্ঘজীবী হয়। আর একটিবার যেন অন্তত সে আমার জীবনে উদিত হয়ে আমার দেহমনের সব শৃঙ্খলা ভেঙে দিয়ে যায়। আর কিছুই চাই না।
পথিমধ্যে খলিলুল্লা খাঁ আর শায়েস্তা খাঁ বার বার বাদশাহের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে। তারা চিন্তাক্লিষ্ট—তারা উদ্বেগাকুল।
তাদের এই উদ্বেগের কারণ আমি আন্দাজ করতে পারি কিন্তু বাদশাহকে বলা

পারি না। তিনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই উভয় খাঁ-সাহেবকে বাদশাহের কাছ থেকে দূরে রাখার যে সহজ উপায় তাই আমি বেছে নিলাম। বাদশাহের পাশে তাঁর শকটের মধ্যে গিয়ে বসলাম। ছট্‌ফট্ করে মরুক ওরা। কিন্তু আমার সব সাবধানতা বিফলে গেল। ওরা অন্য পথ নিল। বাদশাহের কাছে ভিড়তে না পেয়ে দারাকে গিয়ে ধরল। তাকে বোঝাল বীরত্ব প্রকাশের এবং প্রজাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণের এমন সুযোগ সে আর পাবে না। বাদশাহ্‌কে আওরঙজেবের বিরুদ্ধে অভিযানে না পাঠিয়ে তার নিজেরই যাওয়া উচিত। দারা তাই বুঝল। খলিলুল্লা খাঁ আর শায়েস্তা খাঁয়ের মতো চিরপরিচিত গুণী লোকদেরও যে অনেক সময়ে অবিশ্বাস করতে হয় একথা তাকে বোঝাতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না আমি।

তাই এক সন্ধ্যায় বাদশাহের শিবিরে এল সে। আমি জানতাম সে আসবে—তাই আগে থেকেই উপস্থিত ছিলাম।

আমাকে দেখে দারা একটু অসন্তুষ্ট হল। হোক। নিজের যতটুকু সামর্থ্য আছে আমি কাজে লাগাব। কিন্তু দারাও দেখলাম বেশ চতুর হয়ে উঠেছে। হাসিমুখে সে এমন কথার উত্থাপন করল যে আমি থ' হয়ে গেলাম।

সে বলল,—জাহানারার একটা ব্যবস্থা করতে হয় এবারে।

বাদশাহ্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান।

দারা বলে,—সারা জীবন একে মুঘল-হারেমে বাদশাহ্-বেগম করে রেখে লাভ নেই। এতে সম্মান আছে প্রচুর, কিন্তু শাস্তি নেই।

—কি করে বুঝলে? বাদশাহ্ প্রশ্ন করেন।

—খুবই স্বাভাবিক। কেউ এভাবে ছন্নছাড়া জীবন কাটাতে পারে না। এ যেন বালির ওপর প্রাসাদ গড়া। জাহানারার একটা স্থিতি হওয়া প্রয়োজন।

—কি রকম?

—সারা পৃথিবীতে একটি মানুষকে পেলে ও সব কিছু ফেলে হিন্দুদের মতো হিমালয়ে গিয়েও থাকতে পারে।

—তাই নাকি? কে সে ভাগ্যবানটি? বাদশাহের কণ্ঠস্বরে রসিকতা। যদিও আমার বুক কাঁপে।

—বুন্দীরাজ ছত্রশাল।

বাদশাহের শয্যার একপাশে আমি বসে পড়ি। দারা আমাকে নিশ্চেষ্ট করার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।

বাদশাহ্ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকেন। আমি তাঁর দিকে চাইতে পারি না। দারার

কথাকে তিনি কিভাবে নিলেন আমি জানি না। শেষে তিনি বলেন,—জাহানারার নির্বাচনের তারিফ করতে হয়। একথা আমি কখনো ভাবি নি।

—আপনার মত আছে?

—আছে। হিন্দু বলে প্রশ্ন করছ তো? হোক হিন্দু। হিন্দুদের সঙ্গে মুঘল-বংশের সম্বন্ধ এই প্রথম নয়। অনেক দিয়েছে জাহানারা। যদি সত্যই সে ছত্রশালকে পেতে চায়, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

আমি কেঁদে ফেলি।

আমার কান্নার দিকে চেয়ে বাদশাহ্ বলেন,—এতদিন বলিস নি কেন জাহানারা? এতে সঙ্কোচের কি আছে।

কোন কথা বলতে পারি না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাজার সুন্দর মুখ আর সুঠাম দেহ। আমি যেন আর সহ্য করতে পারি না। এতখানি নির্লিপ্ত হবার পর একটু একা থাকতে চাই—একা ভাবতে চাই। দারা বাদশাহের কাছে কোন্ কথা উত্থাপন করবে জেনেও আমি তাঁর শিবির ছেড়ে নিজের শিবিরে চলে আসি। আমি নারী।

একান্তে বসে বসে দারার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে ওঠে। যদিও তাকে অশ্রদ্ধা করার মতো কোনো কারণই নেই। সে বিরাট পণ্ডিত—সারা হিন্দুস্তানে তার মতো সব ধর্মের প্রতি দখল বোধহয় কারও নেই। সে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষদের অনুবাদ করে 'রাফিজী'—বিধর্মী আখ্যা মাথা পেতে নিয়েছে। যার ফলে এত ভাল হয়েও সে অধিকাংশ আমীর-ওমরাহের চক্ষুশূল। তার সঙ্কলিত "সর-ই-আসরার" এক অপূর্ব গ্রন্থ। এমন কি সে খ্রীষ্টধর্ম নিয়েও গভীর পড়াশুনা করেছে। আজকাল তাকে যেন সেই দিকেই বেশী ঝুঁকতে দেখি। শুধু পণ্ডিত নয়—সে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। কোথায় লাগে মুরাদ। কোথায় লাগে আওরঙজেব আর সুজা। যদি বীরত্বের পরীক্ষা হয়—যদি সম্মুখ যুদ্ধ হয়, তবে দারার বীরত্ব সবাইকে ছাপিয়ে যাবে।

কিন্তু দারা সরল। তার মনে ময়লা নেই, নীচতা নেই, দীনতা নেই। স্বভাবতই সে সবাইকে বিশ্বাস করে। শুধু এই একটি কারণে আমি তাকে সবার চেয়ে দুর্বল বলে ভাবি। এই কারণেই আমার এত ভয় হয়। তাই আমি ওকে সুযোগ পেলেই তিরস্কার করি। নইলে সে তিরস্কারের ঊর্ধ্বে। নাদিরা অবধি একথা জানে। রানাদিল্‌কে তাই সে বুকে টেনে নিয়েছে। উদীপুরী বেগমের মতো মেকি-হৃদয়ের সুন্দরীকেও সে দারার সম্মুখে কখনো অবহেলা করে না।

দারার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। শায়েস্তা খাঁ, মীরজুমলা, খলিলুল্লা খাঁ আর নজরৎ খাঁয়ের

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পাই তাদের শিবিরে আনন্দের হিল্লোল। এতক্ষণে সরাবের নদী বয়ে যাচ্ছে সেখানে।

আগ্রা আর মাত্র একদিনের পথ। বাদশাহ্ আবার অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলেন। তাঁর দেহের একদিক ধীরে ধীরে অবশ হতে লাগল। হয়তো দারার নেতৃত্ব বরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই বিস্ময়কর মনের জোরে ভাঁটার টান শুরু হয়েছিল। ভয় হয় আমার। আর একটা দিন যেন তিনি ভাল থাকেন।

দারা প্রস্তুত হয়ে বাদশাহের কাছে বিদায় নিতে এলে তিনি বললেন,—মানুষকে অবিশ্বাস করা হয়তো পাপ দারা, কিন্তু এই পৃথিবীতে বিরাট দায়িত্ব যাদের মাথায় এসে পড়ে, সূক্ষ্ম বিচার করে চলতে হয় তাদের। নইলে জীবনে প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হতে হয়। বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করে চলবে। তাতে যদি অতি বিশ্বস্ত বলে যাকে জান, তাকেও অবিশ্বাস করতে হয়, করবে। দোষের কিছু নেই।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি কি শায়েস্তা খাঁ, দেওয়ান মীরজুমলার মতো মানুষকেও অবিশ্বাস করতে বলেন ?

—নির্দিষ্টভাবে কাউকেই অবিশ্বাস করতে বলি না। তেমন কিছু দেখলে নিজের পুত্রকেও অবিশ্বাস করতে হয়। দেখতেও তো পাচ্ছ।

দারার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। সে বাদশাহের কথায় আঘাত পেয়েছে। নিজের পুত্রদের কথা হয়তো ভাবছে।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি,—হ্যাঁ, শায়েস্তা খাঁ, মীরজুমলা—এঁদেরও অবিশ্বাস করতে করতে হবে, তেমন দেখলে।

—নারীর উপযুক্ত কথাই বললে জাহানারা।

—নারী এর চেয়েও কঠিন কথা বলতে পারে, যদি সে দেখে পুরুষ পৃথিবীর মাটির ওপর না দাঁড়িয়ে নিজের চিন্তাধারায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সে বলে ওঠে—তোমার উপদেশ মনে থাকবে বাদশাহ্-বেগম।

—মনে থাকলেই মঙ্গল। নইলে মুঘল-ইতিহাসে এমন কিছু ঘটে যাবে, যার ফল হয়তো স্বয়ং বাদশাহ্‌কে ভোগ করতে হবে। মনে থাকলেই মঙ্গল। নইলে এ-ই বোধহয় তোমার সঙ্গে আমার শেষ কথা।

—ধন্যবাদ। দারা চলে যায়।

বাদশাহ্ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন,—আমারও সেই ভয় জাহানারা। ইচ্ছে ছিল, ওকে নিজের সঙ্গে রাখব। একা যেতে দেব না। কিন্তু কেন যেন অনুমতি দিয়ে ফেললাম। তারপর থেকেই অসুস্থ বোধ করছি।

—আগ্রায় পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিলেই সুস্থ হয়ে উঠবে বাবা।

আগ্রায় পৌঁছে বাদশাহ্ আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে কোন রকমে কিল্লায় নিয়ে গিয়ে শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হল। আমার মন স্থির হয়ে ওঠে। একটা ঘোর অমঙ্গলের ছায়া যেন সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করছে।

দারা এগিয়ে গিয়েছে। সুলেমান শুকো সুজাকে পরাস্ত করে ফিরে আসছে। তার কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে, সে যেন সোজা গিয়ে দারার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করে। তবু কেন যেন ভরসা পাই না। কারণ দারার সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি সাপের মতো খল লোক যাদের প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারবে কিনা জানি না।

এই সময়ে যদি রাজা থাকত। তার কী হয়েছে জানি না। কোন বিপদ না হলে এতদিন সে নিশ্চয়ই আসত। অভিমানে আমার চোখে জল আসে। বিপদ হলে একটা সংবাদও কি দিতে নেই?

চোখের জল মুছে ফেলে বাদশাহের শয্যার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেন না। তিনি চেয়ে রয়েছেন বাতায়নের দিকে—যে বাতায়ন-পথে দেখা যায় দূরের তাজমহলকে। বাদশাহের চোখে অশ্রু। অস্ফুটস্বরে তিনি ক্রমাগত উচ্চারণ করে চলেছেন,—মমতাজ, মমতাজ, মমতাজ—

এখানে এসে অবধি তাজমহলের দিকে ভালভাবে চাইবার অবসর আমি পাই নি। আজ বাদশাহের দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে চাই। স্তব্ধ তাজমহল। দুঃখভারাক্রান্ত তাজমহল। তার মর্মরের প্রতিটি বিন্দুতে শোকের ছাপ। তাজমহল কাঁদছে।

—জাহানারা! চিৎকার করে ওঠেন বাদশাহ্।

—এই যে বাবা।

—ওঃ, তুই এখানে। দেখছিস জাহানারা, তোর মা কাঁদছে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কোন কথা বলি না। সযত্নে বাদশাহের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে স্থানত্যাগ করি।

প্রাসাদ শিখরে উঠে সামনের দিকে চেয়ে থাকি। এখান থেকে রাস্তা চোখে পড়ে। পথের দিকে চাইলে যেন দেশকে অনুভব করা যায়। লোকের যাতায়াত আগের মতোই রয়েছে। কিন্তু কেমন যেন থমথমে ভাব। আগ্রা প্রায় আগের মতোই রয়েছে, কিন্তু কে যেন তার প্রাণটিকে সযত্নে তুলে নিয়ে কোথায় রেখে এসেছে। দেখলে মনে হয় মৃত-নগরী।

দূর থেকে একদল অশ্বারোহী ছুটে আসে দেখতে পাই। তাদের চেনা যায় না,

অথচ তাদের মধ্যে একজনের দেহের গঠন দেখে মনের মধ্যে তোলপাড় করে। হে আল্লা, সে যেন হয়। তাকে আমার বড় প্রয়োজন।

অশ্বারোহীরা দুর্গের দ্বারদেশে এসে থেমে যায়। এবারে চিনতে পারি। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়। ছুটে নীচে নামি। সিঁড়ির যেন শেষ নেই। এত সিঁড়ি আগে তো কখনো ছিল না।

নীচে নামতেই একজন খোজা এসে বলে,—ছত্রশাল দর্শনপ্রার্থী।

—এখনি তাঁকে নিয়ে এসো। আমি অপেক্ষা করছি পাশের ঘরে।

প্রহরী চলে যায়। অধীর আগ্রহে আমার বুক ওঠা-নামা করে। নিজেকে মনে হয় সেই কত বছর আগের কিশোরী। হাসব, না কাঁদব বুঝতে পারি না। বুঝতে পারি না অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে থাকব কিনা। হয়তো এ বয়সে সেটা শোভা পাবে না। কিন্তু রাজার কাছে কি আমার বয়স বেড়েছে? আমার কাছে তো ও তেমনিই আছে। খোজার সম্ভ্রমসূচক আহ্বান কানে আসে। সে কক্ষের দরওয়াজা দেখিয়ে দিয়ে থেমে যায় বাইরে। ছত্রশাল ভেতরে প্রবেশ করে।

একি! এত রোগা হয়ে গিয়েছে? দূর থেকে তো বুঝতে পারি নি একটুও। চোখের কোণে কালি পড়েছে। নির্বাক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। সব ভুলে যাই। ভুলে যাই প্রাসাদের অন্য কক্ষে বাদশাহ্ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। ভুলে যাই দারাশুকো আওরঙজেবের বিরুদ্ধে অভিযান করেছে। ভুলে যাই মুরাদও এগিয়ে আসছে—আওরঙজেব তাকে কৌশলে দলে টেনেছে। সব ভুলে যাই।

রাজার ওষ্ঠ নড়ে ওঠে। কিন্তু শব্দ বার হয় না। আমি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরি। আর পারি না। ভেঙে পড়ি কান্নায়। ছত্রশাল আমাকে চেপে না ধরলে তার পায়ের কাছে পড়ে যেতাম।

বহুক্ষণ পরে ছত্রশাল ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে,—কবে এমন হল?

—কি হল রাজা?

—বাদশাহের মৃত্যু?

চমকে উঠি। দূরে সরে যাই। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলি,—কোথায় শুনলে একথা?

—নিজের রাজ্য থেকে শুরু করে আগ্রা পর্যন্ত—সব জায়গাতেই।

—আমিন খাঁ আবার নোংরা খেলা শুরু করেছে। আর এবারে সফলও হয়েছে।

—বাদশাহ্ তবে মৃত নন?

—না। তিনি অসুস্থ।

ছত্রশালকে চিন্তান্বিত দেখায়। বলে,—আজ থেকে বিশ্বস্ত লোক দিয়ে প্রচার শুরু কর যে তিনি বেঁচে আছেন। নইলে যুদ্ধ ছাড়াই আওরঙজেব জিতে যাবে।

—তুমি ব্যবস্থা কর।
—আমি পারতাম। কিন্তু এখানে অপেক্ষা করলে তো আমার চলবে না। শাহ্‌জাদা দারাশুকোর পাশে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে।
—তুমি এখানেই থাকো রাজা। আমার পাশে।
—ক্ষমা করো জাহানারা। তোমার এই একটি অনুরোধ শুধু আমি রাখতে পারলাম না। যুদ্ধের সময় বুন্দীরাজের স্থান বাদশাহের পাশে। এখন দারাশুকো বাদশাহের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারি না।
ছত্রশাল আমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয়। যেন ঘুম পাড়িয়ে দেবে এখুনি। আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারি না। সে যা বলেছে তার চেয়ে সত্যি কথা তো কিছু হতে পারে না। তবু ওকে অপ্রস্তুত করার লোভ সংবরণ করতে পারি না। বলি,—আমার কোন্ অনুরোধ তুমি রেখেছ? কপোত পাঠিয়ে তোমার জন্যে প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করেছি। তুমি এলে না। একটা সংবাদও পাঠালে না।
—আমি অসুস্থ ছিলাম জাহানারা। তুমি তো জান, তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি পারি না।
—কপোতটিকে ফিরিয়ে দিতে পারতে খবর সমেত।
—ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে নিজেই দেখা করব।
—আমি এদিকে ভেবে মরি।
—তোমার শরীরও তো ভাল নেই জাহানারা।
—সূর্য যে আমার মাত্র একটি রাজা। সে সূর্যের উদয় না হলে কি সূর্যমুখী বাঁচে?
রাজা আবার আমাকে জড়িয়ে ধরে। তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আমি তার দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন শুনে যাই।

রাজা চলে যাবে। চলে যাবে চম্বল নদীর তীরে, যার অপর পাড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আওরঙজেবের সৈন্যবাহিনী।
কেন যেন মনে হয় রাজা আর ফিরবে না। ভাগ্যদেবী আজকাল পাপীদের প্রতিই বেশী প্রসন্ন। রুস্তম খাঁ, রামসিংহ, দায়ুদ খাঁ আর ছত্রশালকে নিয়ে দারাশুকোর যে বিরাট বাহিনী, বীরত্বে সমস্ত পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে রয়েছে সেই পাপীর দল—যারা বুক ফুলিয়ে সামনে না দাঁড়িয়ে পেছন থেকে ছুরি চালায়। এদের হীনতা আর চতুরতা বীরেরা তাদের উদার হৃদয় নিয়ে সব সময় ধরতে পারে না। পারলে শুধু ছত্রশাল আর দায়ুদ খাঁই পারবে। তারা বীর আবার সেই সঙ্গে

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু দারাশুকোকে তারা কতখানি প্রভাবিত করতে পারবে জানি না বলেই আমার ভয়।

আমার প্রকোষ্ঠে বসে রাজাও সেই কথা বলল। তার ভয় খলিলুল্লা খাঁকে। দারা এখনো তাকে বিশ্বাস করে অন্ধের মতো। রাজার অনুরোধ আমি দারাকে একখানা পত্র লিখে দিই।

ছত্রশালের সঙ্গে যুদ্ধ সংক্রান্ত আরও বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পর হাঁপিয়ে উঠি। মনে হয় আজই শেষ দিন। এরপর হয়তো রাজার উষ্ণ সান্নিধ্য জীবনে আর কখনো পাব না।

তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে বলি,—আমার কপোতটিকে তো ফেরত দিলে না।

—সেটি আমার সঙ্গেই রয়েছে। তুমি পাবে না।

—কেন ?

—বলব ?

—বল।

—যুদ্ধক্ষেত্রে কপোতটিকে নিয়ে আমার বিশ্বস্ত অনুচর আমাকে অনুসরণ করবে।

—কেন ?

—তোমাকে শেষ সংবাদ দেবার জন্যে।

—শেষ সংবাদ ?

—হ্যাঁ। আমি জানি, আমাকে হত্যা করার জন্যে নজরৎ খাঁ সব আয়োজনই করে রেখেছে। সে তা পারত না, যদি আমি বরাবর শাহ্‌জাদার সঙ্গে থাকতাম। কিন্তু সে সুযোগ পেয়েছে নজরৎ। অবিশ্যি আমার সামনে এলে তার নিস্তার নেই। কিন্তু সামনে সে আসবে না। সাহস নেই। যদি আমি নিহত হই জাহানারা, আমার অনুচরটি তোমার কপোতের গায়ে আমার রক্তের ছোপ লাগিয়ে ছেড়ে দেবে। তুমি বুঝতে পারবে রাজা আর নেই।

—উঃ।

—শুনতে খারাপ লাগে জাহানারা। কিন্তু এর চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কেউ তো এসে তোমাকে দুঃসংবাদ দিতে পারবে না।

কী উত্তর দেব। কিছুই বলার নেই।

—জাহানারা। রাজার স্বর আবেগ-কম্পিত। সে একেবারে আমার কাছটিতে এগিয়ে আসে।

কত সময় চলে যায় জানি না। শেষে দেখি বাইরে দিনের আলো ফিকে হয়ে এসেছে। সন্ধ্যায় একটি মাত্র তারা আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

—চল রাজা।

—কোথায় ?

—তাজমহলে।

দুজনা হাত ধরাধরি করে তাজমহলে প্রবেশ করি। আজ আর কোন লজ্জা, কোন সংকোচ আমাকে বাধা দিতে পারল না। আমাদের এ সম্পর্ককে বাদশাহ, অনুমোদন করেছেন। হয়তো এভাবে প্রকাশ্যে যাওয়াতে আমার সম্মান কিছুটা নষ্ট হল, কিন্তু সম্মান ফিরে পাবার অনেক সুযোগ আসবে। আজকের এই সুযোগ জীবনে আর না-ও আসতে পারে।

মায়ের সমাধির পাশে গিয়ে দাঁড়াই দুজনা। স্তব্ধ পবিত্রতা বিরাজ করছে সেখানে। বাতিগুলি সমাধির চারপাশে নিঃশব্দে পুড়ে চলেছে। রাজা মাথা নত করে। হিন্দুর ছেলে সে। দেখে মনে হয় ঠিক যেন মায়ের আশীর্বাদ মাথা পেতে নিচ্ছে। সুন্দর লাগে দেখতে। নয়ন ভরে দেখে নিই ওকে।

—এই মুহূর্তে এই বিরাট তাজমহলের শ্বেতমর্মর প্রচণ্ড শব্দ করে একসঙ্গে ভেঙে পড়তে পারে না রাজা ?

—লাভ কি ? এ মৃত্যুতে তো বীরত্ব নেই।

—তা নেই বটে। কিন্তু দুজনা একসঙ্গে মরতে পারতাম।

—না। তুমি বেঁচে থাকো জাহানারা।

—বড় স্বার্থপর তুমি।

রাজা হাসে। দুষ্টুমি করে বলে,—বেশ ভেঙে পড়ুক তবে। এমন একটি সৌন্দর্য পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাক।

রাজার মুখ চেপে ধরে বলি,—ভয় নেই। অক্ষয় হয়ে থাকবে তাজমহল। এর প্রকৃত শিল্পী এক অসাধারণ পুরুষ।

—দেখেছ তাঁকে ?

—হ্যাঁ।

—কেমন দেখতে ?

—ঠিক তোমার মতো।

—আমার মতো এই এতবড় দেহ শিল্পীর ?

অনেকক্ষণ ভেবে, শেষে হতাশ হয়ে বলি,—তা তো মনে নেই। কিন্তু তার চোখদুটি ঠিক তোমার চোখের মতো।

—তাকে ভালবেসেছিলে বুঝি।

—খুব। কত বছর আগের কথা। তোমার নামও শুনিনি তখন। এই শিল্পীকে

আমি বোধহয় হৃদয় দিয়ে ফেলেছিলাম।

—ভাগ্যবান সে।

—না. ভাগ্যাহত সে। আমার ভালবাসায় অভিশাপ আছে রাজা।

—না। তোমার ভালবাসায় আশীর্বাদ রয়েছে জাহানারা।

—সান্ত্বনা দিচ্ছ।

—একটুও না। আমার যা বিশ্বাস তাই বলছি। শিল্পীর কি বিশ্বাস ছিল জানি না।

—সে আমার পরিচয় জানত না রাজা। শুধু একবার একটু সময়ের জন্যে দেখেছিল।

রাজাকে সব কথা খুলে বলি।

রাত হয়।

মৌলবী একহাতে বাতি নিয়ে দূর থেকে ধীরে ধীরে সমাধির দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি আমাদের দিকে না চেয়ে সমাধির পাশে সযত্নে রক্ষিত কোর-আন খুলে বসেন।

—মৌলবী সাহেব।

মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চান তিনি।

—আমরা রয়েছি, অসুবিধা হবে না?

—আমি তো জানতাম না মা তোমরা রয়েছ।

—আমাদের দেখতে পান নি?

—না। খেয়াল করি নি।

অবাক্ হই। তাঁর সৌম্য মুখের দিকে চেয়ে মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। তাজমহলের উদ্বোধনের দিনের কথা মনে হয়। ঠিক আগের মতোই চেহারা রয়েছে—বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। পৃথিবীতে রাজত্ব পেলে বাদশাহ্ শাহজাহানের মতো দ্রুত চেহারার পরিবর্তন হয়। কিন্তু তারও ওপরের রাজত্বের সন্ধান পেলে বয়স আর চেহারা যেন নিজেদের কাজ করতে ভুলে যায়।

—আমাদের আশীর্বাদ করুন।

—আমার আশীর্বাদের প্রয়োজন কি? এখানে যিনি রয়েছেন তাঁর আশীর্বাদই তো যথেষ্ট। পাশাপাশি তোমাদের দুজনকে দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন—আশীর্বাদ করেছেন। কিন্তু তোমরা কে? এই সময়ে এলে কি করে?

একটু ইতস্তত করি। চিনতে পারেননি তিনি শাহানশাহ্ শাহজাহানের দুহিতাকে। কি করেই বা চিনবেন? তাঁর জগতে তিনি একা—একচ্ছত্র। সেখানে বাদশাহেরও কোন মূল্য নেই।

—আমি জাহানারা।

তিনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখ পবিত্র

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—মায়ের কাছে এসেছ? খুব ভাল করেছ। ইনি কে? ও, বুঝেছি।

লজ্জা পাই। অপাঙ্গে রাজার দিকে চেয়ে দেখি তার চোখে কৌতুহল।

—এঁকে আশীর্বাদ করুন মৌলবী সাহেব। ইনি কাল প্রত্যুষে যুদ্ধযাত্রা করেছেন।

—তুমি কি পার্থিব সুখের জন্যে আশীর্বাদ চাইছ জাহানারা? তবে ভুল করেছ মা।

ছত্রশাল তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—না, পার্থিব সুখ নয়। সুখ বলতে আপনি যা বোঝেন, তাই চাইছি।

মৌলবী আনন্দিত হন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে রাজার দিকে চেয়ে বলেন,—তার অর্থ যে দুঃখ।

আমরা চুপ করে থাকি।

মৌলবী ধীরে ধীরে বলেন,—তোমাদের মনকে আমি জানতে পেরেছি। খাঁটি প্রেম মানেই তো দুঃখ। এই যে ইনি শায়িত রয়েছেন এখানে—মনে হয় কত দুঃখের। তোমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করলাম জাহানারা।

বুকের ভেতরে আমার কেঁপে ওঠে। কিন্তু রাজা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে আমার হাত ধরে। আমি তাড়াতাড়ি মায়ের সমাধি থেকে একটি তাজা ফুলের মালা তুলে রাজার সঙ্গে বাইরে যাই।

নির্জন উদ্যান। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। আমি রাজার গলায় মালা পরিয়ে দিই। রাজার চোখ চিকচিক করে ওঠে। সে বলে,—এ মালা আমার গলায় থাকবে জাহানারা।

—আর তো দেখা হবে না।

—না কাল ভোরেই চলে যাব।

মনে মনে ভাবি, রাজা যদি বাদশাহ্ হত? আর আমি যদি তার বেগম হতাম, আজ সারারাত তাকে জড়িয়ে ধরে থাকতাম। কিন্তু উপায় নেই। হারেমে সে থাকতে পারে না। আমিও হারেমের বাইরে যেতে পারি না রাত্রে। এই শেষ। হয়তো শেষ বিদায়। রাজার নরম চুলে ভর্তি মাথা দুহাত দিয়ে নামিয়ে এনে আমার বুকের মধ্যে চেপে ধরি।

ইতিহাস আমি লিখছি না। ইতিহাস লেখার জন্যে অনেক গুণী কলম উঁচিয়ে অপেক্ষা করছেন। শাহানশাহ্ শাহজাহানের রাজত্বকালের সব ঘটনাও তাঁরা নিশ্চয়ই দিনের পর দিন লিখে যাচ্ছেন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকের এই অশান্তির কথাও হয়তো বাদ যাবে না। যদি ঘোর অমঙ্গল কিছু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে,

সন্দেহে তাও টুকে রাখবেন এঁরা। তারপর শাহ্‌জাহানের দিন ফুরিয়ে ব একদিন। তক্ত-তাউসে নতুন বাদশাহ্‌ এসে বসবেন। কে সেই নতুন শাহ্‌ কেউ জানে না এখন। কিন্তু একদিন জানবে। তখন তাঁর জয়গান, র কীর্তি-কাহিনীও লেখা শুরু হয়ে যাবে। সত্যি-মিথ্যে অনেক কিছুই মিশানো কে এসব লেখায়। তবু মূল্য রয়েছে এর। কারণ মোটামুটি সব ঘটনাই তাতে ত থাকে।

মার লেখার কোন মূল্যই নেই। নিজের খুশীমতো যা যখন মনে আসে লিখি। লেখা যদি কয়েক যুগ পার হয়ে কারও হাতে গিয়ে পড়ে, সে আমার নিজস্ব ভাধারারই পরিচয় পাবে মাত্র। আর কিছু নেই।

বু লিখে চলি। না লিখে থাকতে পারি না। সেই কবে কৈশোর আর বনের সন্ধিক্ষণে পিতার কাছ থেকে দুখানা কিতাব পেয়ে অনুপ্রেরিত য়ছিলাম—তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমিও বুঝি মুঘল-দুষীদের একজনের মতো হতে পারব। আজ এতদিন পরে বুঝতে পারছি শার মরীচিকার পেছনে ছুটেছি শুধু। হয়তো আমি বিদুষী। কিন্তু প্রতিভার টেফোঁটাও নেই আমার মধ্যে। থাকলে এমন স্বার্থপরের মতো লিখতে পারতাম । আমি বুঝতে পারি, এ লেখায় আমার অন্তরের আর বাইরের জ্বালাই শুধু কট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে সঞ্চারিত হবার মতো কোন গুণই এ নার নেই। তবু থামতে পারি না। অনেক দিনের পুরোনো অভ্যাস যে।

জা বিদায় নেবার পর কয়েকদিন হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ নেই কোন। নেছি সামুগড়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আর শুনেছি মুরাদ আওরঙজেবের পক্ষ য়ে লড়ছে।

নিজের ঘরে এসে শত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখে জল আসে না। বুকের ভেতরে আনচান রে, অথচ চোখ শুকনো। শয্যায় উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কত দুঃখ, কত ষ্টের কথা ভাবি। তবু কান্না আসে না। নারীর পক্ষে মাঝে মাঝে চোখের জল ফলতে না পারা যে কতখানি দুঃসহ, নারী ছাড়া সে কথা আর কে বুঝবে?

াইরে বেলা বাড়তে থাকে। একটু পরেই খাবার নিয়ে আসবে ঘরে। এখনো স্নান য় নি। নহরী-বেহস্ত-এর মতো কৃত্রিম কল্লোলিনী এখানকার কোন কক্ষের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় নি। তবু এখানকার জল গায়ে দিলে প্রাণ জুড়োয়। আমার ছেলেবেলাকার অনুভূতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

শয্যা ছেড়ে উঠতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ি। ভাল লাগে না কিছু। পৃথিবীর কো
কিছুতে আর আকর্ষণ নেই। কেন যেন ভবিষ্যতে রাজার পরশ লাভের আশায় বু
বাঁধতে পারছি না। মন ডেকে বলছে, এ আশা নয়—দুরাশা। মৌলবীর কথা
ঠিক। খাঁটি প্রেম মানেই দুঃখ।

চোখে জল আসে এতক্ষণে। কী শান্তি। কোথায় ছিল এই জলরাশি। যমুনা ব
শুকিয়ে গিয়েছিল?

বাইরে শুনতে পাই কোন খোজার পদশব্দ। আমার দরজার পাশে এসে থে
যায়। কাকে যেন সে ঘর অবধি পৌঁছে দিল। নতুন কে আসবে? হয়তে
রোশনারার নাজীর কিংবা অন্য কেউ। তাকাই না আমি। এভাবে আমা
দেখলে আসতে সাহস পাবে না।

যদি রাজা হয়? পর্দা তুলে হয়তো আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। এখনি ছুটে এ
অনায়াসে সে আমার দেহখানাকে তুলে ধরবে। না, না। কী ভাবছি? এ
অসম্ভব।

পর্দা ছেড়ে দেবার মৃদু শব্দ হয়।

মনে হয় বহুদূর থেকে কে যেন ডাকে,—শাহ্‌জাদী।

নারী কণ্ঠ। নিজের যুক্তিতর্ককে পরাস্ত করে যে অবাধ্য প্রদীপটি এখনি মনের মধ্যে
জ্বলে উঠেছিল, সেটি দপ্‌ করে নিভে যায়। রাজা নয়।

—শাহ্‌জাদী। কণ্ঠস্বর গাঢ় এবারে।

এ সম্বোধন কে করবে? আমি যে অনেক বছরের বাদশাহ্‌-বেগম। কণ্ঠস্বর ঠি
পরিচিত নয়, অথচ খুবই চেনা। বুঝতে পারি না।

দৃষ্টি ফেরাই দরওয়াজার দিকে। সাদা ওড়নায় ঢাকা মুখ।

—কে তুমি?

—আমায় চিনলেন না শাহ্‌জাদী? আমি তো চিনেছি আপনাকে।

—তোমায় আমি খুব চিনি। অথচ—

ধীরভাবে থেমে থেমে সে বলে,—বলেছিলাম আপনার দুঃসময়ে আবার ফিরে আস
তাই এসেছি। আমি কোয়েল।

—কোয়েল! তুমি! আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল যে তুমি ফিরে এসেছ?
না। তুমি কোয়েলের প্রেতাত্মা। কিংবা আমি স্বপ্ন দেখছি।

—আমি সত্যিই কোয়েল শাহ্‌জাদী।

—তোমাকে আমি ধরতে পারব? তোমার গায়ে হাত দিয়ে তোমাকে আমি স্
করতে পারব? বল কোয়েল।

—এই তো আপনার গায়ে হাত দিলাম।

—কী আশ্চর্য। যখন নিজের লোক একে একে পর হয়ে যাচ্ছে, তখন এতো বড় ব্যতিক্রম কেন হল কোয়েল? তুমি যে আমার নিজের লোক। তোমার সুখের জন্যে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার যে কত বড় ক্ষতি হয়েছে, তা যদি জানতে কোয়েল। আমি দিনের পর দিন মুখ বুজে সে ক্ষতি সহ্য করেছি। কাউকে বলি নি। আমার বুকের ব্যথা প্রতি পলে সূঁচ ফুটিয়েছে, তবু—।

আমাকে জড়িয়ে ধরে কোয়েল। সে তো নাজীর নয়। সখ করে আমার নাজীর হতে এসেছে। এত দুঃখেও শান্তি পাই। এভাবে আমাকে ধরার অধিকার আর শুধু একজনেরই আছে—সে এখন সামুগড়ের যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে বেড়াচ্ছে।

—শাহ্‌জাদী। আগে তো আপনি বিচলিত হতেন না।

—এখনো হই না কোয়েল। কিন্তু আঘাতের পর আঘাত যখন এসে হানে তখন অন্তত একজনের কাছে বিচলিত না হতে পারলে যে পাগল হয়ে যাব কোয়েল।

—শাহ্‌জাদা সুজা সসৈন্যে বাঙলা ছেড়ে দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন শুনে বুঝলাম অঘটন কিছু ঘটেছে।—এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করি নি। ছুটে এসেছি। শাহ্‌জাদা পরাস্ত হয়ে পথের মাঝে সৈন্যদল নিয়ে বসে রয়েছেন। আমি পাশ দিয়ে চলে এসেছি। ভেবেছিলাম বাদশাহ্‌ মৃত। কারণ পথে যাকে বাদশাহের কথা জিজ্ঞাসা করেছি সে-ই আকাশের দিকে হাত উঁচিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কেমন করে এমন হল শাহ্‌জাদী।

—আমীর খাঁয়ের কৌশল। সে-ই রটিয়েছে এ সব। বাদশাহ্‌ উত্থানশক্তি রহিত। তাঁকে যদি একবার আগ্রা দুর্গের মাথায় এনে খাড় করাতে পারতাম, তাহলে ওরা বুঝতে পারত কতখানি হীন ষড়যন্ত্র তাদের প্রিয় বাদশাহের বিরুদ্ধে করা হয়েছ। কিন্তু উপায় নেই। তাঁকে তুলতে গেলেই হয়তো শেষ হয়ে যাবেন। হাকিমের আশঙ্কাও তাই।

কোয়েল স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে আমার মাথার বিনুনি নিয়ে খেলা করে। অতীতের দিনগুলির সঙ্গে এখনকার দিন মিলিয়ে নিয়ে সে নিজের মনকে শান্ত করছে। বাধা দিই না আমি। সময় নিক সে। ধাতস্থ হোক।

পর্দা আবার দুলে ওঠে। নাজীর সসঙ্কোচে মুখ বাড়িয়ে বলে,—খানা।

আমি কিছু বলার আগেই কোয়েল বলে, —নিয়ে এসো।

নাজীরের মুখ অন্তর্হিত হয়।

—কেন আনতে বললে কোয়েল। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে নেই।

—তবু খেতে হয় শাহ্‌জাদী। জীবনে এ এক অদ্ভুত নিয়ম। দুঃখ ভোগ করার

জন্যেও খেতে হয়। নইলে সব দুঃখের জ্বালা জল হয়ে যায়।

—সেই তো ভাল।

—সত্যি কি তাই? আমার তো মনে হয় দুঃখ ভোগের মধ্যেও আনন্দ আছে। সে এক রক্তাক্ত আনন্দ।

মনের মধ্যে শিল্পী সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে প্রবল ইচ্ছা জাগে, অথচ কেন যেন মুখের সামনে প্রশ্ন এসে থেমে যায়। শিল্পীকে কি আবার সঙ্গে করে এনেছে কোয়েল? এতদিন পরে নিজের সৃষ্টি দেখতে সে কি আগ্রায় ফিরে এসেছে?

—শাহ্‌জাদী।

—বল।

—কে উনি?

চমকে উঠি। প্রশ্ন করি,—কার কথা বলছ কোয়েল?

—যাঁর কথা ভেবে আপনার দেহ-মনের এই অবস্থা?

—বাদশাহের ঘর থেকে একবার ঘুরে এস কোয়েল। বুঝতে পারবে।

ম্লান হাসে কোয়েল। আমার বুকের ওপর হাত রেখে বলে;—তাতে কি বুক এত ফুলে ফুলে ওঠে? শাহ্‌জাদী, আমি অভিজ্ঞ।

উত্তর দেবার ভাষা খুঁজে না পেয়ে কোয়েলের হাতখানা আরও জোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরি। যে-আগুন জ্বলছে সেখানে সে আগুনে ওর হাত দগ্ধ হবে হয়তো। তবু শীতলতার পরশে একটু আরাম বোধ করব।

—বলবেন না শাহ্‌জাদী?

—আমাকে কি এতই স্বার্থপর ভাব কোয়েল, বাদশাহের এই দুর্দিনে আমি ব্যক্তিগত কারণে বিচলিত হব?

—না। স্বার্থপরতা আপনার মধ্যে নেই। তবু দুঃখ প্রকাশের পথ এক এক ক্ষেত্রে এক এক প্রকারের। আপনি নারী, আপনাকেও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? অভিজ্ঞতা আপনার অতটা হয়েছে কিনা জানি না; কিন্তু এ-জিনিস যে জন্মগত।

—তুমি এক আশ্চর্য নারী কোয়েল।

—না। আমি অতি সাধারণ নারী। তবে আমার মতো আপনার মনকে যাচাই করার দুঃসাহস কারও হয় নি। হলে যে-কেউ বুঝতে পারত।

আমি থেমে থেমে বলি,—ছত্রশাল, কোয়েল।

—বুন্দীরাজ?

ঘাড় নেড়ে জানাই হ্যাঁ।

—কতদিন?

—বহুদিন। আগ্রা ছেড়ে যাবার আগেই এক অগ্নিকাণ্ডের সূত্র ধরে।

কোয়েল নীরব। সে আমাকে প্রশ্ন করে না। সে বুঝে নিয়েছে—সব কিছু বুঝে নিয়েছে। তবু তাকে একে একে ঘটনাগুলো বলে যাই। অশ্রুসজল চোখে সে শুনে যায়। মনে হয়, যেন আমার মন, আমার হৃৎপিণ্ড তার দেহ-মনে কাজ করে চলেছে। নাজীর খানা রেখে গিয়েছে। সে খানা তেমনি পড়ে থাকে। কোয়েলও অনুরোধ করতে ভুলে যায়।

শেষে আমিই ওকে সজাগ করার জন্য বলে উঠি,—অনেক তো শুনলে। এবার তোমার কথা বল।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ। প্রথমে বল, কিভাবে হারেমে প্রবেশ করলে? প্রহরীরা বাধা দেয় নি?

—না। তাদের মনে কোন সন্দেহই জাগে নি। কিভাবে জাগবে? এখানকার হালচাল সবই আমার জানা।

—এবার বল তোমার কথা।

—এখন কি আমার কথা শোনার ধৈর্য আপনার হবে শাহ্‌জাদী? সে অতি সামান্য কাহিনী।

—সামান্য? তোমার কথা সামান্য? শিল্পীর কথা সামান্য?

—আপনি মহৎ শাহ্‌জাদী।

—না। শিল্পী আমার মনের এক বিশেষ তন্ত্রীতে প্রথম ঝংকার তুলেছিল। তুমিও জানতে সে কথা। এ ক্ষেত্রে মহৎ হবার মতো নির্লিপ্ততা আমার নেই। বল কোয়েল তোমার কথা।

মাথা নীচু করে কোয়েল। সেইভাবেই বসে থাকে সে বহুক্ষণ। যখন সে মাথা তোলে, মুখখানা তার জলে ভেসে যাচ্ছে। নিঃশব্দে চেয়ে দেখি আমি। কোয়েলের মুখ বন্ধ।

—শাহ্‌জাদী।

—কোয়েল।

—কিছু মনে করবেন না শাহ্‌জাদী। আমি না জেনে অতীতের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম আমি আগ্রার হারেমে বসে আছি, আর সামনে রয়েছেন আপনি।

—এমন হয় কোয়েল।

—শাহ্‌জাদী, একটি দিনের তরেও সে শান্তি পায় নি।

আমার বুক কেঁপে ওঠে। সে শান্তি পাবে না জানতাম। কিন্তু এতদিন পরে সেই

কথাই স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়ে মন বিষণ্ণতায় ভরে যায়।

—শাহ্‌জাদী, সৃষ্টির ব্যর্থ বেদনায় সে মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যেত। তখন আমাকেও চিনতে পারত না। একজন অশরীরী দেবীর সঙ্গে একমনে কথা বলে যেত। প্রথম প্রথম বুঝতাম না সে কে। পরে বুঝেছিলাম।

—কে?

—আপনি। আপনাকে সে জীবনে একটি দিনের তরেও ভুলতে পারে নি। তাকে দেখে মনে হত সে যেন স্পষ্ট আপনাকে দেখতে পাচ্ছে। সেইভাবে কথা বলে যেত। সে ভাবত আপনি ক্রমাগত অনুযোগ করে চলেছেন আপনার মূর্তি তৈরি হয় নি বলে। সান্ত্বনা দিত তাই আপনাকে। আশ্বাস দিত। তারপরই নিজের আঙুলের দিকে লক্ষ্য পড়ত। উন্মাদ হয়ে যেত সে। প্রথম প্রথম মাঠ-ঘাট পার হয়ে দিগন্তের দিকে ছুটে যেত সে। পেছনে পেছনে আমিও ছুটতাম। অনেক সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এইভাবে ছুটেছি। শেষে সে একসময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত। সবকিছু মনে পড়ে যেত তার। আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে শিশুর মতো কেঁদে উঠত। ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম ঘরে।

কোয়েল থামে। আমি অশ্রুসিক্ত চোখে চেয়ে থাকি তার দিকে।

—শাহ্‌জাদী, সে যখন শান্ত থাকত, তখন সে একান্ত আমার। আমাকেও সে ভালবেসেছিল। কিন্তু পাগল হলেই আমাকে ভুলত। বড় রাগ হত আপনার ওপর। আপনার কথা যাতে মনে না হয় সেজন্যে পাগলামীর উপক্রম হতেই একতাল মাটি এনে দিতাম সামনে। মাটি দিয়ে সুন্দর নারীমূর্তি গড়ে তুলত, ডান হাতের চার আঙুলের সাহায্যে। আমি সযত্নে সেগুলো শুকিয়ে রাখতাম। কিন্তু বেশীদিন রাখতে পারতাম না। লুকিয়ে সে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলত।

—কেন?

—সে চাইত পাথরের মূর্তি গড়তে, মাটির নয়। সে ভাস্কর।

—তাকে এনেছ সঙ্গে?

থরথর করে কেঁপে ওঠে কোয়েলের দেহ। আমার দিকে নির্বোধের মতো চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে,—সে নেই।

—নেই!

—না পনেরো বছর বেঁচে ছিল। শেষে—

—শেষে?

—আত্মহত্যা করেছে।

বাদশাহ্‌, শাহ্‌জাহানের কথা ভুলে যাই। সামুগড়ের যুদ্ধের কথা মনে থাকে না।

ব্রশালের কথাও মন থেকে অপসারিত হয় মুহূর্তের জন্যে। চোখের সামনে ভেসে ঠে বহু বছর আগের নির্মীয়মান তাজমহলের পথের ওপর যমুনার ধারে দেখা এক রুণ মুখের ছবি। সে মুখে সেদিন দেখেছিলাম আশাতীত সম্ভাবনা আর উচ্ছাশার তিচ্ছবি। আমার চোখের অশ্রু এবারে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে।

-শাহ্‌জাদী, তাকে আপনার পরিচয় দিয়েছি। সব বলেছি খুলে।

-খুব ঘৃণা হল তার। তাই না?

-না। শুধু বলেছিল, আমাকে আগে বল নি কেন? এরপর আর কথা বলতে ারে নি। বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

ব্ধ হয়ে বসে থাকি আমি। কোয়েল নীরব। দেশে গিয়েই কেন সে আমার কথা :ল দেয় নি জানি না। সেইরকমই কথা ছিল।

াই সময়ে একজন নাজীর ছুটে আসে। বাদশাহ্ এই মুহূর্তে আমাকে ডেকেছেন। সময়, তিনি কখনো ডাকেন না। নিশ্চয় শরীর খুব বেশী খারাপ হয়েছে।

াড়াতাড়ি কোয়েলকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করি।

-কে? জাহানারা? দেখ্ তো একটা পায়রা এসে বড় জ্বালাতন করছে আমার। কছুতেই চোখ বন্ধ করতে দিচ্ছে না। বার বার মুখে পাখার ঝাপ্‌টা মারছে।

মস্ত বুকখানাকে খালি করে দিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠি,—কোথায় সে? কাথায়?

ামার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী ঘুরতে থাকে। শত চেষ্টাতেও দাঁড়িয়ে থাকতে ারি না। কোয়েলকে চেপে ধরি শক্ত করে।

াদশাহ্‌কে বলতে শুনি—এই তো এখানে ছিল। কোথায় গেল? কিন্তু তুই অমন য় পেয়ে গেলি কেন জাহানারা?

মামি কোনদিকে তাকাতে পারি না। তাকাতে চাই না। কি দেখব আমি জানি। পারাবতের গায়ে রক্ত মাখানো। সে রক্ত হাওয়ায় শুকিয়ে গিয়েছে। আমি জানি। মার কিছু হতে পারে না। হলে ওটি আসত না এখানে। অমন ব্যাকুলভাবে অসুস্থ বাদশাহ্‌কে উত্যক্ত করে তুলত না। আমি সব জানি। আমার জীবনের সব াধ সব আনন্দ নির্মূল হল আজ। যোগ্য প্রতিশোধই নিলে নজরৎ।

কায়েল ধীরে ধীরে বলে—জানালায় বসে রয়েছে শাহ্‌জাদী।

কতক্ষণ কেটে যায় জানি না। বুঝতে পারি কে যেন আমার মাথায় হাওয়া দিচ্ছে। চোখ মেলে দেখি কোয়েল। বাদশাহের দিকে চাইতে পারি না। সেদিকেই যে জানালা।

—ওটি কোথায় কোয়েল?

—এখনো জানালাতেই বসে রয়েছে।

—নিয়ে এসো।

—ধরতে পারব?

—ধরা দেবার জন্যেই বসে রয়েছে। নিয়ে এসো।

কোয়েল সেটিকে এনে কাছে এসে বলে,—এর গায়ে—

—চুপ। আমার ঘরে এসো। ওটিকে তোমার ওড়নার নীচে ঢেকে রাখো।

—জাহানারা।

—পরে আসব বাবা। এখন আমি যাই।

—কিন্তু কী হয়েছে?

—বলছি এসে।

ঘরে এসে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করি। পায়রা তখনো কোয়েলের ওড়নার নীচে। বলে উঠি,—ওর গায়ে রক্ত, তাই না কোয়েল?

—হ্যাঁ শাহ্‌জাদী।

—আমি জানতাম।

—কিন্তু কি করে?

—সেই রকমই কথা ছিল।

সব সংশয়ের অবসান। সব চিন্তার শেষ। এক গভীর দুঃখ আমার দেহ-মনকে নিস্তেজ করে তোলে। মৌলবীর কথা কানে বাজে,—খাঁটি প্রেম মানেই তো দুঃখ।

—কিছুই বুঝতে পারছি না শাহ্‌জাদী।

—ছত্রশাল আর নেই। তারই শেষ রক্ত বহন করে এনেছে কপোতটি।

কোয়েল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

আমিও তোমার দলে কোয়েল। ভয় কি? আমার বুকের সঙ্গে দৃঢ়-নিবদ্ধ ছত্রশালের উপহার দেওয়া কাঁচুলি। যেন তারই স্পর্শ অনুভব করছি। এ কাঁচুলি যদি আর কখনো খুলতে না হতো, বেশ হতো।

ছত্রশাল নেই। নেই। পৃথিবী আর তার পদভরে কম্পিত হবে না। বাতাস আর তার গানের সুরে উন্মত্ত হবে না। সবকিছুর শেষ। আমার কাছে পৃথিবী চিরকালের মতো শুকিয়ে গেল। তবু আমি বেঁচে আছি। আরও কতদিন হয়তো বাঁচব। এই কয় বছর শুধু নীরব কর্তব্যই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে—আর কিছু নয়।

সামুগড়ের যুদ্ধ শেষ। আওরঙজেব জয়ী। দারা বিতাড়িত। ছত্রশাল আর দায়ুদ খাঁয়ের কথা সে অবহেলা করেছে। তারই ফল হাতে হাতে পেয়েছে। খলিলুল্লাই শেষ পর্যন্ত তার পরম বিশ্বস্ত অনুচরের রূপ নিয়ে সর্বনাশ করল। তারই চক্রান্তে নিশ্চিত জয় শোচনীয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হল। প্রতিশোধ নিয়েছে খলিলুল্লা। এ প্রতিশোধ দারার বিরুদ্ধে নয়, স্বয়ং বাদশাহের বিরুদ্ধে।

দারা আর ফিরতে পারবে না জানি। পুত্র আর পরিবার নিয়ে এখন দিনের পর দিন দুর্গম পথ ভেঙে তাকে এগিয়ে যেতে হবে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে। জানি না কোথাও ঠাঁই পাবে কি না। ময়ূরাসনের আশা তার টুট্‌লো।

—বাদশাহ্‌-বেগম ?

তীব্রস্বরে চমকে উঠি। চেয়ে দেখি দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে রোশনারা। চোখদুটো তার জল্‌জল্‌ করছে। মহামূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত সে। বহুদিন পরে সে আমার ঘরে এল।

—রোশনারা ?

—হ্যাঁ। চিনতে পারছ না ?

—বাইরে যাচ্ছিস ?

—হ্যাঁ। যাবে তুমি ?

—না।

—এত মন-মরা কেন বাদশাহ্‌-বেগম ?

—আমাকে তুই তো কখনো বাদশাহ্‌-বেগম বলে ডাকিস নি।

—আজ ডাকছি। এরপরে এ-ডাক শোনার তো সৌভাগ্য হবে না তোমার।

—ও। তা বেশ করেছিস।

—আওরঙজেব কোথায় জান ?

—না।

—আর পাঁচ ক্রোশের মধ্যে।

চমকে উঠি। এত তাড়াতাড়ি ? মুখের একটা রেখাও যাতে কুঞ্চিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখি।

—আজই এসে পৌছবে বুঝি !

—হ্যাঁ। তাই তো এগিয়ে যাচ্ছি। অভ্যর্থনা করব বলে।

—যা।

—যদি বাঁচতে চাও তুমিও চল।

হেসে বলি,—বাঁচতে আমি চাই না রোশনারা।

—ও। বিদ্রূপ ফুটে ওঠে রোশনারার কথায়। দাঁত দিয়ে সে নীচের ঠোঁট কামড়ে

ধরে। তারপর এক ঝটকায় বার হয়ে যায়।
সত্যিই হাসি পায় আমার।' জীবন আর মৃত্যুর সীমারেখা আমার কাছে যে কত তুচ্ছ রোশনারা তা কী করে অনুভব করবে? তাই সে বিদ্রূপ করে চলে গেল। আওরঙজেব শুনবে একথা। হয়তো শাস্তিও দেবে আমাকে। কাউকে নিষ্কৃতি দেবার মতো উদারতা তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। এ পর্যন্ত ভাইদের কেউ খুন হয় নি তার হাতে। হলেও বিন্দুমাত্র বিস্মিত হব না। যেভাবে দারাকে কাফের বলে ঘোষণা করে চলেছে, ভয়ই করছে আমার। তবে বাদশাহের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলে নি এ পর্যন্ত। বলতে বোধ হয় সাহস হচ্ছে না। দেশবাসীর ওপর শাহানশাহ্, শাহজাহানের অসীম প্রভাবের কথা ভেবে সে ভীত। সে জানে বাদশাহ্ যদি সুস্থ থাকতেন, তাহলে সারা ভারতের সৈন্যদল নিয়েও একা বাদশাহের বিরুদ্ধে সে অভিযান করতে পারত না।
কিন্তু আর তো সময় নেই। সহজে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেব না আওরঙজেবকে। বাধা দিতে হবে। দেখাতে হবে বাদশাহ্ অক্ষম হলেও তাঁর শক্তি একেবারে নিঃশেষিত নয়। রোশনারা যত সহজে হারেম থেকে বাইরে গেল অত সহজে তাকে আর ফিরতে দেব না। তার প্রিয়তম ভাই-এর শিবিরে দু-চারদিন কাটিয়ে অমন সোনার মতো গায়ের রঙ একটু কালো করে আসুক।
বাদশাহের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হই। তাঁর মতামতটা জানতে হবে। তাঁর অমতে কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব।
সেই একইভাবে বাইরে চেয়ে ছিলেন পঙ্গু বাদশাহ্।
—বাবা।
—কে জাহানারা? শুনেছিস?
—হ্যাঁ বাবা।
—দারা ময়ূরাসনের উপযুক্ত নয়। আমি বরাবরই জানতাম সেকথা। আজ সে পথের ভিখিরী হয়ে অজানার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে জাহানারা। তবু তাকে তক্ত-তাউসের উপযুক্ত বলে মনের কাছ থেকে সায় পাচ্ছি না। আমি যদি আওরঙজেবের বুদ্ধি আর দারার হৃদয় দিয়ে মেশানো একটি পুত্র পেতাম জাহানারা। তুই যদি আমার পুত্র হতিস।
—আওরঙজেব আগ্রার দুর্গ অধিকার করতে আসছে বাবা।
—সে তো আসবেই। এখানে যে আমি রয়েছি। অপমানের দিন শুরু হল জাহানারা।
—আমি বাধা দেব।

—বাধা? কি দিয়ে? লোক কই?

—যা আছে তাই দিয়ে। তাছাড়া আমাদের সুবিধা বেশী।

—বেশ। যা খুশী কর।

এত তাড়াতাড়ি অনুমতি পাব ভেবে পাই নি। কারণ প্রস্তাবটি প্রস্তাবই নয়। লক্ষ সৈন্যে বলীয়ান আওরঙজেবকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে দিয়ে বাধা দেওয়া পাগলের কল্পনা। তবু বাদশাহ্ অনুমতি দিলেন শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে। আর দিলেন একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে ভেবে। তাঁর ধারণা যারই সৈন্যদল হোক না কেন শাহানশাহ্ শাহজাহান জীবিত আছেন জানলে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না।

আওরঙজেবের সৈন্যদল এসে উপস্থিত হয় বিকেলের দিকে। দূর থেকে তাদের দেখে বাদশাহ্‌কে খবর দিই। তিনি নিশ্চিন্তে ঘাড় নাড়েন শুধু।

প্রবেশদ্বার খোলা থাকবে ভেবেই হয়তো দ্রুত এগিয়ে আসছিল আওরঙজেব। রোশনারার কাছ থেকে এখানকার সব সংবাদ পেয়েছে সে। কিন্তু দুর্গ বন্ধ দেখে সদলবলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বুঝতে পারে না, ইতিমধ্যে এমন কি ঘটেছে যার ফলে দ্বার রুদ্ধ।

আমাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের কোন চেষ্টাই করা হবে না। আমার নির্দেশও তাই। শুধু দেখতে হবে বাইরে থেকে একটি প্রাণীও যেন ভেতরে আসতে না পারে। আওরঙজেব সত্যিই সুচতুর, সে জানে, আক্রমণের শক্তি, আমাদের নেই। তাই কোনরকম হৈচৈ না করে সে তার সৈন্যদলকে নিয়ে ঘিরে বসে থাকল আগ্রার প্রাসাদ।

একদিন। দুদিন। তিনদিন।

দিন যায়। উভয় পক্ষই নিশ্চেষ্ট। এমন ফল হবে ভেবে উঠতে পারি নি। আওরঙজেব চায় আমাদের তরফ থেকে আক্রমণ আসুক প্রথমে। সে জানে, আজ হোক, কাল হোক, একদিন মরীয়া হয়ে আমরাই আক্রমণ করব। কারণ অবরুদ্ধ হয়ে থেকে রসদ ফুরোবেই একদিন।

রসদ আমাদের প্রচুর রয়েছে। কিন্তু জল নেই। জলাভাব ঘটল। দিনে দিনে তার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। শেষে বাদশাহের সামনে ধরে দেবার মতো জলেও অনটন দেখা দিল।

সব দায়িত্ব আমার। তাই চিন্তার বলিরেখা আমার কপালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্জনে বসে কোন সিদ্ধান্তে আসার জন্যে প্রাসাদের ছাদের ওপর গিয়ে দাঁড়াই। ঠিক সেই সময়ে একটি তীর এসে আমার পায়ের সামনে পড়ে। তীরের মাথায় একটি পত্র।

খুলে দেখি আওরঙজেব লিখেছে বাদশাহ্‌কে : দারাকে বাদশাহ্‌ করার অভিপ্রায় কোন মুসলমানের ছিল না ! তাই আমাকে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল। নইলে দিল্লীর তক্ত-তাউসে বসার জন্যে আমার মতো সামান্য একজন ফকির লালায়িত নয় কখনই। তক্ত-তাউস আমার প্রিয় ভাই মুরাদের জন্যে সংরক্ষিত। মুরাদ আমার সঙ্গেই রয়েছে। আপনি রাগ করে দুর্গদ্বার বন্ধ রাখবেন না। আপনার আশীর্বাদ আমাদের উভয়েরই পরম কাম্য। তাই জয়ের নেশায় উন্মত্ত সৈন্যদেরও ধৈর্য ধরতে বলেছি। জানি না কতদিন তারা আমার কথা শুনে চলবে। কারণ আপনি অসুস্থ।

চতুর আওরঙজেব। তার পত্রের ছত্রে ছত্রে চতুরতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পত্রটি নিয়ে গিয়ে বাদশাহ্‌কে দেখাই। ম্লান হাসেন তিনি। যে হাসির অর্থ আমি বুঝি। তাঁর কথামতো আওরঙজেবকে লিখি : তোমার শক্তির বিরুদ্ধে সামান্য একটি দুর্গ বেশীক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারবে না, একথা সবাই জানে। তবু দুর্গদ্বার খোলার আগে আমার কয়েকজন লোককে বাইরে থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে আনতে দাও। দুর্গে জলাভাব।

গোপন পথ দিয়ে একজন পত্রবাহক দুর্গের বাইরে যায়, আওরঙজেবের হাতে পত্রটি পৌঁছে দেবার জন্যে এবং তার উত্তর সঙ্গে করে আনার জন্যে। লোকটিকে শিবির-গুলোর দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে দেখে আবার বাদশাহের পাশে বসি।

—তোর কি মনে হয় জাহানারা।

—জল পারো না বাবা।

—আমারও তাই অনুমান। চতুর হলেও এতটা চতুর আওরঙজেব নয় যে আমার লোককে জল নিয়ে আসতে দেবে। সেইখানেই ওর ভয়, ওর অবিশ্বাস। ভাববে, এই কয়দিনের সময় চেয়ে নিয়ে আমি কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে কালক্ষয় করছি। ওঃ জাহানারা, আমিই না শাহানশাহ্‌ শাহজাহান। জ্যোতিষীর কথা কেমন বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে দেখছিস। পুত্রের হাতে অবরুদ্ধ, এরপর হয়তো বন্দী হবো ! চূড়ান্ত অপমান।

বাদশাহ্‌ শয্যার ওপর মাথাটা আছড়ে ফেলেন। আমি নীরব। অক্ষমতা আর অপমানের হাহুতাশ কখনো তাঁকে করতে দেখি না। অসীম সংযম আর মানসিক বলের অধিকারী তিনি। তবু এক এক সময়ে তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। শুধু তখনি মাথাটাকে অমনভাবে আছড়ে ফেলেন।

আমি সহানুভূতি দেখাবার কোন চেষ্টা করি না। জানি, দেখাতে গেলে দ্বিগুণভাবে নিজের অক্ষমতা তাঁকে পীড়া দেবে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবি, সত্যিই কি ইনি

শাহানশাহ্ শাহজাহান ? আপেলের গন্ধ হাত থেকে একেবারে মুছে যাক্।

অনেক পরে পত্রবাহক ফিরে এল—রিক্ত হাত, শুকনো মুখে। আমাদের অনুমান ঠিক হল। পত্রবাহক বলে, চিঠিখানা পড়ে আওরঙজেবের মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। মুহূর্তকাল পরেই সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, এ পত্রের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। তুমি যাও।

ক্রোধে বাদশাহের রেখা-পাণ্ডুর মুখখানাও আরক্তিম হয়ে ওঠে। কাঁপতে কাঁপতে বলেন,—দেখ তো জাহানারা আমি উঠতে পারি কিনা? একবার ধরে তোল আমাকে—প্রাসাদের ওপর দাঁড়িয়ে একবার ঝরোকা-দর্শন দেব শুধু। আওরঙজেব ওর শিবিরের মধ্যে গুঁড়িয়ে যাবে।

কিছু বলি না। পিতাকে তুলে ধরার চেষ্টাও করি না। জানি, তাঁর কথার প্রতিটি বর্ণ সত্যি। কিন্তু তিনি উঠতে পারবেন না। কোনদিনই পারবেন না।

—কী। চুপ করে রইলি কেন?

তাঁর মাথায় আস্তে হাত রেখে বলি,—বাবা, ভাগ্য মাঝে মাঝে বড় নিষ্করুণ হয়ে দেখা দেয়। তবু তাকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

—কিন্তু আমি, শাহানশাহ্ শাহজাহান জীবিত থাকতে—

—হ্যাঁ। অন্য কোন পথ খোলা নেই। দারার শৌর্যের ওপর বিশ্বাস করে ভুল কর নি। ভুল করেছিলে তার বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস করে। ভুলের মাসুল না গুণে উপায় নেই। তুমি অক্ষম—শোচনীয়ভাবে অক্ষম।

এমনভাবে কঠোর সত্য শুনিয়ে ব্যথা পাই। আমার কথাগুলো পিতার উত্তেজনার ওপর যেন মুহূর্তে জল ঢেলে দেয়। তিনি নিস্তেজ হয়ে শুয়ে থাকেন। বুঝলাম, শেষবারের মতো ভাগ্যকেই মেনে নিলেন তিনি। চেয়ে দেখি তাঁর শীর্ণ হাত শয্যার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে শিয়রে রক্ষিত কোর-আন খানা চেপে ধরে শিশুর মতো নিশ্চিন্ত হয়।

খানিক পরে মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন,—ওদের আসতে দে।

—আসতে দেব। কিন্তু দলবল নিয়ে নয়। একা আসুক আওরঙজেব তার পরিবার নিয়ে।

—অতটা বিশ্বাস সে আমাদের করবে না।

—দেখা যাক্। তার পুত্র মহম্মদকে প্রথমে পাঠাতে বলি। সেই কবে ছোটবেলায় আমাদের দেখেছে সে। পিতামহকে একবারে দেখে যাক্।

—মহম্মদকে পাঠালেও পাঠাতে পারে। কারণ মহম্মদের জীবনের কোন আশঙ্কা স্বয়ং আওরঙজেবকে স্পর্শ করবে না।

—এ কী বলছ বাবা ? এত নীচ ভাবো আওরঙজেবকে ? নিজের পুত্রের জীবনের আশঙ্কায় সে বিচলিত হবে না ?

স্পষ্টস্বরে বৃদ্ধ বাদশাহ্ বলে ওঠেন,—না। হবে না।

নিজের নামে আওরঙজেবকে চিঠি লিখি। মনে পড়ে বহুবছর আগে, আমি অগ্নিদগ্ধ হয়ে শয্যাশায়ী হলে বহুদূর থেকে শুধু প্রাণের টানেই ছুটে এসেছিল সে আমাকে দেখতে। তারপর কত বছর কেটে গেল। আওরঙজেবের মনের সেই গুপ্ত নরম স্থানটুকু এতদিনে নিশ্চয়ই পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। পিতার উক্তিতে এইটুকুই প্রতীয়মান হয়, সে এখন আত্মসর্বস্ব। পুত্রের জীবনের মূল্যও তার উচ্চাশার কাছে কানাকড়িও বোধ হয় নয়।

লিখি, শুধু মহম্মদ যেন প্রাসাদে আসে প্রথমে। তারপর ইচ্ছে করলে আওরঙজেব তার পরিবার নিয়ে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সৈন্যদল কখনই নয়—কারণ বাদশাহ্ শাহ্‌জাহান এখনো জীবিত।

পত্রবাহক আবার ছোটে আওরঙজেবের শিবিরে। সবার মতো সেও পিপাসার্ত। একটা মীমাংসার জন্যে সবাই আকুল। তাই সে আবার ছোটে। সৈন্যদের দু-চারজন ইতিমধ্যেই অচেতন হয়ে পড়েছে। বাদশাহ্ নিজের পানীয় জল তাদের দিতে বসেছেন। তিনি নিজে জলাভাবে মরতে রাজী আছেন, কিন্তু আমাদের ফাঁকা জিদের বশে একটি প্রাণীও যেন না মরে—এই তাঁর হুকুম।

বাদশাহের অনুমানই ঠিক। মহম্মদ একা এসে দুর্গে প্রবেশ করে। তার পশ্চাতে পত্রবাহক। বহুদিন পরে দেখলেও দূর থেকে চিনতে কষ্ট হয় না মহম্মদকে। আওরঙজেবের চেহারার ছাপ আছে। আওরঙজেবের চেয়েও বলিষ্ঠ। প্রতিটি পদক্ষেপে মহম্মদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। কোনদিকে না চেয়ে সোজা এগিয়ে আসছে সে। অথচ জানে, এখানে অস্ত্রধারী সিপাহীর অভাব নেই ; আওরঙজেব হলে কখনই এভাবে আসতে পারত না। যা শুনতে পেতাম তাই সত্যি বটে—বড় হৃদয় নিয়েই জন্মেছে মহম্মদ। ময়ূরাসনে আওরঙজেবের পরিবর্তে সে যদি বসে আমি সুখ চাইতে আগে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাব।

পত্রবাহক অন্দরের প্রথম-ঘরটি দূর থেকে দেখিয়ে দিয়ে থেমে যায়। মহম্মদ একা এগিয়ে আসে। আমি ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি। প্রথমেই পরিচয় দেব না। আগে দেখে নেব তাকে—তারপর।

কক্ষে প্রবেশ করে সামনে আমাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে

প্রশ্ন করে,—আমি কি বাদশাহ্-বেগম জাহানারার সম্মুখে এসেছি?

—না। তিনি এখনি আসবেন।

—ও।

—আপনি দয়া করে বসুন।

মহম্মদ আসন গ্রহণ করে। আমাকে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ছট্‌ফট্ করে। ভাবে হয়তো, অনর্থক কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মহিলাটি।

—শাহ্‌জাদা।

চমকে উঠে সে আমার ওড়না ঢাকা মুখের দিকে চায়।

—একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

মহম্মদের স্থির চোখে কৌতূহল প্রকাশ পায়। সে আমার অনাবৃত হাত দুখানার দিকে ক্ষণিকের তরে চায়। তারপর বলে—কি প্রশ্ন?

—আপনি এখনো জাহানারা বেগমকে বাদশাহ্-বেগমের সম্মান দিচ্ছেন কেন?

—তিনি বাদশাহ্-বেগম, তাই।

কিন্তু আপনার পিতার এই জয় লাভের পর তাঁর এই উপাধি কি হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় নি।

কি যেন ভাবে মহম্মদ। তারপর বলে,—হয়তো তাই। কিন্তু আমি তাঁকে চিরকাল বাদশাহ্-বেগমের সম্মান দেব।

—তাঁকে আপনি শ্রদ্ধা করেন দেখছি।

—মানুষ হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে না পারাটা দুর্ভাগ্যের।

—তক্ত-তাউস আর সাম্রাজ্যের কাছে মনুষ্যত্বের মূল্য কতটুকু?

মহম্মদ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে দুপা এগিয়ে এসে বলে,—কে তুমি?

—সামান্য এক নাজীর।

—কিন্তু তোমার কথাবার্তা তো ঠিক নাজীরের মতো নয়। তোমার পোষাক তেমন নয়।

মনে মনে ভাবি, আমি না হয় জাহানারাই হলাম মহম্মদ, কিন্তু পাশেই ওই থামের আড়ালে কোয়েল দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তো সত্যিই নাজীর। তার কথাবার্তা শুনলে এই কথাই বলতে।

—কথা বলছ না? মহম্মদের স্বরে অধৈর্য। নবীন যুবক। ধৈর্য একটু কম হবেই।

—আমি জাহানারা বেগমের নাজীর। তাই হয়তো আমার কথাবার্তায় তাঁর কথার ছাপ রয়েছে। আমার পোষাকও তাঁরই রুচি অনুযায়ী।

—তোমার মুখের ওড়না একটু তুলবে?

বুক কেঁপে ওঠে,—কেন শাহ্‌জাদা ?

—মুখ দেখব।

সেই একই গলার স্বর, যা শুনেছিলাম ছত্রশালের মুখে। ছি ছি। কেন যে মিথ্যে পরিচয় দিতে গেলাম।

—না শাহ্‌জাদা, আমি যাই। ডেকে দিই বাদশাহ্‌-বেগমকে।

মহম্মদ সহসা আমার হাত চেপে ধরে বলে,—কিন্তু তারপরে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তুমি সুন্দরী, তুমি বুদ্ধিমতী—নাজীর কি চিরকালই থাকতে হবে ?

কী করব ভেবে পাই না। সেই সময়ে কোয়েল সামনে এসে আমাকে ধমক দিলেও চলে যাবার পথ পেতাম। ছি ছি। কেন যে মরতে পরিচয় গোপন করতে গিয়েছিলাম। পরিচয়ই যখন গোপন করলাম, তখন কেন যে বড় বড় কথা বলতে গেলাম। ছি ছি।

—ছেড়ে দিন শাহ্‌জাদা। পরে দেখা করব।

—ঠিক ?

—ঠিক।

—ভুল করো না লক্ষীটি। মুঘল-হারেমে প্রাণ বলে কোন পদার্থ নেই। তাই যেখানে প্রাণের সন্ধান পাই, সেখানে আমি চাতক পাখির মতে ছট্‌ফট্‌ করি। ভুলো না।

মহম্মদ আমাকে ছেড়ে দিতেই ছুটে পালিয়ে যাই। বেচারা, আমার বয়সটাও অনুমান করতে পারল না। করবেই বা কি করে। হাত দুটো যেন সেই আগের মতোই রয়েছে। মুখে চিন্তার ছাপ পড়লেও হাত নিটোল। বেচারা। আওরঙজেবের পুত্র হয়ে প্রাণের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। জীবনে শান্তি পাবে না। তক্ত-তাউসও পাবে না। মানুষের সূক্ষ্মগুণে ভরপুর হৃদয় নিয়ে বাদশাহ্‌ হবার দিন চলে গিয়েছে মুঘলবংশ থেকে।

পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে নিই তাড়াতাড়ি। মুখে নিয়ে আসি কৃত্রিম গাম্ভীর্য। তারপর ধীর গতিতে এগিয়ে যাই সেই একই ঘরে। এবারে ওড়নার কোন বালাই নেই। কিন্তু হাত দুখানা ভালভাবে ঢাকা।

আমাকে দেখেই মহম্মদ উঠে দাঁড়ায়।

—তুমি মহম্মদ ? গলার স্বর যতটা পারি ভারী করি।

—হ্যাঁ। হেসে এগিয়ে এসে সে আমাকে অভিবাদন করে।

—বস। বহুদিন পরে তোমাকে দেখলাম।

—আপনাকে আমি দেখলেও, আমার মনে নেই। অথচ আজ মনে হচ্ছে আপনি আমার কত পরিচিত বাদশাহ্‌-বেগম।

এ-নামে ডাকতে কে বললে ?

এ-নামে আমি চিরকাল ডাকব।

তোমার বাবা সন্তুষ্ট হবেন না নিশ্চয়।

তা হবেন না বটে।

তবে ? তোমার নিজের ভবিষ্যৎ নেই ?

নিজের সততা আর বিবেককে বিসর্জন দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমার কাম্য নয়।

ভুল করছ মহম্মদ। আফসোস হবে।

আমাকে চিনতে আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন বাদশাহ্-বেগম।

সে বলি,—না। শুধু একটু পরীক্ষা করছিলাম মহম্মদ। বাদশাহ্ শাহজাহান খন আওরঙজেবের শত্রু। সে হিসাবে আমিও তার শত্রু। কারণ আমি পিতার াছে রয়েছি। তবু তোমাকে আমি পুত্রের মতোই দেখি। তোমার মনের পরিচয় ায়ে বড় আনন্দ হল।

হম্মদ আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে আমার হাত দুটি তার দুহাতে তুলে ায়ে কপালে ঠেকায়। আমি তার পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বলি,—উঠে বস হম্মদ।

হম্মদ আসন গ্রহণ করে। একটু পরেই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে,—কিন্তু আমার তা অপেক্ষা করা চলে না। তাড়াতাড়ি না ফিরলে আপনাদের পানীয় জলের ীমাংসা হবে না। দেরী করলে হয়তো পিতা সন্দেহ করবেন।

—সে কি প্রথম থেকেই সন্দেহ করছে না ?

—নিশ্চয়ই করছেন। কিন্তু সে সন্দেহ আরও গাঢ় হয়ে দেখা দেবে। এর পরিণাম অশুভ হতে পারে। আমি যাই।

—বাদশাহের সঙ্গে দেখা করবে না ?

—আবার আসব।

স উঠে দাঁড়ায়। একটু ইতস্তত করে। চারদিকে চায়। গোপনে হাসি আমি। এ চাহনির অর্থ জানি।

—কিছু বলবে মহম্মদ ?

—না। আপনার একজন নাজীর দেখলাম। সে কোথায় ?

—কেন ? তাকে কি প্রয়োজন ?

মহম্মদ রক্তিম হয়ে ওঠে। কোনরকমে বলে,—সুন্দর কথা বলে সে।

—হ্যাঁ। কোয়েল বুদ্ধিমতী।

—কোয়েল ? নামটিও সুন্দর তো।

—ডাকব তাকে ?

—ডাকুন।

ডাকতেই কোয়েল সামনে এসে হাজির হয়। মুখে তার ওড়না ছিল না। বয়
প্রৌঢ়ত্বের সীমা স্পর্শ করেছে।

মহম্মদ সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে,—না, না। এ নয়। অন্য কেউ।

আর তো কোন নাজীর নেই মহম্মদ। অন্যদের নাজীর এদিকে একজনও আসে না।

বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে মহম্মদ বলে,—কিন্তু আমি যে দেখলাম। আর কেউ আছে
নাজীর ছাড়া ?

—কেউ নেই।

—সেকি ? সে কিন্তু বললে, সে আপনারই নাজীর।

কোয়েল ধীরে ধীরে বলে,—আমি জানি।

আমরা দুজনা একসঙ্গে ঘুরে কোয়েলের দিকে চাই। সে আমার কথা বলে দে
নাকি ?

মহম্মদ প্রশ্ন করে,—কে ?

গম্ভীর হয়ে কোয়েল উত্তর দেয়,—নূরজাহান বেগম।

চমকে ওঠে মহম্মদ। আমি কিছু বলার আগেই কোয়েল বলে ওঠে,—আমি হিন্দু
আমি বিশ্বাস করি। আমি দেখেছি তাঁকে। জেসমিন প্রাসাদের আশেপাশে।

মহম্মদের মুখে ভাষা নেই। স্থির হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে
শেষে বলে, কিন্তু আমি যে তাকে স্পর্শ করেছি।

—স্পর্শ ? তাকে তুমি স্পর্শ করতে যাবে কেন মহম্মদ ?

—ছোঁয়া লেগেছে তার দেহের সঙ্গে।

কোয়েল বলে,—অমন হয়। মনের ভুল। আপনি তখন সচেতন ছিলেন ন
শাহ্জাদা।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে মহম্মদ ধীরে ধীরে চলে যায়।

সে চলে যেতেই কোয়েলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলি,—ব্যাপার কি কোয়েল ? সত্যি
দেখেছ ?

হেসে ফেলে কোয়েল। বলে,—না। আপনার আর শাহ্জাদার লজ্জা ঢে
দেবার জন্যেই মিথ্যেটুকু বলতে হল। হারেমের সব নাজীরদের জড়ো করলে
আপনার মতো অমন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে কি ? রোশনারা বেগমে
হাতও কি এত সুন্দর ? তাই সুন্দরী নূরজাহানকে চোখে দেখতে হল।

—তোমার অতিবুদ্ধির জন্যে আমি একদিন বিষ দিয়ে হত্যা করব।

—সেদিনের জন্যেই অপেক্ষা করছি শাহ্‌জাদী।

কায়েলের হাসির মধ্যে দুঃখ ঝরে পড়ে।

হম্মদ চলে যাওয়ার পর প্রচুর পানীয় জল আসে। তবু আওরংজেব নিজে আসে নি। সে তেমনিভাবে কিছুদিন শিবিরে অপেক্ষা করে রইল।

তারপরই ঘটে গেল সেই ভয়াবহ ঘটনা যা বাদশাহ্‌কে স্তব্ধ করে দিল। শোক প্রকাশের শক্তিটুকুও আর তাঁর রইল না। আমিও যেন পাথর হয়ে গিয়েছি। ইলে দারার ছিন্নশির দেখে ভেঙে তো পড়লাম না। একটু চমকে উঠেছিলাম মাত্র। ই জাতীয় একটা কিছুর জন্যে আমার মন যেন প্রস্তুত ছিল—কদিন আগে মার পরে।

আওরংজেব জানত, বাদশাহের কাছে এই ছিন্নশির ভেট পাঠাবার একান্ত প্রয়োজন হল। কারণ দারার মৃত্যুর পর ময়ূরাসনের ওপর যে-কেউ দাবি করুক তিনি আপত্তি রবেন না। সে জানত, দারাকে হত্যা করা যেতে পারে, কিন্তু বাদশাহ্‌কে হত্যা রলে সারা ভারতে দাবানল জ্বলে উঠবে। পরিণামে তক্ত-তাউসে বসার কল্পনা ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাবে।

দ্ধির খেলায় আওরংজেবই জয়ী হল। দুর্বুদ্ধির কাছে শুভবুদ্ধি অনেক সময়ই ইভাবে পরাজয় বরণ করে। পরমাত্মীয়ের রক্ত নিয়ে হোলি খেলতে শুরু করেছে ার সঙ্গে কে পেরে উঠবে?

নে পড়ে যায় নাদিরার কথা, সুলেমান, সিপার আর তাদের বোন জানির কথা। ড় দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল তারা। মনে পড়ে রানাদিল্‌ আর উদীপুরী বেগমের কথা। কোথায় তারা কে জানে। হয়তো সব সংবাদই পাব—যখন শেষ হয়ে যাবে সব। কারণ একথা আমি জানি, আত্মীয়ের রক্ত নিয়ে যারা মারাত্মক খেলায় মত্ত হয়, তারা জানে না কোথায় থামতে হবে। শুনলাম ধান্দরের অধিপতি মালিক জিওয়ান দারাশুকোকে ধরিয়ে দিয়েছে। এককালে দারা ওকে মস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। কৃতজ্ঞতা জানাবার এর চাইতে ভাল পথ আর ছিল না জিওয়ানের। আওরংজেব ঘোষণা করল দারা 'রাফিজী'—তাই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। প্রজারা তাই মানল। দারার মৃত্যুর চাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে যেতে দুদিনও লাগল না।

তারপর খাজুয়ার প্রান্তর। বীর সুজা সদলবলে সেখানে আওরংজেবকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করল। যুদ্ধের গতি দেখে আওরংজেবের মুখের রঙ বিবর্ণ হল। সুজার অসির প্রতিটি আঘাতে ময়ূরাসনের স্বপ্ন ভাঙতে শুরু করল। অস্থির হয়ে উঠল

আওরঙজেব। শেষে সেখানেও মিলল খলিলুল্লা, শায়েস্তা আর নাজির খাঁয়ের দলের লোক। আলীবর্দী খাঁ। সুজার একান্ত বিশ্বাসী সে। অথচ অর্থ আর প্রতিপত্তির মোহে আওরঙজেবের দলে ভিড়ল। জয় যখন সুজার করায়ত্ত তখন আলীবর্দীর সর্বনাশা পরামর্শের জন্যে পরাজয় বরণ করতে হল তাকে। ভাঙা দলবলের কয়েকজনকে নিয়ে ভাঙা মনে সুজা পালিয়ে গেল। জয়ী হতে হতেও পরাজয়ের কালিমায় তার মুখ কলঙ্কিত হল। ইতিহাসের পাতায় এ সব কথা নিশ্চয়ই লেখা থাকবে।

আর লেখা থাকবে সরল মুরাদকে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে নিক্ষেপ করার জঘন্যতম কৌশল। নিদ্রিত ছিল নিজের শিবিরে মুরাদ। সব যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তাই সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল সে। তবু কোমরের অসি কোমরেই ছিল তার। চিরকালের অভ্যাস। নিদ্রিত মুরাদের সামনেও নিজে এগিয়ে যেতে সাহস পায় নি বিজয়ী আওরঙজেব। নিজের চার বছরের শিশুপুত্র আজীমকে মোহরের লোভ দেখিয়ে পাঠিয়ে দিল মুরাদের কোমর থেকে তলোয়ারখানা চুরি করতে আনতে। হঠাৎ জেগে উঠলেও শিশুকে দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগবে না মুরাদের মনে।

শিশু কৃতকার্য হল। ঘুম ভাঙল না মুরাদের। সেই অবসরে তার হাত-পা শৃঙ্খলিত হল। সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল তার। চোখ মেলে সব কিছু দেখে শুধু একটা তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আওরঙজেবের দিকে। কোন কথা বলে নি সে।

গোয়ালিয়র দুর্গে বেশীদিন জীবিত থাকতে পারে নি মুরাদ। ভালই হয়েছে। প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে অন্যান্য আত্মীয়দের মতো তিলে তিলে মারে নি তাকে। সঙ্গে ছিল তার পরমাসুন্দরী যুবতী সরসুন বাঈ। সেই সরসুন বাঈ তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করল। দুর্গ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে চিৎকার করে ওঠে। প্রহরীরা জেগে ওঠে। ফলে ধরা পড়ে যায় মুরাদ। এর পরই এক বিচারের প্রহসন বসে। কবে কোন্ যুগে গুজরাটে এক রাজপুরুষকে সে হত্যা করেছিল। তারই ফলে শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড। চমৎকার বিচার।

সুজাও শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে পারে নি। সুদূর আরাকানে তার জীবন শেষ হল। আওরঙজেব নিষ্কণ্টক।

এবার আসবে সে বৃদ্ধ শাহজাহানের কাছে। শুধু বৃদ্ধই বললাম। কারণ বাদশাহ শাহজাহান আর কি করে বলি? তবু আওরঙজেব চতুর। পিতাকে অসহায় জেনেও তাঁর কাছ থেকে ময়ূর-তাউসে বসার অনুমতি চাইবে।

আগ্রার দুর্গের দ্বারে দ্বারে নতুন প্রহরী। পরীক্ষার জন্যে কোয়েলকে বাইরে পাঠাই। সে ফিরে এল। বাইরে যাবার হুকুম নেই। বুঝলাম শাহজাহান বন্দী। সেই সঙ্গে আমিও। এখানে এসে উপস্থিত হবার আগেই আমাদের স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিয়েছে আওরঙজেব।

কোয়েল কাঁদে। কেঁদে কি হবে? চলে যেতে বলি তাকে। যেতে চায় না সে। শেষ পর্যন্ত আমাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে বেঁধে রাখতে চায়। অদ্ভুত নারী।

ধূসর আকাশ। তাজমহলের শুভ্রতা মলিন বলে প্রতিভাত হয়। বাতায়নে সর্বনাশা-সংবাদ-বহনকারী কপোতটি দূরের এক বুনো পায়রাকে দেখে একমনে ঘুরে ঘুরে ডাকতে শুরু করেছে। সে নিশ্চিত জানে, তার এই নাচ আর ডাক বুনো পায়রাটিকে মুগ্ধ করে কাছে ডেকে আনবে। সুন্দর এদের মন। কোন ঘটনাই দাগ কেটে যায় না সেখানে। স্মৃতি বলে কোন কিছুর বালাই নেই এদের। শুধু বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত।

বর্তমান নিয়ে আমি বাঁচতে পারতাম না। পাগল হয়ে যেতাম। অতীতের দুঃখ স্মৃতিগুলো ছিল বলেই সেগুলোকে রোমন্থন করে সময় কাটিয়ে দিই। ভুলে যাই আমি বন্দী। ভুলে যাই এক বৃদ্ধ ঠিক পাশেরই কক্ষে তার জীবনের সব গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় সময় গুণছে। তার হাতে আপেলের সুঘ্রাণ-আজও আছে কিনা জানি না। না থাকাই ভাল। তবু সাহস করে সেই শীর্ণ হাতখানা তুলে নিয়ে ঘ্রাণ নিতে পারি না। বৃদ্ধ আছে বলেই এখনো আমার নিজের বেঁচে থাকার একটা ক্ষীণ অর্থ খুঁজে পাই। কিন্তু যে মুহূর্তে ওই বুকের ওঠা-নামা বন্ধ হয়ে যাবে—যে মুহূর্তে ওই দুর্বলতম দেহের স্পন্দন স্তব্ধ হবে, সেই মুহূর্তে আমার বেঁচে থাকারও যেন কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই নিশ্ছিদ্র অবসরের অপরিসীম ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে দিনে রাত্রে বার বার পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই। সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ জীবিত না মৃত। কখনো নিমীলিত চক্ষু দেখে কেঁপে উঠি। একটু কেশে উঠি তখন। চোখের পাতা খুলে যায় বৃদ্ধের। একটা নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকান ক্ষণিকের তরে। তারপরই আবার চোখ বন্ধ করেন। আমার উপস্থিতি তাঁর মনে এখন কোন আশা কোন আনন্দই আর জাগাতে পারে না।

এমনি একদিনে আওরঙজেব এল। বিজয়ী সে। দুর্লভ ময়ূরাসনের অধিকারী। কিন্তু বিজয়ীর মতো বুক ফুলিয়ে সে প্রবেশ করতে পারল না প্রাসাদে। দূর থেকে দেখলাম, কেন যেন তার মাথা নত হয়ে এল। পদক্ষেপেও একটা ইতস্তত ভাব। নিজেকে অপরাধী বলে ভাবছে কি? কৃতকর্মের জন্যে কি সে অনুতপ্ত? না, না।

আর ভুল করব না। অভিনয়ে দক্ষ আওরঙজেবের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

পিতার কক্ষে প্রবেশের পূর্বে সে আমার দর্শনপ্রার্থী হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে যাই। সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

—জাহানারা। আওরঙজেবের চোখ দুটো কি সত্যি চিক্ চিক্ করে উঠল?

চুপ করে অপেক্ষা করি।

—জাহানারা, আমি ঘোরতম পাপী।

মনে মনে হাসি। সে ভেবেছে, তাকে আমি অভিশাপ দেব, তিরস্কার করব। সেই তিরস্কারে তার ভারাক্রান্ত মন হাল্কা হয়ে উঠবে। সে সহজ হবে। অতটা নির্বোধ আমি নই। যে দুর্দমনীয় চাপে তার মনে ধীরে ধীরে অশান্তি দানা বেঁধে উঠছে সে চাপ ভেতরে ভেতরে চিরকাল তাকে অস্থির করে রাখুক। অন্যায় থেকে সে জীবনে কখনো সরে আসতে পারবে না জানি। সজ্ঞানে একটার পর একটা অন্যায় সে করে যাবে। তার ওই রক্তাক্ত হাত আরও লাল হয়ে উঠবে—যার পরিণামে অশান্তি তাকে রাহুর মতো গ্রাস করবে।

—জাহানারা আমি অপরাধী।

—তুমি বৃদ্ধ শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করতে চাও?

—হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে—

—আদেশ কর। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—একি জাহানারা, তুমি এভাবে কথা বলছ?

—শাহজাহান যে সময়ে বাদশাহ্ ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এভাবেই কথা বলতাম বাদশাহ্। আজকাল আদব-কায়দার পরিবর্তন হলেও আমি তা জানতে পারি নি। কারণ আমি বন্দী।

—কে বলে তুমি বন্দী।

কোন সুযোগ দিই না কথার ওপর কথা বলতে। তাই নিজের বন্দীত্ব প্রমাণ করতে তর্ক জুড়লাম না।

সে আবার বলে ওঠে—কে বলে তুমি বন্দী?

—বৃদ্ধ ওই ঘরে শুয়ে রয়েছেন। এসো।

স্তব্ধ আওরঙজেব আমাকে অনুসরণ করে।

আনুষ্ঠানিকভাবে যে 'শাহানশাহ্' উপাধি অনেক আশা নিয়ে বহুদিন পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন শাহজাহান, আজই তার শেষ দিন। আজ আওরঙজেব তার অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাবে এক [illegible]দয়ের মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সম্মুখে। কৌতূহল যে আমার হয় না একেবারে, একথা বলতে পারি না।

নতজানু হয়ে আওরঙজেব বৃদ্ধের শয্যার পাশে বসে পড়ে। চোখে তার অশ্রু। সে শাহজাহানের ডানহাতখানা উঠিয়ে চুম্বন করে। বৃদ্ধের চোখ তবু খোলে না। আজকাল আর ঘাড় ফিরিয়ে যখন তখন তাজমহলের দিকে চেয়ে থাকে না। হয়তো দৃষ্টিশক্তি দ্রুত ক্ষীণ হয়ে এসেছে। চোখে পড়ে না তাজমহল।

—আপেলের গন্ধ যদি পাস জাহানারা, বলিস না। খবর্দার বলিস না।

কান্না পায় আমার। আওরঙজেবকে আমি বলে ভুল করেছেন পিতা। চেয়ে দেখে শিউরে উঠল আওরঙজেব। রোশনারার মুখে নিশ্চয়ই সে শুনেছে আপেলের বৃত্তান্ত। চোখ বন্ধ করেই তিনি বলে চলেন,—জাহানারা। এপারে শ্বেতশুভ্র তাজমহল, ওপারে রক্তবর্ণ সমাধি। কৃষ্ণবর্ণ সেতু মৃত্যুর মতো দুই সমাধিকে যোগ করে দিয়েছে। আওরঙজেবের মুখ বন্ধ। সে একবার অসহায়ভাবে আমার দিকে চায়। সে অধৈর্য হয়ে ওঠে। বাইরে তার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে ডাকি,—বাবা।

—রাগ করিস না জাহানারা। যেকথা বলেছিলাম, স্বপ্নের ঘোরে বলেছিলাম। আমি আর কল্পনা করি না। পৃথিবীকে আওরঙজেবের মতোই দেখতে চেষ্টা করি। রঙচঙে দেখি না আর। দেখছিস না, তাজমহল চোখে পড়বে বলে ভয়ে চোখ বন্ধ করে থাকি?

—বাবা, আওরঙজেব এসেছে।

—কে?

—আওরঙজেব।

চোখ খুলেই নিজ পুত্রকে দেখতে পান তিনি। একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। যেন কত অচেনা। ধীরে ধীরে অদ্ভুত হাসিতে ভরে উঠে মুখ। শীর্ণ হাতখানা তাড়াতাড়ি বুকের ওপর নিয়ে গিয়ে বুকখানা খুলে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলেন,—শত হলেও এককালে বাদশাহ্ ছিলাম আওরঙজেব। দারার মতো মাথা কেটে ফেল না; এইখানে, এই বুকের ওপর বসিয়ে দাও।

অধীর আগ্রহে তিনি চেয়ে থাকেন—অপেক্ষা করেন।

আওরঙজেব আরও নত হয়। শেষে সে শয্যার ওপর মাথা রেখে কাঁদতে থাকে।

—না, না। আর ওসব অভিনয়ের প্রয়োজন কি? শেষ করে দাও। জাহানারার কথা ভাবছ বুঝি? সে সব দেখবে? ওকেও শেষ করে দাও। মিটে যাক। ওর জীবনও বড় বেশী টেনে-হেঁচড়ে চলছে। কিছুই মনে করবে না। মনে করবি জাহানারা?

—না, বাবা।

—আমরা প্রস্তুত আওরঙজেব।

—হত্যার জন্যে আমি আসি নি পিতা। ক্ষমা চাইতে এসেছি। যদিও জানি, এ-কথা আজ আমার মুখে বিদ্রূপের মতো শোনাচ্ছে। কারণ আমি অপরাধী। মুঘল-বংশের ওপর যে অভিশাপ রয়েছে, আপনার মতো আমিও তা কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

আওরঙজেব থামে।

শাহজাহান বলেন,—তারপর ?

তাঁর কথার ধরনে আমি চমকে উঠি। যেন কোন রূপকথার গল্প শুনে যাচ্ছেন তিনি আওরঙজেব থেমে গেল বলে আরও শোনার জন্যে বায়না ধরেছেন। কৌশলে আওরঙজেব উল্লেখ করেছে যে সিংহাসন লাভের পথে তাঁরও অসি আত্মীয়ের রক্তে সিক্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি তিনি। তিনি বরাবর জানতেন সিংহাসন লাভ করতে না পারলে তাঁর নিজের জীবন অনিবার্যভাবে বিপন্ন হত। কারণ নূরজাহান তখন ছিলেন ক্ষমতার অধিকারিণী। অসীম প্রতিপত্তি ছিল তাঁর। যেটুকু রক্তপাত ঘটেছে তখন, তা রোধ করা যেত না। তাই বা আত্মীয়তার সূত্র ধরে আওরঙজেবের মতো একের পর একজনকে গোয়ালিয়র দুর্গে নিক্ষেপ করে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেন নি। নিজের পুত্র ছাড়া বাকী সবাইকে হত্যা করেন নি। শিশু কিংবা রমণীর কোন ক্ষতিই তিনি করেন নি। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে, নীচতা আর হীনতা তাঁর মনে স্থান পায় নি।

আওরঙজেব বুঝতে পারে তার কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তাই আবার ঢোক গি বলে,—ছেলেবেলা থেকে আমি অবহেলিত। যার হাতে আমি গড়ে উঠেছি শিক্ষ নামে এক উদারতাহীন অশিক্ষা সে আমার মনে গেঁথে দিয়েছে। এর ফলে আপসহীন মুসলমান আমার ভেতরে অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। সে অন্য কে ধর্মকে সহ্য করতে পারে না। সে মুসলমান ধর্মেও কোন শিথিলতা সহ্য করতে পা না। তাই দারাশুকোকে আমি বেঁচে থাকতে দিতে পারি নি।

—তুমি মহানুভব, আওরঙজেব। মুসলমানরা যুগে যুগে তোমার কীর্তিগাথা গাই

—বাদশাহ্, জানি আজ আমি আপনার বিদ্রূপের পাত্র। তবু ক্ষমা চাইতে এসে তবু অনুমতি নিতে এসেছি ভারতের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে। শত অপরাধ কর আপনি চাইবেন না—মুঘল ছাড়া অন্য কেউ দিল্লীর তক্ত-তাউসে বসুক।

—ও! ক্ষমা চাইতে এসেছো ? জাহানারা, আওরঙজেব ক্ষমা চাইতে এসে ক্ষমা করি, কি বলিস ? ক্ষমা করলাম আওরঙজেব।

শাহজাহানের মুখের ধরনে আওরঙজেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে আমার দি

চায়। আমার মুখে কোন সমর্থন সে খুঁজে পায় না। তাই আবার বাদশাহের দিকে মুখ নিয়ে কিছু বলতে যেতেই বাদশাহ্ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন,—হাঁ হাঁ, আমি জানি। শাসনভারের অনুমতি তো? জাহানারা, আমি অনুমতি না দিলে বেচারা তক্ত-তাউসে বসতে পারছে না। অনুমতি দিই, কি বলিস? অনুমতি দিলাম আওরঙ্গজেব।

কিছুক্ষণের জন্যে আওরঙজেব স্থাণুর মতো বসে থাকে। বুঝতে পারি চেষ্টা করেও সে নড়তে পারছে না। দরজার বাইরে তার দেহরক্ষীরা সম্ভবত অপেক্ষা করছে। ভেতরে শুধু সে একা— আর তার কোষবদ্ধ অসি। কিন্তু সে অসি দিয়ে আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার নেই।

আমার বুকের ভেতরে লুকোনা রয়েছে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। আওরঙজেবের আগমন সংবাদ পেয়েই আমি লুকিয়ে রেখেছি। এতক্ষণেও তার শীতলতা দেহের উত্তাপে নষ্ট হয় নি। গোয়ালিয়র দুর্গে এখনো আমার হতভাগ্য ভাইদের কোন পুত্র হয়তো জীবিত আছে। সেখান থেকে নিয়ে এসে এখনো ময়ূরাসনে বসিয়ে দেওয়া যায়। যদি সবাই জানতে পারে, শাহজাহানের তাই অভিলাষ—কেউ আপত্তি করবে না। শাহজাহানকে দর্শনের জন্যে আগ্রার দুর্গদ্বার সবার কাছে খুলে দেব। তারা নিজের চোখে দেখে যাবে তাঁকে। শুনে যাবে আওরঙজেবের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। নজরৎ, খলিলুল্লা, শায়েস্তা খাঁ, আলীবর্দীর সব চক্রান্ত একমুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আমার বুক কাঁপতে থাকে। অস্ত্রের শীতলতা শরীরে কাঁপুনি ধরায়। সামনে আওরঙজেব বসে—নিশ্চেষ্ট। আমার ভাই আওরঙজেব। প্রাণের টানে এই ভাই একদিন দক্ষিণভারত থেকে ছুটে এসেছিল আমাকে দেখতে। আজ তার কি পরিণতি!

তড়িৎগতিতে ছুরিকা বার করে আওরঙজেবের সামনে ধরি। সে বিহ্বল। কোষের অসি টেনে বার করার অবসর পায় না। চিৎকার করতে পারে না। সে জানে, চিৎকারের চেষ্টা করলে এই তীক্ষ্ণ অস্ত্র তার বক্ষ ভেদ করবে। অস্ত্রবিদ্যায় আমার পারদর্শিতার কথা তার অজানা নয়।

—আওরঙজেব, দিল্লীর তক্ত-তাউসে কোন রমণী বসলে বেশ হয়। তাই না?

শাহজাহান নির্বাক্। আওরঙজেব কাঁপতে থাকে। আমার কব্জির জোরের পরিচয় সে আগে অনেক পেয়েছে। আমি যদি রোশনারা হতাম, এক ঝট্‌কায় এতক্ষণে সে সরিয়ে দিত। কিন্তু আমার দাঁড়াবার ভঙ্গি ছিল নিখুঁত।

—জাহানারা! আওরঙজেবের কণ্ঠস্বর ভগ্ন। তার সব আশা সব আকাঙ্ক্ষার সমাধি। মনে মনে আফসোস করছে সে। এমন আফসোস জীবনে আর সে করে নি।

—একটুও নড়বার চেষ্টা করো না আওরঙজেব। হাত দুটো ওইভাবেই যেন শয্যার ওপর থাকে।

—তুই ওকে মেরে ফেলবি জাহানারা? মেরে কি হবে? ছেড়ে দে চলে যাক।

ছত্রশালের মুখ মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এই অবস্থায় পড়লে আওরঙজেবের মতো সে কখনো সঙ্কুচিত হয়ে থাকত না। হেসে উঠত সশব্দে। নারীকে সে কখনো আক্রমণ করে নি। কিন্তু আঘাত না করেও নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা সে রাখত। আওরঙজেবও কম শক্তিমান নয়। কিন্তু তার অপরাধ-বোধ তাকে দুর্বল করে তুলেছে।

—ভেবে দেখ বাবা, তোমার সব পুত্রের হত্যাকারী এই আওরঙজেব। তোমার বংশের সবার মৃত্যুর কারণ।

—জানিরে জানি। তবু ছেড়ে দে। আমি তো জানি তক্ত-তাউসের ওপর তোর কোন লোভই নেই। জীবনে তোর একটি আশাই ছিল। সে আশার প্রদীপ নির্বাপিত।

আওরঙজেব সকৃতজ্ঞ নয়নে পিতার দিকে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টিতে অনুনয় ঝড়ে পড়ে।

—আওরঙজেব, কৌশলে আর হীনতার দ্বারা অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু সব মানুষ সে পথে চলতে পারে না। চললে, এই পৃথিবী হয়ে উঠত শয়তানের রাজত্ব। মসজিদে আজান-ধ্বনি শুনতে পেতে না তাহলে। ফকির সাহেবরা সংসার ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন না। তাজমহলেরও সৃষ্টি হত না। বেহেস্ত-এর ছোঁয়া পায় বলেই পৃথিবীতে আজও মানুষ আশায় বুক বেঁধে বেঁচে আছে—আজও শিল্পী বেঁচে আছে, সাহিত্য বেঁচে আছে। শুনলাম, একদল গায়ক তাদের বাদ্য-যন্ত্রগুলো কবরস্থ করেছে। তুমি খুব আনন্দ পেয়েছ তাতে। বলেছ, কবর থেকে যেন না তোলা হয়। ভালই বলেছ। তোমার মতো মানুষেরও বোধহয় প্রয়োজন আছে। তোমাদের কার্যকলাপের ফলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে সততা কী, মনুষ্যত্ব কী, শিল্প কী।

—আমায় ক্ষমা কর জাহানারা।

—ক্ষমার প্রশ্ন এখানে উঠছে না। কেন উঠছে না সেকথা তুমিও জান। তবু একটি খবর জেনে নিতে চাই। নাদিরা কোথায়?

—মারা গিয়েছে। আমার হারেমে আসতে চায় নি। নিজে জোর করে মরেছে।

—জানতাম। রানাদিল্?

—সে-ও। রূপ ছিল তার অফুরন্ত। সেই রূপের কথা আমি উল্লেখ করায় নিজের

ওপর নিজে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ছোরা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করল নিজের মুখ, নিজের বুক।

—শুনছ বাবা? রানাদিল্।

—হ্যাঁ। তাই তো পথ থেকে তুলে আনতে বাধা দিই নি।

—উদীপুরী বেগম?

—আমার হারেমে। সুখে আছে সে।

—সুখে থাক্।

ছুরিকা নিক্ষেপ করি কক্ষের এক প্রান্তে। ঝনঝন করে শব্দ হয়। সমস্ত প্রাসাদ যেন কেঁপে ওঠে—কেঁপে ওঠে সারা ভারতবর্ষ। এতক্ষণ যেন কোটি কোটি হৃদয় অপেক্ষা করছিল চরম একটা কিছু দেখবার জন্যে। কিন্তু তাদের আশায় ছাই ঢেলে দিয়ে আমি ছুরিকা নিক্ষেপ করলাম। আওরঙজেব ছুটে গিয়ে সেটি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে। তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে নিশ্চিন্ততা।

শয্যার সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে,—আমি চলি বাবা।

—হ্যাঁ। এসো। তবে পাহারার ব্যবস্থাটা একটু শক্ত করবে। কারণ জাহানারাকে ঠিক বিশ্বাস নেই। অনেক কিছুই করতে পারে। এই মাত্র যা দেখাল, আমি চমকে গিয়েছিলাম। তোমার এত সাধের তক্ত-তাউস—। এসো।

মাথা নীচু করে আওরঙজেব।

আমি প্রশ্ন করি,—আবার আসবে নাকি আওরঙজেব?

—আসব। ইতিমধ্যে বাবার সময় কাটাবার জন্যে কিছু পশু পাঠিয়ে দেব। তাদের লড়াই দেখবেন।

—দেখতে পারবেন কি?

—নিশ্চয়ই পারবেন। ওঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাইরে বসালে দেখতে পারবেন। সব রকম পশুই পাঠাব। বাঙলার বাঘও থাকবে।

মনে মনে জানি, ওভাবে পিতাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া কতখানি অসম্ভব। তবু মুখে বলি,—ধন্যবাদ।

আওরঙজেব বাইরে যাবার সময় ইশারায় আমাকে ডাকে। বিস্মিত হই। এত কিছুর পরেও সে স্থির। শুধু একটু কুণ্ঠার আভাস ছাড়া আর কিছু নেই তার মুখে। কাছে গেলে সে বলে,—জাহানারা, তোমার ওপর আমার বিন্দুমাত্রও রাগ হচ্ছে না। রোশনারা আমার জন্যে অনেক করেছে। কিন্তু তুমি আমার শ্রদ্ধেয়। তুমি আমার বন্দী নও। তুমি স্বাধীন। কিন্তু পিতার সঙ্গে যতদিন আছো, ততদিন—

—আমি বুঝেছি আওরঙজেব।

—আমাকে ভুল বুঝো না বোন।

চুপ করে থাকি। সে চলে যায়।

সে যাবার অনেক পরে কোয়েলকে একবার দুর্গদ্বারে পাঠাই। ফিরে এসে খবর দেয় প্রহরীর সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আওরঙজেবকে চিনতে এখন আর একটুও ভুল হয় না।

ভেবেছিলাম আর লিখব না। একঘেয়ে দিন যাপনের গ্লানি মনের সব সজীবতা যেন নষ্ট করে দিয়েছে। আওরঙজেব বিদায় নেবার পর থেকেই মনে হতে লাগল, আর কেন? সব তো শেষ হয়ে গেল। এবারে পিতাপুত্রীর জীবন শেষ হলেই আওরঙজেব নিশ্চিন্ত হতে পারে। আমাদের জন্যে তক্ত-তাউসে বসেও তার সুখ নেই। আমাদের অজ্ঞাতে গোয়ালিয়র দুর্গের মতো যদি এখানেও খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিত, বেশ হত।

বিষ সে দেয় নি বটে, কিন্তু বিষ ছাড়াই দিনে দিনে মন আমার বিষিয়ে উঠছিল। জীবনের সব কিছুর মূল্য হারিয়ে ফেলায় এক হাঁ-করা শূন্যতা আমাকে গ্রাস করছিল। এতদিন ধরে নিজের খেয়ালে যা লিখেছি সব ভুয়ো—সব মিথ্যে বলে প্রতীয়মান হল। তাই নিদ্রাহীন রজনীর শেষ প্রহরে পিতার উপহারের কিতাব দুটি নিয়ে বাইরে বার হয়ে আসি। লেখার শুরু থেকে একটা একটা করে পাতা ছিঁড়ে উড়িয়ে দিতে থাকি নীচের দিকে। যাক্, সব যাক্। চোখ দুটো জলে ভরে আসে। পিতার সেই বহুদিন আগের সন্ধ্যাবেলার মুখখানা মনে পড়ে যায়। কত আশা করেই না সেদিন আমাদের দুই বোনের হাতে কিতাব দু'খানি তুলে দিয়েছিলেন তিনি। ভবিষ্যতের কত সুখকল্পনাই না করেছিলেন। আজ ভাবি, সেদিন যদি তিনি তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ আবছাভাবেও দেখতে পেতেন তবে কখনই তাঁর কর্মব্যস্ত সময় থেকে কয়েক মুহূর্ত চুরি করে নিয়ে অত আগ্রহভরে কিতাব দুটি দিতে আসতেন না আমাদের। তাঁর কল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। আমার কল্পনাও ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা-ভরা রচনা রেখে লাভ কি? যাক্—সব যাক্। আওরঙজেব আর রোশনারার হাতে এ দুটি পরবার আগেই শেষ হয়ে যাক্। তারা দেখতে পেলে অট্টহাস্য করে উঠবে। রোশনারা হয়তো খানাপিনার আয়োজনই করে বসবে এই উপলক্ষ্যে।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকি পাতাগুলোকে এক এক করে। নিজের দেহ থেকে

যেন এক এক টুক্‌রো মাংস ছিঁড়ে ফেলছি। বিষণ্ণভাবে পাতাগুলো ঘুরপাক খেতে খেতে নীচের দিকে পড়তে থাকে। চেয়ে চেয়ে দেখি আমি। পাতাগুলো বিশেষ আপত্তি করে নি। টানতেই খুলে এসেছে। তারাও বুঝতে পেরেছে তাদের সর্বাঙ্গের কালো আঁচড়ের ব্যর্থতা। স্রষ্টার ব্যর্থতায় তারা ব্যর্থ। তবু এতদিনের মায়া কাটাতে বোধ হয় কষ্ট হচ্ছিল তাদের। তাই দু'একখানি পাতা মাঝে মাঝে দক্ষিণের দম্‌কা বাতাসে ফিরে এসে আমার গায়ে লেপটে যাচ্ছিল। এমনি একটি পাতা তুলে নিয়ে খেয়ালের বশে চোখের সামনে তুলে ধবতে দেখি মায়ের কথা লেখা রয়েছে তাতে। যে-মুহূর্তের কথা লেখা রয়েছে, সেই মুহূর্তটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বুকের ভেতরে হুহু করে উঠল। কী করলাম আমি? এমন কত মধুর কত অমূল্য মুহূর্ত যে ধরা পড়েছে আমার লেখায়। আর তো ফিরে পাবো না।

—শাহ্‌জাদী।

—কে কোয়েল?

—হ্যাঁ শাহ্‌জাদী। অঙ্গুরীবাগ থেকে আপনার জন্যে একগুচ্ছ ফুল এনেছি। খুঁজতে খুঁজতে এখানে এলাম। একি শাহ্‌জাদী, আপনি কাঁদছেন?

—কোয়েল, সব নষ্ট করে ফেলেছি।

—কী নষ্ট করলেন?

—এই দেখ কোয়েল।

প্রথম কিতাবটি দেখাই। দ্বিতীয়টি অক্ষতই ছিল।

—একি করলেন শাহ্‌জাদী। এযে আপনার অনেকদিনের সঙ্গী। সেই কবে আমি হারেম ছেড়েছিলাম, তারও কত আগে দেখেছি। প্রায় অর্ধেক পাতাই যে ছিঁড়ে ফেলেছেন। ছি ছি। কোথায় ফেললেন? পুড়িয়ে ফেলেন নি তো?

আঙুল দিয়ে নীচের দিকে দেখিয়ে দিই। সেখানে ঘাসের ওপর যেন এক ঝাঁক বুনো পায়রা উড়ে এসে বসেছে।

—ইস্‌। আমি এখনি গিয়ে কুড়িয়ে আনছি। কিন্তু শিশিরে যদি সব অস্পষ্ট হয়ে যায়? ঘাসের ওপর যে সারারাতের শিশির জমে রয়েছে শাহ্‌জাদী।

—তবু তুমি যাও কোয়েল। দেখো, যদি ওদের বাঁচাতে পার।

—তার আগে ও দুটি দিন তো। আপনার কাছে আর রাখব না। যখন দরকার হয় চেয়ে নেবেন।

—তাই ভাল, তোমার কাছেই থাক।

কোয়েল নীচে চলে যায়।

কিছু পরে পাতাগুলো কুড়িয়ে এনে সযত্নে জোড়া লাগায়। আমি ভয়ে চাইতে পারি না। হয়তো অনেক পাতা নষ্ট হয়েছে—অনেক লেখা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোয়েলকে প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না। সেও নিজে থেকে কিছু বলে না। প্রথম কিতাবখানি তার কাছে রেখে, দ্বিতীয়টি আমাকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

আওরঙজেব জানে, বিদ্রূপ আর তুচ্ছতা নিয়ে যে ক্ষমার কথা পিতা উচ্চারণ করেছেন—সে ক্ষমা ক্ষমা নয়। সে জানে উত্তরাধিকার সূত্রে সে ময়ূরাসনের অধিকার পায় নি। পেয়েছে এক ঘোরতম পাপের পথে, এক সর্বনাশা অভিশাপের মধ্যে দিয়ে। সে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি তাই। আমাকে ইতিমধ্যে অনেক পত্র দিয়েছে সে। কিন্তু সব পত্রেই ঘুরে ফিরে এক কথা—পিতার অন্তরের কথা জানতে চায় সে। একটি পত্রেরও জবাব আমি দিই নি। জবাব দিতে ঘৃণা বোধ হয়েছে। জ্ঞানের আলোকের মধ্যে দিয়ে যে ইসলাম ধর্ম বিকশিত হয়ে উঠতে পারত, সেই ইসলাম ধর্মের ওপর সে চাপিয়ে দিয়েছে এক দুরপনেয় কলঙ্ক। অন্তরে অন্তরে সে বুঝতে পেরেছে তার অন্যায়। তাই সে কম্পিত। সে কম্পন তার প্রতিটি বাক্যে—সে কম্পন তার প্রতিটি কার্যে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ-কম্পন থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

ইতিমধ্যেই নিজের লোককেও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে। তাই এতদিন যে শাস্তি অন্যের জন্যে তোলা ছিল, সে শাস্তি নিজের পরিবারের ওপরই বর্ষিত হতে শুরু হয়েছে। মহম্মদ সম্প্রতি কারারুদ্ধ হয়েছে।

প্রাসাদের শিখরে দাঁড়িয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠি—আওরঙজেব, তোমাকে আমি ক্ষমা করব। তোমার সব অন্যায় আমি ভুলে যাব ভাই। শুধু একটি সর্ত। এই সর্বনাশা পথ থেকে ফিরে এসো।

—শাহ্‌জাদী।

—কোয়েল? তুমি কি ছায়ার মতো সব সময়ই আমার কাছে কাছে থাকো কোয়েল?

—আর যে জায়গা নেই আমার।

—কোয়েল আমি কিন্তু পাগল হই নি। এই নির্জনে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম বটে। কিন্তু আমার মাথা ঠিক রয়েছে।

—আমি জানি শাহ্‌জাদী। আমিও যে অমন কথা বলি একলা একলা।

—কোয়েল। এই দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কখনো ভেবেছ কি ?
—অতখানি বড় জিনিস ভাববার শক্তি কোথায় আমার শাহ্‌জাদী। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়েই যে ব্যস্ত থাকি।
—তুমি একথা বললে আমি বিশ্বাস করব না। দেশ সম্বন্ধে কি কোন দুর্ভাবনাই হয় না তোমার ?
—স্পষ্ট করেই তবে বলি শাহ্‌জাদী, কোন দুর্ভাবনাই হয় না।
—সম্ভব বটে। তুমি হিন্দু। মুসলমান ধর্মের ভেতরে গ্লানি ঢুকলে তোমার মন কেনই বা কাতর হবে।
—কিন্তু আপনি তো ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন নি। আপনি প্রশ্ন করেছিলেন দেশ সম্বন্ধে।
—ধর্ম আর দেশ যে এখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আওরঙজেবের ধর্মবোধ দেশের হিন্দু প্রজাদের শান্তি নষ্ট করবে। তার ফল কতখানি মারাত্মক তাকি জান না ?
—আমি তাও ভেবে দেখেছি শাহ্‌জাদী। কিন্তু নিজে থেকেই এক অদ্ভুত সমাধান খুঁজে নিয়েছি। সে সমাধান কারও মনঃপূত না হলেও আমি তাতে তুষ্ট।
—কী সে সমাধান ?
শাহ্‌জাদী। অনন্তকালের পটভূমিকায় ফেলে বিচার করলে আওরঙজেব বলুন আর মুঘলবংশ বলুন সবই তো তুচ্ছ। এই জগৎ এক অসাধারণ গতি নিয়ে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যেন ছুটে চলেছে। সেই লক্ষ্যে পৌছলেই তার পরিপূর্ণতা লাভ। এই লক্ষ্যে যাবার জন্যে যে গতি, সেই গতির ফলে সংঘর্ষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেবেই। আওরঙজেবের মতো এক একজনের উত্থান সেই সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। এর ফল হয়তো ভালই। গতির শক্তি বৃদ্ধি হয়।
হতবাক্ হয়ে কোয়েলের দিকে চেয়ে থাকি নিষ্পলক দৃষ্টিতে। তাকে আমার চেয়ে অনেক উঁচু বলে মনে হয়। ধীরে ধীরে বলি,—তুমি দার্শনিক কোয়েল।
—লজ্জা দেবেন না শাহ্‌জাদী। দার্শনিক কাকে বলে আমি জানি না, তবে আমি হিন্দু। সান্ত্বনা লাভের আশায় অসম্ভব কিছু ভেবে নিতে আমাদের বাধে না। সান্ত্বনা পাইও তাতে।
কথা বলতে বলতে নীচে নামতেই একজন খোজা এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে। চমকে উঠি তাকে দেখে। বহুদিন আগে রোশনারার কক্ষের সামনে প্রহরী নিযুক্ত থাকত সে। রোশনারাকে একবার তার সঙ্গে শিশমহলে দেখেছিলাম। আর আমি দেখেছিলাম এক স্বপ্ন। খোজার বয়স বেড়েছে, কিন্তু চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। নামটিও মনে এসে যায়। শোভান।
শোভান বলে,—একজন আমীর আপনার সাথে দেখা করতে চান।

—কী নাম।

—তিনি বললেন, আপনি তাঁকে চেনেন। তাই নাম জানালেন না।

রাগ হয়। সেই সঙ্গে একটু কৌতূহলও হয়। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও থেমে যাই। খোজাকে প্রশ্ন করি,—তুমি কতদিন এখানে আছো?

—আজ থেকে।

—এর আগে কোথাও ছিলে?

—রোশনারা বেগম আমিন খাঁয়ের সঙ্গে রেখেছিলেন।

মুহূর্তে সব বুঝতে পারি। এককালে খোজাটির প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক পক্ষপাতিত্ব ছিল। রাজধানী পরিবর্তনের সময়ে তাকে দিল্লীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। রোশনারা বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, পুরোনো লজ্জাকে দিল্লীতে বয়ে নিয়ে যাবার দরকার নেই। তার যুক্তি আমি সহজেই মেনে নিয়েছিলাম। তখন ভুলেও ভাবতে পারি নি যে খোজাটি তারই দলের লোক।

আজ একে দেখে আমার ঘৃণা হয়। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনটি কক্ষ পার হতেই দেখতে পাই সেই বিরাট সুপরিচিত লোকটিকে। দাঁড়িয়ে পড়ি।

সে কিন্তু এগিয়ে আসে। বিনীতভাবে অভিবাদন করে আমার সামনে দাঁড়ায়। ওড়নার আড়ালে আমার ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওঠে। আবার কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসতে পারে নজরৎ খাঁ? যৌবনে তো এখন আমার ভাঁটার টান। প্রতিপত্তি নিঃশেষিত।

—খাঁ সাহেবের আগমনের কারণ জানতে পারি কি?

একটু যেন অবাক্ হয় নজরৎ খাঁ। আমার কণ্ঠস্বরে হয়তো পূর্বের গাম্ভীর্য সে আশা করে নি। সে বলে,—আপনি কি সত্যিই অনুমান করতে পারেন নি?

—না।

—আজ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমার ক্ষমতা।

—হ্যাঁ।

—আপনি বুঝতে পেরেছেন শুধু বাগাড়ম্বর ছাড়া ছত্রশালের আর কিছুই ছিল না। যুদ্ধে নেমে তাই বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। অত যারা সংগীত নিয়ে মাথা ঘামায় তারা যুদ্ধ করতে পারে না।

—খাঁ সাহেব কি মৃতকে উপদেশ দিচ্ছেন?

না। আপনাকে বলছি। কারণ আপনি সরল বিশ্বাসে এক অপদার্থের ওপর আপনার স্বর্গীয় প্রেম ঢেলে দিয়েছিলেন।

ইচ্ছে হচ্ছিল সেই মুহূর্তে শয়তানকে ঘর থেকে বার করে দিই। কিন্তু তা করলাম না। এ জীবনে আর কিছু শিক্ষা হোক আর না হোক ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার শিক্ষা

হয়েছে। বলি,—বাঃ, আপনিও দেখছি শিল্পী হয়ে উঠেছেন। চমৎকার কথা বলছেন।

—জাহানারা, আর বিদ্রূপ করো না। প্রৌঢ়ত্ব ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করছে। তবু তোমাকে ভুলতে পারি নি। কবরে গিয়েও ভুলতে পারব না। জাহানারা, আজ আমি জানি, তুমি বন্দী। কোন ক্ষমতাই তোমার নেই। তবু ছুটে এসেছি। অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তোমাকে নিতে এসেছি।

হেসে উঠি আমি। সশব্দে হেসে উঠি। নজরৎ খাঁ হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—এই যে ওড়না দেখছেন খাঁ সাহেব, যা দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছি, এটি ছত্রশাল উপহার দিয়েছিল। আমার মসলিন ভেদ করে যে অপূর্ব কাঁচুলি উঁকি দিচ্ছে, এটিও ছত্রশালের দয়ার দান। আর আমার দেহ? তার কথা নাইবা শুনলেন খাঁ সাহেব?

—তুমি এখনো—

—হ্যাঁ। এখনো। সেই কবরে যাবার যে কথা বললেন আপনি, ওটি আপনার বেলায় মন ভোলাবার কৌশল মাত্র। আমার বেলায় খাঁটি সত্যি। আপনি বহুদিনের এক পুরোনো প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জিদের বশে এখানে এসেছেন আজ। ভুল করেছেন।

—আমার কথায় আপনি রাজী নন?

—এতক্ষণ কথা বলতে পেরেছেন, এই তো আপনার সৌভাগ্য। এবারে চলে যান। দেরি করলে বার করে দেওয়া হবে।

অট্টহাসি হেসে ওঠে নজরৎ খাঁ। মুখে পৈশাচিক কুটিলতা আর প্রতিহিংসার ঘৃণ্য ছাপ। সে বলে,—আপনি সামান্য একজন বন্দী। আপনার মুখে এসব কথা ধৃষ্টতা মাত্র। আপনি জানেন না—এখানকার প্রহরীরা আমারই অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হয়।

—আর তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভালভাবেই জানে, এখনো যদি আমি আওরঙজেবকে বলি, দুশমন নজরৎ খাঁয়ের ফাঁসী দাও, সেই মুহূর্তে তোমার গলায় সেই অতি-পিচ্ছিল দড়ি পরিয়ে দেবার হুকুম দেবে সে। আর একটা কথা শুনে রাখবে নজরৎ, আমি আওরঙজেবের বন্দী নই। বিশ্বাস না হয়, তাকেই জিজ্ঞাসা করবে। যাও এখন, দূর হয়ে যাও শয়তান।

মুখ লাল করে দরজার দিকে এগিয়ে যায় নজরৎ। ঠিক সেই মুহূর্তে এক অদৃশ্য স্থান থেকে কোয়েল খিলখিল করে হেসে ওঠে। নজরৎ ছুটতে শুরু করে।

দিন যায়।

মাস যায়।

বছর যায়।

কত বছর কেটে গেল, খেয়াল থাকে না। শুধু একদিন নজরে পড়ে আমার সামনে একগোছা সাদা চুল। যৌবন গেল। যাবেই তো। যৌবনকে কি ধরে রাখা যায়? এতদিন ভাবতাম, যৌবন বিদায় নিলে পাগল হব। এখন দেখছি সে চলে যাওয়ায় নিশ্চিন্ত হলাম। রোশনারার মাথায়ও এমন দু'এক গুচ্ছ শুভ্রকেশ নিশ্চয়ই মিলবে। দিল্লীতে আছে সে। সুখেই আছে হয়তো! সুখে থাক। সবাই সুখে থাক। পৃথিবী যেন স্থায়ী সুখের আলয় হয়ে ওঠে।

ওই তাজমহল। ওর মাথার ওপরে একখণ্ড গাঢ় মেঘ। তারই ছায়া পড়েছে সৌধের গায়ে। এই মেঘটুকু ঝরেও পড়তে পারে ওখানে। তপ্ত প্রস্তর শীতল হবে। তাজমহল শুধু স্মৃতি—আর কিছু নয়। ওই কক্ষে জরাজীর্ণ অবস্থায় যিনি রক্তমাংসের দেহখানা এখনো বজায় রেখেছেন, তিনিও স্মৃতি। ওঁর ভেতরে যেটুকু প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, কান পেতে শুনলে তাজমহলেরও সেটুকু স্পন্দন ধরা পড়বে।

যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি নিজেও কি নিজের স্মৃতি নই? কোথায় সেই বাদশাহ্-বেগম, যার প্রতাপে এককালে দিল্লীর হারেম কাঁপত! নেই। সে নেই। হারিয়ে গিয়েছে। শুধু পাথরের সৌধে পরিণত হতে বাকী আছে তার আর শাহজাহানের। শাহজাহানের সাধের রক্তবর্ণের সমাধি আর শেষ হয়ে ওঠে নি তাজমহলের অপর পারে। কোথায় তাঁর স্থান হবে জানি না। সবই নির্ভর করছে নবীন গৌরবর্ণ বাদশাহ্ 'আলমগীরের' ইচ্ছার ওপর।

কিন্তু আমি চাই না আমার দেহের ওপর পর্বতপ্রমাণ পাষাণসৌধ। আমি চাই সবুজ ঘাস আমার এই বহুপ্রতীক্ষায় সার্থক দেহখানিকে ঢেকে রাখুক। প্রস্তরের তাপ আমার এ-দেহ সহ্য করতে পারবে না—যত অর্থ ই ব্যয় হোক তাতে। ছত্রশালের দেহখানা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে জানি না। শুধু এটুকু জানি, তার দেহাবশেষ তৃণগুল্মের সঙ্গেই জড়াজড়ি করে মাটিতে মিশে গিয়েছে। আমার বেলাতেও তাই চাই। যদি ক্ষমতা থাকত, সামুগড় প্রান্তরের কোন এক স্থানে আমাকে ফেলে রেখে আসার নির্দেশ দিতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমি বাদশাহ্-বেগম নই—আমি তার স্মৃতি।

বাইরে ছায়া পড়ে। কোয়েল এসেছে। সে ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই চলে গিয়েছে। আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে বলে তাদের তো হয় নি। তারা সুপারিশ করে আগ্রা থেকে দিল্লীতে বদলি হয়েছে। পরিবর্তে এসেছে কয়েকজন বৃদ্ধা, অক্ষম

নাজীর। কোন কাজ তাদের দিয়ে করানো সম্ভব নয়।

—শাহ্‌জাদী। বাদশাহের দাওয়াই খাওয়ার সময় হয়েছে।

—ও। চল কোয়েল। আচ্ছা কোয়েল, একটা কাজ করতে পারবে?

—বলুন।

—আমি যখন থাকব না তখন আওরঙজেবের হাতে একটুক্‌রো লেখা দিতে পারবে?

—কার লেখা?

—আমার। আমি লিখে দেব। আমার সমাধিতে সেটুকু যদি ও উৎকীর্ণ করার অনুমতি দেয়—

—কিন্তু আপনিই কি আগে যাবেন?

—তা বটে। তুমিও তো আগে যেতে পার। তোমার কথা আমার মনে হয় নি কোয়েল;

—তা হোক। আপনি আমাকে দেবেন। আমি ব্যবস্থা করব।

—আচ্ছা কোয়েল, তোমার শিল্পীকে তো দাহ করা হয়েছিল।

—হ্যাঁ শাহ্‌জাদী।

—তারপর তুমি কি করলে?

—দেহাবশেষ নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। আমি হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম কিছু।

—কি করলে সেটুকু।

—বাড়ির আঙিনায় মাটির নীচে শিল্পীরই গড়া একটি পাত্র করে রেখেছি। ওপরে লাগিয়েছি একটি শিউলি গাছ।

—সুন্দর। আমারও অমন হলে বেশ হত কোয়েল।

—শাহ্‌জাদী।

—শিল্পীও আমার মূর্তি গড়ে গেলে বেশ হত, তাই না?

—হ্যাঁ শাহ্‌জাদী। তারও কোন ক্ষোভ থাকত না।

—আমি তার সঙ্গে ঠিক দেখা করতাম কোয়েল। তখনো ছত্রশালকে দেখি নি। শিল্পী আমার জীবনের প্রথম পুরুষ। তবু তোমার কথা শুনে বিদায়ের সময়ও দেখা করতে পারি নি। তুমি বলেছিলে, চাঁদ কি মাটিতে নেমে আসতে পারে? পারে কোয়েল, নিশ্চয়ই পারে। তুমি বিশ্বাস কর, পারে।

—আমি এখন বিশ্বাস করি শাহ্‌জাদী। তখন আমার বয়স কম ছিল। অনেক কিছুই বুঝতাম না।

—কোয়েল।

—বলুন শাহ্‌জাদী।

—তোমার মুখে বয়সের রেখা পড়েছে। আমারও পড়েছে, তাই না?

—না শাহ্‌জাদী। কোন রেখা পড়ে নি। তবে বয়স হয়েছে বোঝা যায়।

—এখন ছত্রশাল যদি হঠাৎ এসে দেখত, মুখ ফিরিয়ে নিত?

—তা কি হয় শাহ্‌জাদী? আপনি যে তাঁর আপন। তাঁর আত্মার সঙ্গে আপনার আত্মার সম্পর্ক।

—আমি তা জানি কোয়েল, আমি তা জানি। তবু একথা তোমার মুখে শুনতে সাধ হল। শুনতে বড় ভাল লাগে।

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পিতার কক্ষে প্রবেশ করি। শয্যার ওপর ভূতপূর্ব শাহানশাহ্ শাহজাহানের স্মৃতি। নীরব। নিস্পন্দ। দাওয়াই নিয়ে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে ডাকি,—বাবা।

কয়েকবার ডাকার পরে তাঁর চেতনা হয়। যেন কতদূর থেকে আস্তে আস্তে বলেন,—কে? মমতাজ?

—আমি। জাহানারা।

—জাহানারা।

—বাবা।

অর্ধচেতন অবস্থায় হাত উলটে তিনি বলেন,—নেই।

—কি নেই বাবা।

দুর্বল কণ্ঠেও আনন্দের রেশ ধ্বনিত হয়। বলেন—আপেল।

—কোন্ আপেল বাবা?

—সেই? কে যেন দিয়েছিল।

আজকাল এমন সব কথা তিনি বলেন। তাই মৃদু গলায় বলি,—আমি এনে দেব বাবা।

—না। আর আসবে না। বাঁচলাম। মমতাজ বড় কাঁদছিল।

হঠাৎ খেয়াল হয়, পিতার হাতের আপেলের সুঘ্রাণ নেওয়া হয় নি বহুদিন। হাতখানা নাকের সামনে নিতেই বুক কেঁপে ওঠে। যেন মৃত্যুর গন্ধ ভেসে উঠেছে হাতে। আমার হাত থেকে তাঁর হাতখানা খসে পড়ে।

এবারে তিনি ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলেন,—নেই। আমি জানতাম। মমতাজ কাঁদতে কাঁদতে বলে গেল,—নেই।

—তোমার আনন্দ হচ্ছে বাবা?

—হ্যাঁরে, তোর হচ্ছে না?

—তোমার কথা ভেবে আনন্দই হচ্ছে। কিন্তু আমি কি করব ?
পিতার রোগ-পাণ্ডুর মুখেও যেন বিষাদের ছায়া নেমে আসে। একটু পরে অতি কষ্টে বলেন,—ছত্রশালের কথা এখনো ভাবিস জাহানারা ?
—হ্যাঁ বাবা। সব সময়।
—তাই ভাবিস। শান্তি পাবি। আর প্রার্থনা করিস আল্লার কাছে।
একটু ছট্‌ফট্‌ করেন তিনি। দাওয়াই খাইয়ে দিই। তারপর বলি,—তুমি কথা বলো না বাবা।
—শোন্ জাহানারা। আয়, কাছে আয়। একেবারে মুখের সামনে কান নিয়ে আয়।
—বল বাবা।
—তোকে অনেক—অনেক আগে কিতাব দিয়েছিলাম। মনে আছে ?
—হ্যাঁ বাবা।
—লিখতিস ?
—হ্যাঁ লিখতাম।
—আমার মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছে হত শুনতে। কিন্তু তুই নিজের কত কথা লিখেছিস ভেবে কিছু বলতাম না।
—সে কিতাব এখনো আছে বাবা। এখনো লিখি। রোশনারার খানাও তো আমি নিয়েছিলাম। আর মাত্র তিন-চার পাতা বাকী।
পিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বলেন,—তোকে আমার চিনতে ভুল হয়েছিল, জাহানারা। তুই তো ঠিক আমার মেয়ে নস, তুই মমতাজের মেয়ে। তোকে চিনতে পারি নি।
—ওসব কথা থাক বাবা।
—কি লিখেছিস, জাহানারা।
—সব। যা দেখেছি—যা ভেবেছি, সব। তবে একটা ঘটনা কিতাব থেকে বাদ দিতে হবে বাবা। আজই বাদ দিয়ে দেব।
—কোন্ ঘটনা ?
—খলিলুল্লা খাঁয়ের বেগমের সঙ্গে তোমাকে নহরী-বেহেস্ত-এ দেখেছিলাম।
—না, না। বাদ দিস্ না। খুব ভাল করেছিস লিখে। দোষগুণ মিলিয়েই তো মানুষ। কত দোষ থাকে মানুষের মধ্যে। তবু কোন কোন মানুষের এমন এক একটা গুণ বড় হয়ে ওঠে, যার ফলে তার অন্য দোষ ঢাকা পড়ে যায়।
—তুমি আর কথা বলো না বাবা। তোমার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে।
—আর একটু। কতদিন আমরা এখানে আছি, জাহানারা ?

—কোয়েল বলে, সাত বছর হতে চলল।
—সাত বছর! অনেকদিন। তুই বরং গোপনে আওরঙজেবকে একটা চিঠি লিখে দে। শত হলেও মুঘল-বংশের ধারা তারই মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে। লিখে দে- আমি দেখা করতে চাই। আর, আর সে এলে মণিমাণিক্যগুলো দিয়ে দিস। বেচারার ঘুম হচ্ছে না।
—দেব বাবা। তুমি চুপ কর।
পিতা মুখখানা বিকৃত করে চুপ করেন। আমি চলে যাই ঘর ছেড়ে। আমি থাকলে ঝোঁকের মাথায় বড় বেশী কথা বলেন।

আওরঙজেব এসে পৌছবার আগেই সব শেষ হয়ে যায়।
পত্রখানা ঠিক সময়েই লিখেছিলাম। তবু আওরঙজেব শেষ সময়ে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হতে পারে নি। নবীন বাদশাহের সঙ্গে ভূতপূর্ব বাদশাহের শেষ সাক্ষাৎ হল না। পিতার অন্তিম ইচ্ছা অপূর্ণ ই থেকে গেল।
শবযাত্রার ব্যবস্থা করব কি না ভাবি। কোথায় সমাধিস্থ করা হবে, তাও ভাবি। এমন সময়ে এক অশ্বারোহী খবর আনে আওরঙজেব আসছে।
অপেক্ষা করি তার জন্যে শবদেহের পাশে। বহুমূল্য আতরে সিঞ্চিত করি তাঁর শয্যা। আর পিতার মণিমাণিক্যের পেটিকা থেকে তাঁর অতিপ্রিয় কতগুলি মণি একটি স্বর্ণনির্মিত কৌটায় করে তাঁর পাশে রাখি।
আওরঙজেব এসে উপস্থিত হয়। অন্তিম শয়ানে শায়িত শাহানশাহ, শাহজাহান। বাদশাহ, আলমগীর তার সামনে কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের জন্যে হয়তো তার মধ্যে এক ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছে। তার চোখের সামনে দিয়ে হয়তো অতি দ্রুত ভেসে চলেছে অতীতের অনেক স্মৃতি।
কক্ষে আর কেউ নেই। সবাই অপেক্ষা করছে বাইরে।
আমি কর্তব্য মুক্ত। পৃথিবীতে আমার আর কিছুই করার নেই। আগেও কখনো কিছু করতে পারি নি। তবু শাহানশাহ, শাহজাহানের পাশে পাশে থেকে তাঁকে যদি সামান্য সাহায্যও করতে পেরে থাকি, যদি তাঁকে সামান্য শান্তিও দিতে পেরে থাকি সেইটুকুই যথেষ্ট। আল্লা হয়তো তার চেয়ে বেশী কিছু করার জন্যে আমাকে পাঠান নি।
আওরঙজেব হঠাৎ নিজেকে ছিনিয়ে নেয় পিতার কাছ থেকে। সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—জাহানারা।

আমি মুখ তুলি।

—বাবার কাছে যে অমূল্য রত্নরাজি ছিল সেগুলো নিশ্চয়ই তুমি নিয়েছ।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু জান, সেগুলোর ওপর তোমার অধিকার বিন্দুমাত্রও নেই।

আমার ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে ওর কথায়। অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করে বলি,—আমি তো নিই নি আওরঙজেব, আমি রেখেছি। বাবা তোমাকে দেবার জন্যে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছেন। তুমি তো মৃত্যুর আগে পৌছতে পার নি।

—কোথায় সেগুলো ?

—এখনি চাও আওরঙজেব ?

—হ্যাঁ।

আমি ধীরে ধীরে কক্ষের এক গুপ্তস্থান থেকে পেটিকাটি এনে আওরঙজেবের সামনে রাখি। আমার পা কাঁপছিল, আমার হাত কাঁপছিল। আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না ওর মনের দৈন্য দেখে। তবু শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।

চেয়ে দেখি মৃত পিতার শবদেহের পাশে তাঁরই একমাত্র জীবিত পুত্র কিরকম আকুল হয়ে পেটিকা হাতড়াতে থাকে।

—কয়টি জিনিস পাচ্ছি না জাহানারা। বাবার প্রিয় জিনিসগুলোই নেই। তুমি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছ ?

শবদেহের পাশে দেখিয়ে বলি,—দেখতো ওগুলো কি না ?

ওগুলো শাহানশাহ্‌, শাহজাহানের প্রিয় ছিল। তাই তাঁর সঙ্গেই দিয়েছিলাম।

আওরঙজেব তাড়াতাড়ি স্বর্ণনির্মিত কৌটাটি তুলে নিয়ে খুলে ফেলে। ভেতর থেকে নানান বর্ণের জ্যোতি বার হয়। সে আমার দিকে যেন অবাক্ হয়ে চায়। কেন অবাক্ হল বুঝি না।

অনেক পরে কম্পিত স্বরে বলে,—এগুলো তুমি ওঁর সঙ্গে পাঠাচ্ছিলে জাহানারা ?

—হ্যাঁ আওরঙজেব। আমার ভুল হয়েছিল। উনি তো মৃত।

—তোমার নিজের কোন লোভ নেই ?

—সে কি আওরঙজেব। আমার লোভ থাকবে কেন ?

—এগুলো যে অমূল্য।

—ও, অমূল্য। ভালই হল তুমি এসে। নইলে মাটির নীচে নষ্ট হত।

আওরঙজেব তার দুটো হাত আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার পেছনে টেনে নেয়। কী যেন ভাবে সে।

কিছুক্ষণ পরে বলে,—তুমি আমাকে সোজাসুজি কখনো তিরস্কার কর নি জাহানারা। হয়তো তিরস্কারই কর নি। যা শুনেছি সবই রোশনারার বানানো কথা। ত আর একটি কাজ আমি করব, যার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। জাহানারা, তোমার কাছে আমার চরিত্রের কিছুই লুকনো থাকতে পারে না জানি তোমার বুদ্ধি ক্ষুরধার। তুমি জান, বাদশাহীতে আমার প্রলোভন, ধর্মের ও প্রলোভনের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। আমার বাদশাহী বিপন্ন হোক আমি তা চা না। তাই পিতার শবদেহ পেছনের প্রাচীর ভেঙে নিঃশব্দে নিয়ে যাওয়া হবে কারণ তাঁর মৃতদেহ সবাই দেখলে আমার বিরুদ্ধে ভয়াবহ বিদ্রোহ ঘটতে পারে তার পরিণামে অনেক কিছুই হতে পারে।

আমি চুপ করে থাকি।

—কথা বল জাহানারা।

—তোমার যা অভিরুচি।

—আমি মমতাজ বেগমের পাশেই তাঁর সমাধির ব্যবস্থা করেছি।

আমার চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলি,—তোমার কাছে আমি কৃ আওরঙজেব।

মমতাজ বেগম এতদিন ছট্‌ফট্ করে এখন সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। বহুদিন পরে প্রিয়তমকে পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। আর কিছুই তিনি চান না। অনেক কিছু f চেয়েছিলেন—কিন্তু না পাওয়ার বেদনা বার বার তাঁকে আঘাত করেছে। সব চাইতে যা কাম্য সেটুকু পেয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। একটু দূরেই, দুর্ভা রিক্ত ললাট নিয়ে যে পুত্র তাঁদের জন্মগ্রহণ করেছিল, তার মস্তক প্রোথিত রয়েছে তিনি সে কথাও ভুলেছেন। যাকে নিয়ে জীবন শুরু, তাকে নিয়েই শেষ মাঝখানের সবকিছু মায়া—প্রপঞ্চ। সূর্যের আলো পড়ে তাজমহল তাই হাসে তাজমহল আর কাঁদবে না কখনো।

হতভাগী জাহানারার কথাও কি মমতাজের মনে নেই? পিতা বলেছিলেন, আ যে তাঁরই মেয়ে। আমি মমতাজ-দুহিতা জাহানারা।

না, মনে নেই। শুধু মমতাজের কেন, সেদিন অবধি যাঁকে আগলে রেখেছি বাদশাহেরও মনে নেই। কিন্তু—

হ্যাঁ, তার ঠিক মনে আছে। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তা পাশে আমার দেহের স্থান হবে না জানি। কিন্তু সেই শেষ বিচারের দিনে

এ. সে দাঁড়াবেই। সে আমার—সে শুধু আমার।

প্রাসাদের বাইরে কলরব। দিল্লী যাবার আয়োজন চলছে। আওরঙজেব আমার বাইরে অপেক্ষা করছে। আমাকে আবার দিল্লীতে নিয়ে যাবে সে। সবকিছু।

কক্ষে শুধু আমি আর কোয়েল। আমি আমার দ্বিতীয় কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় লেখনী চালিয়ে যাচ্ছি। আজই শেষ।

মিন প্রাসাদের এই প্রকোষ্ঠে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশী। তবু তারই মধ্যে মি লিখে চলেছি।

কোয়েল পাশে এসে দাঁড়ায়।

—দাঁড়াও কোয়েল। আর একটু বাকী।

—আপনার সেই লেখাটি বাদশাহ্ আলমগীরের হাতে দিয়েছি।

—কোন্ লেখাটি ?

—যেটি আপনার সমাধিতে উৎকীর্ণ করতে বলেছেন। আমি পড়েছি। বহুদিন পরে যারা আপনার সমাধির পাশে এসে দাঁড়াবে তারা যে চোখের জল না ফেলে পারবে না। অত করুণভাবে কি লিখতে হয় শাহ্‌জাদী ?

কোয়েল কেঁদে ফেলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে তার কান্না দেখি। কাউকে তো কাঁদাতে চাই নি আমি।

কোয়েল নিজেকে সামলে নিয়ে আপন মনে আমার লেখাটি বলে চলে :

তৃণগুচ্ছ ছাড়া আর কোন আস্তরণ করো না আমার সমাধির ওপর। অবনমিতার সমাধিটুকু ঢেকে রাখুক শুধু তৃণ।'

কোয়েল আবার চোখের জল ফেলে। কেন সে কাঁদে আমি বুঝি না। যে তৃণ আমার রাজাকে ঢেকে রেখেছে, সেই তৃণই যে আমার পরম কাম্য।

—শাহ্‌জাদী ! বাদশাহ্ আলমগীর সেটি পড়ে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চাইলেন তারপরে সযত্নে রেখে দিলেন।

—ও। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব না কোয়েল। তাতে তুমি ছোট হয়ে যাবে। আমি শাহ্‌জাদী বটে, কিন্তু নারী হিসেবে আমি তোমার চেয়ে অনেক নীচে। আশীর্বাদ কর যেন শেষদিন পর্যন্ত আমি রাজার কথা ভাবতে পারি। কথা ভাবতে ভাবতেই যেন আমার আয়ু ফুরিয়ে যায়।

হ্‌জাদী, আপনি হিন্দু হলে বলতাম, পরজন্মে তিনি আপনারই অপেক্ষা করছেন।

আমার চোখে আনন্দের বান আসে। লিখতে পারছি না। তবু লিখতে হবে।

প্রতিটি কথা লিখতে হবে। এই কয়টি কথাই শেষ কথা।
—কোয়েল। তুমি বাংলায় ফিরে যাচ্ছ। শিউলি গাছের গোড়ায় জল দে
দিন কাটবে। শেষে একদিন তুমিও ওখানকার নদীর জলে গিয়ে মিশবে।
সুখী। তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে কোয়েল।
কোয়েল চোখের জল মুছে কিতাব দু'খানার জন্য হাত বাড়িয়ে
শাহ্‌জাদী।
তাকে বলেছি, গোপনে জেসমিন প্রাসাদের এক শিলাতলে কিতাব দু'
রাখবে সে। এমনভাবে লুকিয়ে রাখবে যাতে বাদশাহ্ আলমগীর
দুটির সন্ধান না পায়। এই আমার শেষ সম্বল—বাদশাহের কোষা
রত্নের চেয়েও এর মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী। এতে ম
বাবা রয়েছেন, ভাইরা রয়েছে—আর রয়েছে আমার রাজা ছত্রশাল।
কি আওরঙজেবের লাল হাতে অর্পণ করতে পারি? সে যে বিষ।
না, না—
বাইরে দরওয়াজায় ধাক্কা শুনি। সঙ্গে সঙ্গে আওরঙজেবের কণ্ঠস্বর।
আমাকে। বুক কেঁপে ওঠে। আর লেখাও যাচ্ছে না। ঘর অন্ধকার।
মুখ অস্পষ্ট। সূর্য অস্তমিত।
এবার আগ্রা ছেড়ে যাবার সময় কেউ আর বাধা দেবে না। মা-বাবা
শাহজাহান? দারা? নাদিরা? কেউ না। সুলেমান—সিপার? ত
কেউ নেই। একা আমি।
তবে আমি চলি।
—নাও কোয়েল। চুপ করে লুকিয়ে ওই গোপন পথ দিয়ে চলে যাও।
দেখতে না পায়। যাও। ওরা এখুনি দরওয়াজা ভেঙে ফেলবে। যা
আমার সর্বস্ব তোমায় দিলাম। ওভাবে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলো
চুপি চুপি ওই পথে চলে যাও। কেউ চেনে না 'ও পথ'। আওরঙজেবও